দগ্ধ হৃদয়

উপক্রমণিকা

নিবেদন

এই পুস্তক খানি যাঁহার জীবনের ইতিহাস, তিনি স্বয়ং সে ইতিহ বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থখানিরও ইতিহাস আছে। সে ইতিহ আমাকে বিবৃত করিতে হইবে। তাই আমি—সাহিত্য-রস সম্বন্ধে অরসিক—কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ কোনও আদালতের উকীল—বাঙ্গালা সাহিত্য-দরবারের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নকীবের কাজ করিতেছি। সুখের বিষয়, আমার কাজ এই পর্য্যন্ত।

পূজার ছুটীতে পল্লীগ্রামে বৈবাহিক-গৃহে পূজা দেখিতে যাইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলাম। কলিকাতায় ফিরিয়া যখন আমার জ্বর হইল, তখন চিকিৎসক বলিলেন, আমার অজ্ঞাতে পল্লীগ্রামের দুষ্ট মশক আমাকে দংশন করিয়া এই বিপদ ঘটাইয়াছে। চিকিৎসা হইল, জ্বরও ছাড়িল; কিন্তু শরীর সবল হইল না। আমি বলিলাম, তাহা অতিরিক্ত কুইনাইন-ব্যবহারের ফল। ডাক্তার বলিলেন, ম্যালেরিয়ায় ঐরূপ হয়। এক মাস পরে জ্বর আবার দেখা দিল; আবার গেল। আরও একবার

এইরূপ ঘটিল। তাহার পর জ্বরের তিরোভাব হইল; তথাপি শরীর সবল হইল না। তাহার পর গ্রীষ্মের আরম্ভেই ললাটে বিস্ফোটক বাহির হইতে লাগিল। বন্ধুরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আম ভারে উঠিতে না উঠিতে ভক্ষণের ফলে এরূপ হইতেছে। আমি ...র বলিলাম, লঙ্কা হইতে তাঁহাদের আনীত ফলে আমার প্রীতি তাঁহাদের কষ্ট হইবার কারণ নাই। ক্রমে যখন বিস্ফোটকবাহুল্যে আমা শ্রীমুখপঙ্কজ অলিকুলসঙ্কুল কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, তখ টোকমারী ত্যাগ করিয়া চিকিৎসকের শরণ লইলাম। তিনি বলিলেন "...থা ঔষধ সেবন করিয়া লাভ হইবে না; অনেক দিন ভুগিতেছ; দি ...য়ক দার্জ্জিলিং বেড়াইয়া আইস।" প্রস্তাবটা মন্দ নহে। কিন্ত ...টা অন্তরায় উপস্থিত হইল; প্রথম, আদালত খোলা, সুতরাং কি উপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটিবে; দ্বিতীয়, গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুতি। "শরী মাদ্যং" ইত্যাদি প্রাচীন কথার দোহাই দিয়া প্রথম অন্তরায়টা দূর করিতে পারি। কিন্তু দ্বিতীয়টার কি হইবে? গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুতিতে যে দশরথের বিষম বিপদ ঘটিয়াছিল, সে কথা বিস্মৃত হইয়া আমি উপর্য্যুপরি দুইবার—একবার পূজার অবকাশে বেড়াইতে যাইবার সময়, আর একবার "বড়দিনে"র ছুটীতে কংগ্রেস যাইবার সময় গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাঁহাকে পর্ব্বত ও সাগর দেখাইব। এখন গৃহিণীর যাইবার সুবিধা হইবে না; কারণ, "কোলে কচি ছেলে"। এ অবস্থায় কি করি? ভাবিতে ভাবিতে আমি গৃহে আসিলাম; এবং গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সব কথা বলিলাম। শুনিয়া গৃহিণী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তেমন কপাল করিয়া আসি নাই যে, ঘরের বাহির হইতে পারিব।

পরজন্মে যদি পুরুষ হইয়া জন্মিতে পারি, তবেই হইবে।" এই খেদোক্তিতে আমি বিচলিত হইলাম। গৃহিণীর শীর্ণ দেহে তখনও প্রসবজনিত দৌর্ব্বল্য সপ্রকাশ। তাঁহার লোধ্র-পাণ্ডু আননে চাহিয়া আমার মনে হইল, আমার স্বাস্থ্য অপেক্ষা তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া অধিক প্রয়োজন। আমি বলিলাম, "আমি এখন যাইব না। দিন কয়েক পরে তোমাকে লইয়া যাইব।" গৃহিণী বলিলেন, "না, ডাক্তার যাইতে বলিয়াছেন, তুমি যাও। আমার কি এখন যাওয়া হয়? রথের সময় বড় দিদি শ্রীক্ষেত্রে যাইবেন, আমি তাঁহার সঙ্গে যাইব।" আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, "কিন্তু তোমার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে আবার যদি তুমি বিরহে যক্ষ-পত্নীর মত কলামাত্রশেষ চন্দ্রের দশাগ্রস্ত হও, তবে বড়ই বিপদ হইবে।" গৃহিণী বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই। তোমার কৃপায় মধ্যে মধ্যে বিরহটায় আমি অভ্যস্ত হইয়াছি।" উত্তরে আমি বলিলাম, "সেটা কেবল প্রেম উজ্জ্বল করিবার জন্য।" গৃহিণী বলিলেন, "যখন প্রেম স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারায়, তখন তাহাকে চেষ্টা করিয়াই উজ্জ্বল করিতে হয় বটে।" আমি হারিলাম। গৃহিণী বলিলেন, এখন রঙ্গ রাখ। কিরূপ কি গুছাইতে হইবে, বল।"

যাঁহার এত গুণ, তাঁহার গুণে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। তাই আমার বন্ধুরা আমাকে স্ত্রৈণ বলিলেও আমি সে অপবাদ গৌরব-মুকুটরূপে সানন্দে শিরে ধারণ করিয়া থাকি।

দার্জ্জিলিংএ আসিয়া স্বাস্থ্যনিবাসে উঠিলাম। তথায় দুই দল লোক দেখিলাম। এক দল বৃদ্ধের। অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ, সাবজজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি এই দলভুক্ত। বিচক্ষণ আর্য্যগণ দেশের ও

দেশবাসীদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধে বন-গমনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ইংরাজ সরকার মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসর বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহারা সে সীমাও অতিক্রম করিয়াছেন; ইহারা পেচকের মত গম্ভীর; ঠাণ্ডার ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত; কোটের উপর চাঁদনীর চৌদ্দ হইতে ষোল টাকা পর্য্যন্ত দামের আলষ্টার চড়াইয়া, গলদেশে কেহ বা শালের, কেহ বা মলিদার, কেহ বা নাতিনীর রচিত পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া, ছত্র ও যষ্টি লইয়া মন্থরগমনে ভ্রমণে বাহির হয়েন, এবং ইহাদের দেহে জরা যেরূপ লর্ড কর্ণওয়ালিসের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, চৌরাস্তার বেঞ্চতলায় সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। ইহারা সকলেই বৃদ্ধ, কিন্তু সেটা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত; কেন না, সকলেরই আশা, যতদিন চাকরী করিয়াছেন, অন্ততঃ ততদিন পেন্‌সান্ ভোগ করিবেন। আবার কাহারও কাহারও দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষ। তাঁহারা চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু চাকরীর অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আলাপ কেবল সেক্রেটারী, কমিশনার প্রভৃতির কথা; আর আলোচনা—আকাশের ও স্বাস্থ্যের। এই এক দল। আর এক দল যুবকের। এ দলে পরীক্ষা দিয়া সদ্যঃ-সমাগত ছাত্রগণের প্রাচুর্য্য। তাহারা ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যয়নের চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে; সংসারের দারুণ দুশ্চিন্তা তাহাদিগের প্রফুল্লতা পরিম্লান করিতে পারে নাই। তাহারা সর্ব্বদাই আনন্দে আছে। তাহারা পাঞ্জাবীর বা শার্টের উপর পশমী গাত্রবস্ত্র জড়াইয়াই যথেষ্ট বিবেচনা করে। যুবকসুলভ চাপল্য তাহাদিগের মস্তিষ্ককে দুষ্টবুদ্ধির কারখানায় পরিণত করিয়াছে। তাহারা

বৃক্ষে পত্নীর নাম ক্ষোদিত করিতেছে ; বেঞ্চে আপনাদের নামের আদ্যা-ক্ষর কাটিতেছে, কোনও গৃহের নামাঙ্কিত কাষ্ঠফলকে একটি অক্ষর মুছি-তেছে, ইত্যাদি। মধ্যবর্ত্তী কোনও দলের অভাবে আমি এই যুবকদলেই যোগ দিলাম। ইহাতে বৃদ্ধদল কিছু বিরক্ত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন এক দিন আমাকে বলিলেন, "তোমার পক্ষে ছেলেদের দলে মেশা ভাল নহে।" আমি উত্তর দিলাম, "কেন? এখনই প্রাণের পকেটে বৃষকাঠ না দিয়া তাহাকে কিছু অধিক দিন 'হামাগুড়ি' দিতে দেওয়া ত ভাল।" তাহার পর তাঁহারা আর কোনও কথা বলিলেন না।

দশ দিন কাটিয়া গেল। গৃহে ফিরিতে হইবে। সুতরাং আমি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া একদিন রঙ্গিৎ নদী দেখিতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম। দুই তিন মিনিটের মধ্যে প্রস্তাব অনু-মোদিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইয়া গেল। আমরা অশ্বের সন্ধানে বাহির হইলাম। অশ্ব ভাড়া করা হইল।

পরদিন প্রত্যূষে আমরা যাত্রা করিলাম। বৃদ্ধের দল আমাদিগের অবিমৃশ্যকারিতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। আমরা কেহই অশ্বা-রোহণে পটু নহি, কিন্তু অশ্বারোহণে কাহারও উৎসাহের অভাব ছিল না। আমরা চলিলাম।

সহর ছাড়াইয়া আমরা গন্তব্য পথে যাইতেছি, এমন সময় পথি-পার্শ্বে শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট গৈরিকবাস যুবককে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বস্ত্রের বর্ণ ব্যতীত তাঁহাতে সন্ন্যাসীর অন্য কোনও লক্ষণ দেখিলাম না। তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই বোধ হইল। আলোক দেখিলে পেচক যেমন ব্যস্ত হইয়া কোটরে প্রবেশ করে, তিনি আমাদিগকে দেখিয়া

তেমনই ব্যস্তভাবে নিকটবর্ত্তী কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইলাম। এক জন বলিলেন, "ব্যাপারটা কি হে?" আর এক জন বলিলেন, "চল, দেখি।" শেষে স্থির হইল, দুই কারণে এখন যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে;—প্রথম, তাহাতে বিলম্ব হইবে, এবং রৌদ্র প্রবল হইলে পথ অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে; দ্বিতীয়, আমরা অশ্বারোহণে যেরূপ পটু, তাহাতে সহিসদিগের অবর্ত্তমানে পথিমধ্যে অবতরণ করিলে পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ দুঃসাধ্য, এমন কি, অসম্ভবও হইতে পারে।

রঙ্গিৎ দেখিয়া আমরা যখন দার্জ্জিলিং সহরের উপকণ্ঠে উপনীত হইলাম, তখন কেবল সন্ধ্যা হইয়াছে; অদূরে সহরের শত গৃহের বাতায়নের কাচাবরণের মধ্য দিয়া আলোক দেখা যাইতেছে,—যেন গগনে তারকাশোভা পাইতেছে। প্রভাতে সন্ন্যাসী যুবককে যে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, আমরা সেই গৃহের নিকটে আসিলে অতি মধুর গীতধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হইল—

ওহে মঙ্গলময় করুণা-নিলয়
নিখিল-জগৎ-স্বামী হে।
তব শরণ-আগত চরণে প্রণত
দীনভক্ত আমি হে।
আমি মোহের ছলনে রিপুর তাড়নে
ভুলে ছিনু, প্রভু, তোমারে।
আমি বিপদের পথে অন্ধের মত
চলেছিনু নাথ, আঁধারে;

তুমি আঁধারের মাঝে আলোকের সাজে
দাঁড়ালে আসিয়া সমুখে ;
তুমি দেখালে বিপদ দেখালে সুপথ
দিলে নব বল এ বুকে।
আজি হৃদয়-মাঝারে পেয়েছি তোমারে
আর কা'রে নাহি ডরি হে !
ওহে বিপদ-বারণ, নিখিল-কারণ,
হৃদয়-বিহারী হরি হে।

কি মধুর স্বর! আমরা সকলেই অশ্বের বেগ সংযত করিয়া গান শুনিলাম। মনে হইল, যেন সেই স্বর গগন প্লাবিত করিয়া তারালোকে মিশাইয়া গেল। এক জন বলিলেন, "লোকটা কে ?" আর এক জন বলিলেন, "বোধ হয় রাজনীতিক সন্ন্যাসী।" প্রথম বক্তা বলিলেন, "তাহা হইলে নিকটেই পুলিস দেখিতে পাইতে।" আর এক জন বলিলেন, "পুলিস কি আর এ দেশে রাজনীতিক সন্ন্যাসী রাখিয়াছে ?" চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন, "এ দেশে কি কোনকালে রাজনীতিক সন্ন্যাসী ছিল ?" এইরূপ কথায় কথায় আমরা স্বাস্থ্যাবাসে উপনীত হইলাম। আমার মনে সন্ন্যাসীর রহস্য জানিবার জন্য প্রবল কৌতূহল জন্মিল।

সেই প্রবল কৌতূহল পরদিন প্রভাতে আমাকে সন্ন্যাসীর কুটীরে উপনীত করিল। সন্ন্যাসী তখন কুটীরের সম্মুখে শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট—একখানি ইংরাজী কবিতা-পুস্তক-পাঠে নিবিষ্ট-চিত্ত। তিনি আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিলেন ; আমি বলিলাম, "আপনার কাছে আসিয়াছি।"

সন্ন্যাসী বিরক্তি-ব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"আলাপ করিতে।"

"আমি আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক নহি।"

"তাহাতে আমার ইচ্ছানিবৃত্তির সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

"আপনি কি চাহেন ?"

"আপনার পরিচয়।"

"আমার পরিচয় দিতে আমি সম্মত নহি।"

কিন্তু সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ভাব কমিতে লাগিল; বুঝিলাম, সে বিরক্তি কৃত্রিম—লোকের কৌতুহল হইতে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টামাত্র। আমার আশা বাড়িল; আমি নানা কথায় সন্ন্যাসীর পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ কথার পর সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি উকীল ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরূপ অনুমানের কারণ ?"

"আপনি জেরা করিয়া আমার পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা অল্প। আমিও ঐ ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী ছিলাম! জিজ্ঞাসা করি, আপনার এত আগ্রহ কেন ?"

"কৌতূহলনিবৃত্তি।"

"অকারণ কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেওয়া কি সঙ্গত ?"

"জানি না কেন, আপনাকে দেখিয়া অবধি আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। আপনার ন্যায় লোক কেন সংসারত্যাগী হইয়াছেন—জানিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়াছি।"

আমার ঘড়ীর চেনে একটা লকেট ছিল। সেইটি দেখাইয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ লকেটে কি আছে ?"

আমি বলিলাম, "একখানি ছবি।"

"কাহার?"

"আমার স্ত্রীর।"

"আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বন্ধুদলে আমার স্ত্রৈণ অপবাদ সুবিখ্যাত।'

সন্ন্যাসীর মুখে চিন্তার ছায়াপাত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্ত্রী কি আপনাকে ভালবাসেন?"

"প্রেম এক-তরফা হইলে কি সুখের হয়?"

"তবে ভালবাসিয়া ও ভালবাসা পাইয়া আপনি সুখী?"

"হাঁ।"

"আপনি ভাগ্যবান্।"—বলিয়া সন্ন্যাসী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসী গৃহাভ্যন্তর হইতে একখানি খাতা আনিয়া আমাকে দিলেন; বলিলেন, "ইহাতে আমার জীবনের ইতিহাস লিখিত আছে। এক দিন মনে করিয়াছিলাম, ইহার প্রচারে কাহারও কিছু উপকার হইতে পারে। এখন সে অভিমান দূর হইয়াছে। সংসারে এক জন মানব সাগর-সৈকতে এককণা বালুকামাত্র। সে আপনাকে যতই বড় মনে করুক না কেন—সংসারে তাহার প্রয়োজন, ঐ সাগরতটে বালুকাকণার প্রয়োজনের মত; বিশেষ, আজ আপনার কথায় আমার ভ্রমের শেষটুকুও অপনীত হইল। আপনি আমার জীবন-কথা জানিতে চাহিয়াছেন। ঐই খাতায় তাহা পাইবেন। কিন্তু এ খাতা শেষ করা পর্য্যন্ত আপনার অকারণ কৌতূহলোদ্দীপ্ত উৎসাহ থাকিবে কি না সন্দেহ।"

কিছুক্ষণ পরে আমি বিদায় লইলাম। বিদায়কালে সন্ন্যাসী বলি-

লেন, আমার অনুরোধ, দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এ খাতা পাঠ করিবেন না।"

পরদিন প্রাতে যাইয়া সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইলাম না।

দুই দিন পরে আমি দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিলাম; দার্জ্জিলিং ছাড়াইয়া খাতাখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম। যত পড়িতে লাগিলাম, ততই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। শেষে নিশাশেষে খাতা শেষ করিয়া তবে নিদ্রার আয়োজন করিলাম। মনে হইল, প্রথম যৌবনে প্রথম উপন্যাস ব্যতীত আর কোনও পুস্তক এমন সাগ্রহে পাঠ করি নাই।

পরদিন গৃহে আসিলাম। যেন কত দিন প্রবাসে ছিলাম! আবার পরিচিত স্নেহের মধ্যে আসিয়া যে শান্তি ও সুখ পাইলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। গৃহিণী যখন আমার আহারের সময় নিকটে বসিয়া "এটা খাও, ওটা খাও, আর দুটি ভাত ভাঙ্গ" ইত্যাদি বলিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে সন্ন্যাসীর কথা বলিলাম, এবং আহারান্তে তাঁহাকে খাতা দিলাম।

রাত্রিকালে শয়নকক্ষে যাইয়া দেখি, গৃহিণী টেবলের নিকট চেয়ারে বসিয়া আছেন, সন্ন্যাসীর খাতা সম্মুখে রহিয়াছে। আমার পদশব্দে গৃহিণী ফিরিয়া চাহিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পড়িয়া কি নায়কের জন্য দুঃখ হয়?"

গৃহিণী বলিলেন, "হাঁ।"

"আর নায়িকার জন্য?"

"দয়া।"

"প্রথমে সন্ন্যাসীর বিশ্বাস ছিল, এই জীবন-কথার প্রচারে কাহারও কোনও উপকার হইতে পারে। শেষে তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

"তাঁহার পত্নী যেমন তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিল, তিনিও এ সম্বন্ধে সব মানুষকে তেমনই ভুল বুঝিয়াছেন।"

"লোক পড়িবে কি?"

"এ হৃদয়-শোণিতে লিখিত যাতনার কথা পড়িবে না?"

"ছাপাইব?"

"হঁা।"

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "খরচ কে দিবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "আমি।"—তাহার পর "মৃদুস্বরে বলিলেন, অবশ্য তোমার বাক্স হইতে লইয়া!"

বাক্সের চাবি তাঁহারই অধিকৃত।

ইহার পর আমি স্ত্রৈণ যে গৃহিণীর সেই অশ্রুসিক্ত আনন চুম্বন করিলাম, তাহা অবশ্য বলা বাহুল্য।
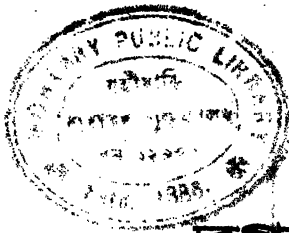
দগ্ধ হৃদয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে আমার জন্ম হয়। আজ কাল একান্ন-বর্ত্তী পরিবার বলিতে সাধারণতঃ—বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে—যাহা বুঝায়, আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারকে তাহা বুঝিলে অন্যায় করা হইবে। তখন একান্নবর্ত্তী পরিবারই সামাজিক নিয়ম ছিল—ব্যতিক্রম ছিল না। যখন একান্নবর্ত্তী পরিবার দেশের অবস্থা-বিবেচনায় একান্ত আবশ্যক ছিল, তখন যে বন্ধন একান্নবর্ত্তী পরিবারের কারণ ও জীবন ছিল, আমাদের পরিবারে সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এখন একান্নবর্ত্তী পরিবার এক গৃহে বাসের ও লোকের অনুপাতে ব্যয় দিয়া একত্র আহারের ব্যবস্থামাত্র। আর্থিক সুবিধার জন্য যতটুকু দরকার, তত-টুকু আত্মীয়তামাত্র; পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন লোকের অভাব অল্প ছিল—স্বার্থপরতার মাত্রাধিক্য ছিল না। তখন একান্নবর্ত্তী পরি-বারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবার একাধারে শিক্ষার ক্ষেত্র, সংযমের কেন্দ্র ও সুখের আগার ছিল। আমাদের পরিবারে

সেই পূর্ব্বভাবের তিরোভাব হয় নাই। তাহা পিতামহের ও খুল্লপিতামহের আদর্শের ও পুণ্যের ফল।

আমার পিতামহরা দুই ভ্রাতা ছিলেন। পিতামহ মহাশয় জ্যেষ্ঠ। তিনি গৃহেই থাকিতেন। গৃহে তিনিই কর্ত্তা। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দারোগা ছিলেন। তখন দারোগা বর্ত্তমানকালের পুলিস-ইন্স্পেক্টার ছিলেন না। তখন এ দেশে ইংরাজের শাসন-যন্ত্র সম্পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, গঠিতই হয় নাই; কেবল তাহার গঠনের উদ্যোগ হইতেছে। তখন ইংরাজ দেশের প্রকৃত অবস্থাবিষয়ে অজ্ঞ; তখন দারোগার প্রভাব ও প্রতাপ অসাধারণ ও অক্ষুণ্ণ। তখনকার স্মৃতি বক্ষে লইয়া কোনও বৃদ্ধা একবার মোকদ্দমায় সুবিচার পাইয়া জিলার জজকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, "সাহেব! তুমি দারোগা হও।" খুল্লপিতামহদেবের আয় প্রচুর; প্রতাপ প্রবল। কিন্তু গৃহে তিনি সর্ব্ব বিষয়ে জ্যেষ্ঠের অধীন। আপনার আবশ্যক ব্যয়-নির্ব্বাহের পর উপার্জ্জিত অর্থের অবশিষ্ট অংশ তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। পিতামহদেব সেই অর্থে সর্ব্বপ্রথম গ্রামের নিম্নে নদীর ঘাট বাঁধাইয়া দ্বাদশটি শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দিরপুঞ্জ বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত—বৃক্ষলতার শ্যামশোভার মধ্যে তাহাদের শ্বেত সৌন্দর্য্য যেন আরও সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল বোধ হইত। এখন গ্রাম শ্রীহীন; নদী মজিয়া গিয়াছে; ঘাট ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পিতামহদেব গ্রাম হইতে আসিবার সময় মন্দিরে শিব-পূজার জন্য নিষ্কর জমী দিয়া যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের অভাবে মন্দিরে অশ্বত্থ তাহার সর্ব্বগ্রাসী মূল বিস্তৃত করিতেছে। কেবল

এখনও পিতামহদেবের কীর্ত্তি গাম হইতে বাদশাহী রাস্তা পর্য্যন্ত গঠিত রাজপথে আমাদের পরিবারের নাম ও স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। তখন অর্থ বিলাসের জন্য ব্যয়িত হইত না; লোকের হিতকর অনুষ্ঠানে উৎসৃষ্ট হইত।

কিছুকাল দারোগার কার্য্য করিয়া—নানা স্থানে ঘূরিয়া খুল্লপিতামহ দেবের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়; তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গৃহে আইসেন। গৃহে চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় তাঁহার পীড়া দূর হয় বটে, কিন্তু তিনি আর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়েন নাই। বিশেষ, কন্যার বৈধব্য তাঁহার অসীম ক্লেশের কারণ ছিল। দুই বৎসর পরে শীতের শেষে তাঁহার জ্বর হইল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কয় দিনেই কবিরাজ ও রোগী উভয়েই বুঝিলেন, চিকিৎসায় কোনও ফল হইবে না। ক্রমে পীড়া বাড়িয়া উঠিল। শেষে একদিন প্রাতে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। পিতামহদেব বিষণ্নমনে পূজা করিতে যাইলেন। তিনি পূজা শেষ করিয়া মুক্ত ছাতে আসিয়া সূর্য্য-প্রণাম করিতেছেন, এমন সময় পিতৃব্যের শয্যাপার্শ্ব হইতে আমার পিতৃদেব ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। পিতামহ উন্মত্তের মত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জ্যেষ্ঠকে দেখিয়া কনিষ্ঠ ডাকিলেন,—"দাদা!" "কি ভাই?" বলিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মস্তকে করতল সংস্থাপিত করিলেন। কনিষ্ঠের বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না! তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পিতামহী কাঁদিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, ছোট বধূর কোনও কথা বলিবে কি?" মরণাহত কনিষ্ঠ শিরঃসঞ্চালনে বলিলেন,—"না।" তিনি একবার ঊর্দ্ধে ও একবার জ্যেষ্ঠের দিকে দেখাইয়া মনের ভাব প্রকাশ করি-

লেন,—"উপরে দেবতা আছেন—পৃথিবীতে দাদা রহিয়াছেন। আর বলিব কি?" সেই দিন তাঁহার প্রাণান্ত হয়। পিতামহের স্নেহ-প্রবণ হৃদয় হইতে ভ্রাতৃশোক-শেল কখনও অপনীত হয় নাই। তিনি বলিতেন, ভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁহার অর্দ্ধ অঙ্গ যেন অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পরিবারে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। পিতামহদেবের দুই পুত্র—আমার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা, এবং খুল্লপিতামহদেবের এক পুত্র ও এক কন্যা—কাকাবাবু ও পিসীমা। পিসীমা বিবাহের এক বৎসর পরে বিধবা হয়েন। এই দুর্ঘটনায় পরিবারে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল। খুল্ল-পিতামহের মৃত্যুতে সে ছায়া ঘনীভূত হইল।

পিতামহদেব আপনার ও ভ্রাতার সন্তানদিগের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করিতেন না; বরং বিধবা বলিয়া পিসীমা ও পিতৃহীন বলিয়া কাকাবাবু তাঁহার স্নেহ ও যত্ন যেন সমধিকপরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনায় তাঁহার চরিত্র ও ব্যবহার বুঝা যাইবে। জ্যেঠামহাশয় মুন্‌সেফ ছিলেন। তখনও পরিবার সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থানে গমনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন পিতা ও কাকাবাবু উভয়েই ছাত্র। কৃষ্ণনগরে বাসায় থাকিয়া তাঁহারা কলেজে পাঠ করেন। উভয়েই বিবাহিত। একবার শারদীয়া পূজার সময় গৃহে আগমনকালে জ্যেঠামহাশয় পরিবারের সকলের জন্য বস্ত্র ও নিঃসন্তান জ্যেঠাইমার জন্য একখানি অতিরিক্ত বস্ত্র—বালুচরের শাটী—আনিয়াছিলেন। সে কথা পিতামহদেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি ঐ বস্ত্রখানি চাহিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া সমান তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন, এবং বধূত্রয়ের প্রত্যেককে এক খণ্ড দিয়া বলেন, "মা'রা দেখ, মহিমা তোমাদের

পুতুলের কাপড় করিবার জন্য কেমন সুন্দর শাটী আনিয়াছে।” এই ব্যবহারে পরিবারের সকলেরই যে শিক্ষা হইয়াছিল, সেই শিক্ষার ফলে আমাদের পরিবার পরবর্ত্তী দুই পুরুষ পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী ছিল। যে স্থলে গৃহকর্ত্তা এইরূপ আদর্শ দেখাইতে পারেন, তথায় একান্নবর্ত্তী পরিবার সত্য সত্যই সুখের হয়।

খুল্লপিতামহের মৃত্যুর পর নয় বৎসর কাটিয়া গেল। সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। তাহার পর একটা অতর্কিত ব্যাপারে বাঙ্গালার সামাজিক জীবনে বিষম বিপ্লব হইয়া গেল; পল্লীপ্রাণ বাঙ্গালার পল্লী পরিত্যক্ত হইল; জনাকীর্ণ নগরের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন হইল। সে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের কয় বৎসর পরের কথা। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালার পল্লীর স্বাস্থ্য ভালই ছিল;— স্বাস্থ্য, স্বচ্ছলতা ও সুখ তখন পল্লীবাসীর নিত্য ভোগ্য ছিল। এই বৎসর সহসা ম্যালেরিয়া মহামারী-রূপে আবির্ভূত হইল; বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে শোকার্ত্তের করুণ ক্রন্দনে তাহার অট্ট-হাসি ধ্বনিত হইতে লাগিল।

পরিবার, পল্লী, গ্রাম জনশূন্য হইতে লাগিল। এক এক পরিবারে সকলেই পীড়িত, কে কাহার মুখে জল দেয়? পীড়িত, উত্থানশক্তিরহিত পিতার শয্যার পার্শ্বেই অপর শয্যায় পুত্র মৃত্যুর স্পর্শে রোগযাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে; অদূরে অভাগিনী জননীর যাতনা-ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরও দারুণ দৌর্ব্বল্যে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। দিবাভাগে শৃগাল কুক্কুর গৃহ হইতে শব লইয়া প্রাঙ্গণে বা রাজপথে আমিষের জন্য কলহ করিতেছে। বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে। গ্রামে কয় বৎসর

পরে মহামারীর আবির্ভাব হইল। তখন পিতা ও পিতৃব্য কৃষ্ণনগরে; মা ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে ও কাকীমা আসন্নপ্রসবা বলিয়া পিত্রালয়ে, জ্যেঠামহাশয় কর্ম্মস্থলে। গৃহে পিতামহ, পিতামহী, খুল্লপিতামহী, পিসীমা ও জ্যেঠাইমা। পিতামহ বিপন্ন হইয়া জ্যেঠামহাশয়কে গৃহে আসিতে লিখিলেন। সে পত্র পাইয়া জ্যেঠামহাশয় গৃহে আসিলেন; জ্বর লইয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া জ্বর বাড়িল। কোথাও যাইবার উদ্যোগ স্থগিত হইল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। এ দিকে গৃহে পিতামহী ও খুল্লপিতামহী জ্বরে পড়িলেন। সাত দিনের মধ্যে তিন জনের জীবন শেষ হইল।

এ বজ্রাঘাতে পিতামহদেবের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিনি অসাধারণ সহিষ্ণুতাবশে বিচলিত হইলেন না। কেবল তাঁহার সবল দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; পিসীমা'র অবিশ্রান্ত যত্ন ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও তাঁহার দেহে জরার দ্রুতগতি রোধ হইল না। শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। তখন পিতামহ পুত্রকে বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, হইয়াছে। সংসারে থাকিলে এ ভোগ অনিবার্য্য। সংসারে আমার কাজও শেষ হইয়াছে, তোমরাও স্বাবলম্বনক্ষম হইয়াছ। আমি কাশীবাস করিব। মহামায়া (পিসীমা) আমার সঙ্গে যাইবে। আমার দেহান্ত হইলে যদি সে কাশীতেই থাকিতে চাহে, তাহার আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া দিও। আর যদি তাহাকে সংসারে ফিরাইয়া আন—তবে তাহাকেই গৃহের কর্ত্রী করিও। ইহাই আমার শেষ অভিপ্রায়।" পিতা এ প্রস্তাবে অনেক আপত্তি করিলেন, পিতামহের সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। কিন্তু কাকাবাবু যখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিলেন, "আমি

আপনাকে যাইতে দিব না", তখন পিতামহের হৃদয়ে ভ্রাতৃশোকও যেন নূতন হইয়া উঠিল। তাঁহার দুই নয়নে অশ্রু ঝরিয়া চরণে পতিত ভ্রাতুষ্পুত্রের মস্তকে যেন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিল। পিতামহ বলিলেন, "বাবা, এখন আমার সংসার হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করাই তোমাদের কর্ত্তব্য।" কিন্তু পিতার আপত্তিতে যাহা হয় নাই, পিতৃব্যের অশ্রুজলে তাহা হইল। কারণ, পিতৃহীন কাকাবাবু পিতামহদেবের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। কিন্তু গ্রামের স্বাস্থ্যের ও পিতামহের মানসিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির হইল, সকলে কোনও নগরে যাইয়া বাস করিবেন। কোথায় যাওয়া যায়? কৃষ্ণনগর পরিচিত—কলিকাতার তখন নূতন সমৃদ্ধি-সঞ্চার। প্রথম কৃষ্ণনগরে বাসের কথা উঠিল। কিন্তু তখন অঞ্জনার তীরে মহামারীর বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। কাজেই সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। গঙ্গাতীরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করাই স্থির হইল।

আবশ্যক জমী দিয়া দেবসেবার ব্যবস্থা করিয়া, গোশালার গাভীগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, গৃহ-বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া পিতামহদেব গ্রাম ত্যাগ করিলেন। গ্রামের লোক বলিল, গ্রামের সর্ব্বনাশ হইল।

পিতামহ আর গ্রামে যায়েন নাই। পিতা ও পিতৃব্য কয়বার গিয়াছিলেন: শেষে নানা অসুবিধায় "কালে-ভদ্রে" যাওয়া হইত। আমরা একবার বিপদের আশঙ্কায় গ্রামে গিয়াছিলাম। কলিকাতায় যেবার প্রথম "প্লেগ" দেখা দেয়, সেইবার নানারূপ জনরবের অতিরঞ্জিত কথায় ভীত হইয়া আমি ও বড়দাদা দেশের বাড়ীর অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলাম। গ্রামে গিয়া আমরা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে কলিকাতার

প্লেগের ও প্লেগবিধির ভয়ও আমাদিগকে আর গ্রামে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; ভগ্নস্তূপে তরুলতাগুল্ম জন্মিতেছে; এককালে অধিবাসীদিগের কণ্ঠস্বরধ্বনিত গৃহের অভ্যন্তর হইতে শ্বাপদের গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। প্রসন্ন-সলিলা দীর্ঘিকা জলজগুল্মপূর্ণ। পথ কর্দ্দমাক্ত। গ্রামবাসীদিগের মুখে প্রফুল্লতার ও দেহে স্বাস্থ্যের চিহ্নমাত্র নাই। গ্রামের উপর যেন মৃত্যুর নিবিড় ছায়া ঘন হইয়া আসিয়াছে। গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি কল্পনা করাও অসম্ভব। গ্রাম দেখিয়া দাদা আমাকে বলিলেন, "গ্রামের দশা দেখ। বাঙ্গালার পল্লী দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গালীর ধ্বংসের আর অধিক বিলম্ব নাই।" বিষণ্ণ-মনে সেই কথার আলোচনা করিতে করিতে আমরা কলিকাতায় ফিরিলাম। আমার একবার মনে হইল, অন্য দেশেও ত পল্লীগ্রাম আছে। আমাদের দেশেই পল্লীগ্রামের এ দুর্দ্দশা কেন? যদি আমরা রণবিমুখ না হইয়া—পল্লী পরিত্যাগ না করিয়া—পল্লীর উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হই, তবে কি পল্লীর দুর্দ্দশা দূর হয় না? আর সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানের একটা উপায় হয় না? চাকরী কয়টা মিলে? ওকালতী, ডাক্তারী, দালালী—আর কত লোকের ভরণ-পোষণের উপায় করিবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, স্থির কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তখন হইতে আমরা কলিকাতার বাসিন্দা। কলিকাতাতেই কাকাবাবুর পুত্রের ও কন্যা-দ্বয়ের, এবং আমার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রাতার ও আমার জন্ম হয়। কলিকাতার শ্মশানে পিতামহদেবের, পিতার, পিতৃব্যের ও পিতৃব্যপত্নীর দেহ ভস্মীভূত করিয়া বিষণ্ণ-মনে বশদ-বসনে গৃহে ফিরিয়াছি। গ্রামের

সহিত আমাদের সম্বন্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। পল্লী-জননী তাঁহার অযোগ্য সন্তানদিগকে আর অঙ্কে লইতে পারেন নাই; আমরাও মাতৃ-অঙ্কচ্যুত হইয়া "স্রোতের শেয়ালা"র দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। কলিকাতা যেন আমাদিগকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করে নাই; পরন্তু সপত্নীপুত্রভাবে দেখিয়া তাহার স্নেহে আমাদিগের অনধিকারের কথা অবসর পাইলেই বুঝাইয়া দিয়াছে। তাই কলিকাতাবাসীরা আজও আমাদিগকে সাক্ষাতে "মফঃস্বলের লোক" ও অসাক্ষাতে "পাড়াগেঁয়ে ভূত" বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। যেন, তাহাদের নগরের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে আর মনুষ্য-নামের—শ্রদ্ধার কিছুই থাকিতে পারে না। এই অকারণ অভিমান সর্ব্বদেশে নগরবাসীদিগের ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু কোনও দেশেই নগরবাসীরা পল্লীবাসীদিগের অপেক্ষা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

পিতামহদেব কখনও আপনাকে কলিকাতাবাসী বলিয়া পরিচয় দেন নাই। তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত কাকাবাবুও বাসস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই সুদূর পল্লীভবনের কথাই বলিতেন। তাহার পর আমাদের সব সামাজিক কাজ কলিকাতায় বা কলিকাতা অঞ্চলেই হইয়াছে। আমাদের আর যে পরিবর্ত্তন হউক না কেন—আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত, এবং সে পরিবারের আদর্শ প্রায় পূর্ব্বেরই মত ছিল। পরিবর্ত্তনের মধ্যে বধূরা "হাতখরচ" বলিয়া প্রতি মাসে কিছু অর্থ পাইতেন, আর তাঁহাদের নিত্যব্যবহার্য্য ব্যতীত অন্য অলঙ্কারও তাঁহাদের আপনার আপনার গহনার বাক্সে থাকিত; বাক্সগুলি লোহার সিন্দুকে থাকিত; সে সিন্দুকের চাবীতে পিসীমা ব্যতীত আর কাহারও অধিকার ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংসার

সংসারের ভার ভিতরে পিসীমা'র ও জ্যেঠাইমা'র, এবং বাহিরে কাকাবাবুর হাতে ছিল। পিতামহদেবের জীবিতকাল হইতেই এই ব্যবস্থা ছিল—তিনি স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে ধর্ম্মকর্ম্মেই কাল কাটাই-তেন। বাবা কলিকাতায় আসিয়া একটা সওদাগরী হৌসে মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। হৌসের কাজ ক্রমে এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার আর সংসার দেখিবার সময় ছিল না। হৌসের ইহুদী স্বত্বাধিকারী তাঁহার উপর সব কাজের ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় বৎসরে ছয় মাস বিলাতে থাকিতেন। কাজ বাবাই করিতেন। বাবা কাকাবাবুকেও কাজে লইতে চাহিয়াছিলেন। পিতা-মহ তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, যে সংসারটার জন্যই এত, সে সংসারটাই কি দেখিবার দরকার নাই? সেকালে যে এক ভাই উপার্জ্জন করিতে যাইত—আর ভাই বাড়ীতে থাকিত, সে সংসার দেখিবার জন্য। তিনি বলিতেন, উপযুক্ত গৃহকর্ত্তা নৌকার হাল। কাকাবাবু সংসার দেখিতেন,—আর আমাদের লইয়া থাকিতেন; আমরাও চারি ভাই, দুই ভগিনী তাঁহাকে পাইলে আর কাহাকেও চাহিতাম না। চারি ভ্রাতার মধ্যে দাদা ও কাকাবাবুর পুত্র সেজদাদা বাবার হৌসে কাজ করিতেন। বাবা সেজদাদা কার্য্যক্ষম হইলেই তাঁহাকে সঙ্গে লইতে

আরম্ভ করেন। বাবার মৃত্যুর পর স্বত্বাধিকারীরা দাদাকেও ডাকিয়া লইয়াছিলেন,—তৎপূর্ব্বে দাদা সরকারী চাকরী করিতেন। মেজদাদা প্রভাস কিছু করিতেন না। তিনি পঠদ্দশায় পাঠেই অখণ্ড মনোযোগ দিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর এম, এ, পরীক্ষা দিয়াছিলেন, সেই বৎসরই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার বাক্সে একখানি খাতা মেজদাদার হস্তগত হয়। তাহাতে তাঁহার পত্নী আপনার কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন। মেজদাদা যে পাঠেই তন্ময় থাকিতেন, তাহাতে তিনি উপেক্ষিতা—স্বামীর অযোগ্যা বলিয়া অনাদৃতা, এই বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই কথা পাঠ করিয়া মেজদাদা শোকে ও দুঃখে এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, বিপত্নীক বিলাস-বর্জ্জিত জীবনযাপন করিতেন,—অধ্যয়ন আর পত্নীর স্মৃতি লইয়াই তিনি থাকিতেন। কাকাবাবু এই বিষন্ন—ব্যথিত পুত্রকে যেন সতর্ক স্নেহে সর্ব্ববিধ অসুবিধা হইতে অব্যাহতি দিতেন। মেজদাদাকে তিনি যেমন যত্ন করিতেন, মাও তেমন যত্ন করিতে পারিতেন না। প্রেমের পবিত্রতাসম্বন্ধে কাকাবাবুর ধারণা যেন মেজদাদায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। কাকাবাবুর ইচ্ছায় পিসীমা, জ্যেঠাইমা, মা, কাকীমা, কেহ কোন দিন তাঁহার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের কথা উত্থাপিত করিতেও সাহস করেন নাই। কাকাবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহের বিরোধী ছিলেন। ভগিনীরা উভয়েই কাকাবাবুর কন্যা—এক জন আমার বড়, কেবল অপর্ণা আমার ছোট।

আমি এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। আজ যখন দূরদেশে নূতন অবস্থায় আমি সেই পরিবারের কথা মনে করি, তখন সেই পরিবার আমার কাছে সর্ব্ব-শান্তি-সুখ-সমুজ্জ্বল আদর্শ পরিবাররূপে

প্রতিভাত হয়। সে কি কেবল দূরত্বের ব্যবধানহেতু,—অনধিগম্যতার অনিত্য বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া? কিন্তু আমি ত কেবল দূরে আসিয়াই তাহার এ রূপ দেখিতেছি না? আমি সে পরিবারে বাসকালেও তাহার এই রূপ দেখিয়াছিলাম,—আর দেখিয়াছিলাম বলিয়াই তাহার মধ্যে আমার অবস্থানের অসঙ্গতি অনুভব করিয়া আপনাকে তাহার নির্ম্মল বক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম। সে কি বড় সুখের? সে সংসার কি আজও তেমনই আছে? অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন কি তাহাতে প্রবেশাধিকার পায় নাই? আমি সে কথা মনে করিব না—শোক-তপ্ত পিতৃ-হৃদয়ে অকালকালাহত সন্তানের মুখস্মৃতির মত আমার মনে সেই স্মৃতি অপরিবর্ত্তিতই থাকিবে।

কিন্তু জগতে কি অঘটনই ঘটিয়া থাকে! সামঞ্জস্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রবর্ত্তিত করিয়া বিষম বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে কি হৃদয়হীন স্রষ্টার কোন আনন্দ হয়? না, তিনি মানব-বুদ্ধির সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা দেখাইবার জন্যই মধ্যে মধ্যে এমন ঘটনা ঘটান, যাহাতে তাহার বহুকালের অনুসন্ধানের ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে গঠিত মত এক দিনে চূর্ণ হইয়া যায়? নহিলে যে সংসার অনুত্থিততরঙ্গ সাগরের মত শান্ত, সে সংসারে আমার হৃদয়ে প্রলয়-ঝটিকার চাঞ্চল্য জন্মিল কেমন করিয়া? যে সংসারে কাকাবাবুর প্রেমাদর্শই গৃহীত,—যে সংসারে মেজদাদার চরিত্রাদর্শ মেঘহীন গগনে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ মাধুরী বিস্তার করিত, সে সংসারে আমি কেমন করিয়া বিবেচনাবিহীন হইয়া ভ্রান্তি-পথের পথিক হইয়াছিলাম? আমার ব্যবহারে তাঁহাদের বেদনার তুলনায় আমার কষ্ট কত সামান্য! আর যে সংসারে পিসীমা'র, জ্যেঠাইমা'র, কাকীমা'র ও

মা'র আদর্শ আত্মত্যাগের শিক্ষাই সমুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, সে সংসারে বিলোলা—! হায় নারী, সংসারের কল্যাণ-কামনায় কল্পিতা হইয়া তুমি তোমার নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বিস্মৃত হও কেন?

এই পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার অভাব ছিল না। অর্থের অভাব—স্নেহের অভাব—আদর্শের অভাব—কোনও অভাবই আমার ছিল না। আমি এ সকলের প্রাচুর্য্যেই অভ্যস্ত ছিলাম। আর শিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কিতাবতী শিক্ষা উপাধির ছাপ পাইলেই সফল ও সমাদৃত হয়, সে শিক্ষারও অভাব আমার ছিল না। তথাপি অভাবের উত্তেজনায় আমি আদর্শ-চ্যুত হইয়াছিলাম, আজও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট—কক্ষচ্যুত উল্কার মত বহ্নিদাহ ভোগ করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। কবে এ দাহের নির্ব্বাণ হইবে? কবে বিস্মৃতির অন্ধ অতলতলে স্মৃতির যাতনা জুড়াইবে? কবে আমি সেই সংসারে একবার যে শান্তির স্বাদ পাইয়াছিলাম, আবার সেই শান্তির স্বাদ পাইব? পাইব কি? হায় মানব-হৃদয়! তুমি প্রাচুর্য্যের মধ্যেও অভাবের সৃষ্টি করিয়া সেই স্বহস্তপ্রজ্বালিত অগ্নিকুণ্ডে আপনি দগ্ধ হও—শান্তিস্নিগ্ধ তপোবন হতাশার দাবদাহে বিনষ্ট কর! তোমাকে ধিক্! মানুষের এই চাঞ্চল্য—এই অশান্তি,ইহা তাহার পরীক্ষা? না—ইহা জন্মান্তরার্জ্জিত কর্ম্মফল—ভাগ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া আসিয়া অতীতের লূতাতন্তুজালে তাহাকে এমনই বেষ্টিত করে যে, তাহার আর স্বাধীন গতির উপায় থাকে না! এই চাঞ্চল্য-চঞ্চরীক মানব-হৃদয়-পদ্মে প্রবেশ করিয়া তাহার শান্তিমধু পান করিয়া শেষে দংশনবিষে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া যায়। কোথায় ইহার উৎপত্তি—কোন্ পথে ইহার

আগমন? মানুষ চেষ্টা করিলে কি ইহার গতিরোধ করিতে পারে? তাহা কি মানবের সাধ্যায়ত্ত?

বাবার মৃত্যু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শোকের ও দুঃখের কারণ হইলেও তাহাতে সংসারে তেমন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল না। আমার জীবনে আমি সেই প্রথম প্রবল শোক অনুভব করিলাম—মৃত্যু কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বাবা কাহারও কষ্ট দেখিতে পারিতেন না—রোগীর কাছে বসিতে পারিতেন না—তিনি রোগযাতনা ভোগ না করিয়া মৃত্যুসুপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিলেন—সে দিন বড় গুমট। তিনি হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া দক্ষিণের বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসিলেন। কাকাবাবুও তথায় ছিলেন। পার্শ্বে—ঘরে দাদার বড় মেয়ে চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িয়া গেল—কাঁদিয়া উঠিল। বাবা ও কাকাবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উঠিয়াই বাবা বামকরতল বক্ষে চাপিয়া বিকৃতকণ্ঠে কাকাবাবুকে ডাকিলেন—"প্রকাশ!" কাকাবাবু ফিরিয়া দেখিলেন, তিনি পড়িয়া যাইতেছেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া জ্যেষ্ঠকে ধরিলেন—তাঁহার মস্তক কনিষ্ঠের স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িল। কাকাবাবু তাঁহার শব আরাম-কেদারায় শায়িত করিলেন। এই মৃত্যু! এত সুন্দর—এ ত সুপ্তিশান্তি! বাবার মুখে যাতনার চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু বাবার ঘুম আর ভাঙ্গিবে না? আর তাঁহার মৌন স্নেহ লাভ করিতে পারিব না? তিনি সংসারে নাই—কিন্তু—আমার হৃদয়ে—আমার জীবনে তিনি যে স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন, তাহা ত তাঁহারই অধিকৃত! তবুও কাঁদি কেন? কেন কাঁদি, বুঝিতে পারি না, কিন্তু অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ করিতেও ত পারি না!

বাবার স্থানে সেজদাদা ও সেজদাদার স্থানে বড়দাদা আফিসে কাজ করিতে লাগিলেন। বাবা সংসারে কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাই সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। আমিও ক্রমে নানা কাজে শোকের প্রাবল্যমুক্ত হইলাম। কেবল এই অতর্কিত দুর্ভাগ্যে মা'র বৈধব্যবজ্রবিদীর্ণ হৃদয় হইতে সকল সুখ অন্তর্হিত হইল—মা'র মুখে আর কখনও হাসি দেখি নাই। আর কালের ভেষজেও কাকা-বাবুর হৃদয় হইতে শোকক্ষত অন্তর্হিত হয় নাই। একান্নবর্ত্তী পরি-বারের কর্ত্তার দায়িত্বও যেন তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।

বাবার মৃত্যুর পর এক বৎসর কাটিয়া গেল। পিসীমা আমার বিবা-হের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। সেবার আমার বি, এ, পরীক্ষা—আমি সেই অছিলায় বিবাহ করিতে আপত্তি করিলাম। আমার আপত্তি টিকিল বটে, কিন্তু অপর্ণা একটু বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। অপর্ণা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সর্ব্বকনিষ্ঠ—কিছু অধিক আদরের। বিশেষ, বাবার কাছে সে অতিরিক্ত আদর পাইত—পিতামহীর মুখের সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া, বাবা তাহাকে "মা ঠাকরুণ" বলিয়া ডাকিতেন। আবার শ্বশুরালয়েও তাহার অতিরিক্ত আদর ছিল। সে এক ঘরের এক বধূ—শাশুড়ীর আদরের। তাহার স্বামী অনুকূলচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়াছে। অপর্ণা কাহাকেও "ঢুকিয়া" কথা বলিত না। সে বলিল, "কেন ছোটদাদা, বিবাহ করিয়া কি কেহ পরীক্ষা দেয় না? না—বৌ আসিলে বহি পোড়াইতে হয়? আসল কথা, তোমার কবিতা-রোগ জন্মিয়াছে। তুমি আমার কথা শুন, ও রোগ সারিতে বিবাহের মত

ঔষধ আর নাই।” আমি কবিতা লিখিতাম, অপর্ণা তাহা জানিত তাহার কাছে কিছু লুকাইয়া রাখা অসম্ভব ছিল। সে টেবলের পুস্তকাদি নাড়িয়া—খাতা বাহির করিয়া সব দেখিত ; রাগ করিলে এমন হাসিত যে, সে হাসির স্রোতে রাগ ভাসিয়া যাইত। আমার বিবাহের জন্য কাকাবাবুরও কিছু আগ্রহ দেখা গেল। তিনি বলিতেন, “বিকাশের বিবাহ দিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। ইহাই আমার শেষ কাজ। তাহার পর ছেলেদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ—সে তাহারা বুঝিবে।”

তাহার পর আমার পরীক্ষাও হইয়া গেল। তখন কাকাবাবুও বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। তিনি সে কালের সঙ্গে এ কালের এমন সুন্দর সমন্বয় করিয়াছিলেন যে, তাহা যে দেখিত, সে-ই বিস্মিত হইত। তিনি পিসীমাকে ও জ্যেঠাইমাকে বলিলেন, “বিকাশ কেন নিজে মেয়ে দেখিয়া আসুক না।” পিসীমা বলিলেন, “কেন ? তোরা কি নিজেরা দেখিয়া বিবাহ করিয়াছিলি—না আর ছেলেদের নিজে দেখিয়া বিবাহ করিতে দিয়াছিলি যে, বিকাশের বেলায় এ কথা বলিতেছিস ?” কাকাবাবু বলিলেন, “এখন ত ছেলেরা নিজে মেয়ে দেখে।” তাহার পর তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “দিদি, তখন যে কাজ করিয়াছি, দুই ভাই মিলিয়া করিয়াছি। দোষ-গুণ সবই দাদার উপর পড়িত।” এই কথা শুনিয়া আমি কনে দেখিতে একেবারে অস্বীকার করিলাম—কাকাবাবুর স্নেহে যে আমরা পিতৃহীন হইয়া কোন দিন পিতার অভাব অনুভব করিতে পারি নাই !

বলিয়াছি, অপর্ণা এক ঘরের এক বধূ। তাহার পিত্রালয়ে আগমনই

সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠিত না—বাস ত পরের কথা। সে যে দিন আসিত, সকালে আসিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া যাইত। সে দিন সকালে চা খাইয়া ঘরে যাইয়া রাত্রিতে আরব্ধ একটা কবিতা শেষ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। দিনান্ত যেমন গগনে বিচিত্র বর্ণ মাখাইয়া—মুছিয়া যেন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, আমি তেমনই কতকগুলি চরণ লিখিতেছিলাম ও কাটিতেছিলাম; কিন্তু কিছুতেই মনের মত হইতেছিল না। সহসা পশ্চাৎ হইতে আমার ঘাড়ের উপর মেয়ে বসাইয়া দিয়া অপর্ণা বলিল, "এখন কবিতা লেখা রাখ, ভাগিনেয়ীকে লও।" কলম ফেলিয়া ভাগিনেয়ীকে লইয়া উঠিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন্ আসিলি ?" অপর্ণা বলিল, "এখনই আসিলাম—আবার যাইব। তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?" সে বলিল, "আমি তাহা কেমন করিয়া বলিব ? উনি বলিলেন, 'তোমার ছোটদাদাটি নিমন্ত্রণ না করিলে তোমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন না। কাল রবিবার আছে; তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।' আমি দূত—অবধ্য।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি কিন্তু 'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু অন্তরে'।" অপর্ণা বলিল, "তুমি আমার মেয়ের উপর একটা কবিতা লিখিয়া দাও।" আমি তাহার মেয়েটিকে আদর করিয়া বলিলাম, "তোর মেয়ের আবার কবিতা কি ? ও যে আপনি একটা কবিতা।" আমিই আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলাম,—

সে যে তখনই যাইবে না—যাইতে চাহিলেও যাইতে পাইবে না, তাহা আমি জানিতাম। খানিকটা পরে তাহার কাছে তাহার মেয়ে

দিতে যাইয়া দেখিলাম, কাকাবাবু, দাদা, পিসীমা, জ্যেঠাইমা ও অপর্ণা পরামর্শ করিতেছেন। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম—গোপনে পরামর্শ করা ত অপর্ণার ধাতুতে নাই! অপরাহ্ণে যে ভৃত্য শ্বশুরালয় হইতে অপর্ণাকে লইতে আসিল, সে অনুকূলের এক পত্র আনিল—

"ভায়া হে—

পড়েছ অনেক পড়া, লিখেছ অনেক,
কোন্ ছলে দেখা নাহি দিতেছ বারেক?
কবি তুমি, কবিতায় চিঠি লিখি তাই—
কা'ল দিনে ঠিক যেন দেখা তব পাই।"

পরদিন অনুকূলের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। আহারে, গল্পে, আমোদে দিন কাটিয়া গেল। অপরাহ্ণে বাড়ীর মধ্যে মা'র তলব আসিল—তাঁহার কাছে যাইয়া খাবার খাইব। আমি খাবার খাইতে বসিলে মা আসল কথা বলিলেন, তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। মেয়েটিকে দেখিয়া অপর্ণা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়াছে, তাহাকে ভ্রাতৃজায়া করিবে। ষড়্‌যন্ত্রটা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আজ পিত্রালয়ে যাইয়া অপর্ণা তথায় সকলকে তাহার দলভুক্ত করিয়া আসিয়াছে। আমি বলিলাম, "মা, আপনিও ছেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন?"

মা হাসিলেন।

অনুকূল বলিল, "মা বেগতিক দেখিয়া প্রবল পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে তোমার ভগিনীর যন্ত্রণায় আমার মা'র প্রাণ এতক্ষণ ওষ্ঠাগত হইত।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ মেয়ে বাবা।" বলিয়া মা উঠিয়া গেলেন।

এই সময় অপর্ণা অবেণীবদ্ধকুন্তলা, বিশালায়তলোচনা বিলোলাকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার বেশভূষায় সজ্জার চেষ্টা ব্যক্ত হয় না। তাহার সজ্জার প্রয়োজন ছিল বলিয়াও মনে হইল না।

আমি কনে দেখিয়া আসিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিলোলা

আমার কনে দেখা ও বিবাহ, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান বড় অধিক হইল না। কারণ, কন্যাপক্ষ আমাকে অপাত্র মনে করিলেন না। আর বর-পক্ষ অপর্ণার মুখে ঝাল খাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। বিবাহে দরের কোনও কথা ছিল না,—আড়ম্বরও অধিক ছিল না। ঘটক অনুকূল। আমাদের পরিবারে বিবাহের পর এক বৎসরে মধ্যে বধূ আনিবার প্রথা ছিল না। এ ক্ষেত্রে কাকাবাবু সে প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, পূর্ব্বে যখন বালিকা বধূকে আনিতে হইত, তখন এ প্রথার সার্থকতা ছিল; এখন বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে—বধূ কিশোরী, এ অবস্থায় পূর্ব্ব-প্রচলিত নিয়মের পরিবর্ত্তনই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কাকাবাবুর যুক্তির অস্ত্র পিসীমা'র সংস্কারের পাষাণ-প্রাচীরে প্রহত হইয়া আর অগ্রসর হইল না। পিসীমা বলিলেন, চৌদ্দ পুরুষের চলিত নিয়ম, তিনি ভাঙ্গিতে দিবেন না। যুক্তি-প্রয়োগের আর অবসর রহিল না। কাকাবাবু পরাজয় স্বীকার করিলেন। বিলোলা পিত্রালয়ে রহিল।

বিবাহের কয়দিন পরেই আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইল। মেজ-দাদার অধ্যাপনায় আমার পরিশ্রম আশাতীত সাফল্য লাভ করিল। অনুকূল সংবাদটি সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করিয়া সন্দেশ লইয়া সন্দেশের জন্য অপর্ণাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আমার এই সাফল্যে পুরস্ত্রীরা যখন নববধূর "পয়'

দেখিলেন, তখন কিন্তু অপর্ণা বলিল, "বিলোলার যে জোর কপাল, তাহা আমি আগেই জানি। ছোটদাদার সম্মুখে বলিলে খোসামোদ করা হয়; কিন্তু ছোটদাদার মত বর পাওয়া অনেক সাধনার কাজ। তবে এবার তাহার পয় বুঝা গেল না,—এ সে সস্তায় মস্ত খ্যাতি কিনিয়া লইল! পয় বুঝা যাইবে—ইহার পরে। আমি তাহাকে সে কথা বলিয়া আসিয়াছি।" জ্যেঠাইমা বলিলেন, "তুই বুঝি আগেই সেখানে ঝগড়া সারিয়া আসিয়াছিস্?" অপর্ণা হাসিয়া বলিল,—"নহিলে 'ননদিনী বাঘিনী' কথা সার্থক হইবে কেন?" জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কেন বাছা, আমাদের ননদ দেখিয়া শিখিতে পার না?" অপর্ণা হারিবার মেয়ে নহে, পিসীমা'র দিকে ফিরিয়া বলিল, "পিসীমা, সাম্‌নে ঐ কথা; পেছনে কি বলেন, কে জানে?" পিসীমা বলিলেন, "বড়বৌর যেমন কাজ নাই, তাই তোকে ঘাঁটাইয়াছে। তুই কথার ভটচার্জ্জি, তোর সঙ্গে কে পারিবে? অনুকূল ত অনেক দিন আসে নাই। আসে না কেন?" অপর্ণা পিসীমা'র উপর পড়িল, "তোমরা কি নিমন্ত্রণ কর? তোমাদের ছেলেরা বিনা নিমন্ত্রণে ভগিনীর বাড়ী যায় না। জামাইরা বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুরবাড়ী আসিবে কেন?" জ্যেঠাইমা বলিলেন, "তাহাও বটে। অনেক দিন আসিতে বলা হয় নাই।" অপর্ণা বলিল, "তাহাই বল জ্যেঠাইমা! এ কিন্তু তোমার ননদের দোষ।" অপর্ণা যে স্থানে থাকিত, সে স্থানই আনন্দের কিরণে সমুজ্জ্বল ও সুন্দর করিয়া তুলিত। যাইবার সময় সে আমাকে বলিল, "ছোটদাদা, তোমার চাইতে বিলোলা ভাল, সে তবুও সন্দেশ দিয়াছে।" আমি উত্তর দিলাম, "যাহাদের খাটিয়া খ্যাতি পাইতে হয়, তাহাদিগকে খাওয়ানই উচিত; আর যাহারা

ফাঁকি দিয়া খ্যাতি পায়, তাহাদের ত খাওয়াবারই কথা।” অপর্ণা বলিয়া গেল, “আমি বিলোলাকে এ কথা বলিব। তবে খাবার পেটে জুটিবে কি পিঠে জুটিবে, সে তোমার কপাল।

বিলোলা—আমার কল্পনা তাহাকে আমার আদর্শের সকল গুণে বিভূষিত করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। আমার ঘরে তাহার যে প্রতিকৃতি ছিল, আমার হৃদয়পটে প্রতিফলিত মূর্ত্তির তুলনায় তাহা তুচ্ছ ও ম্লান। সে প্রতিকৃতি প্রাণহীন—তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিবে কিরূপে? আমার মানসমূর্ত্তির মাধুরী যে কল্পনায় কত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা তখন বুঝিবার ক্ষমতা আমার ছিল না—যে বিশ্লেষণে হতাশা, সে বিশ্লেষণে যুবকের আগ্রহ থাকে না। আমি তখন স্বপ্নলোকে বাস করিতে-ছিলাম; শত কবির কল্পনাকুসুমকমনীয় সেই স্বপ্নলোক কেবল সৌন্দর্য্যের—কেবল আনন্দের। সমীরণলীলাকম্পিত তরুপল্লবের শোভায়, কুসুমের সৌরভে, মধুপের গুঞ্জনে, বিহঙ্গের বিরাবে, স্রোত-স্বতীর কলনাদে, রাকাচন্দ্রের বিরঞ্জনে সে স্বপ্নলোক সৌন্দর্য্যলোকে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। আর সেই স্বপ্নসৌন্দর্য্যলোকের সকল সৌন্দর্য্যের কেন্দ্র—আমার মানসবাসিনী—বিলোলা। মানুষ কবিতা লিখিয়া থাকে—কিন্তু মানুষ প্রেমাবেশে হৃদয়ে যে কবিতা অনুভব করে, তাহা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত প্রজাপতির পক্ষের চিত্র চিত্রকর চিত্রিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহা দেখিয়া মানুষের মনে যে আনন্দের উদয় হয়, তাহা ত চিত্রে ধরা পড়ে না। প্রেম বলিতে হয় বল—মোহ বলিতে হয় বল, ভ্রান্তি বলিতে হয় বল, কিন্তু এই বিপুল পুলকাবেগ পতি-পত্নীর মিলনানন্দে উদ্ভূত হয়। ইহা মর্ত্তে নন্দনের

আভাস—অমৃতের আস্বাদ। বিচ্ছেদে ইহা বিস্মৃতি-গর্ভে বিলয় প্রাপ্ত হয় না—বিবাদেও ইহা বিধৌত হয় না। ইহা স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া জীবনের সুখের কারণ হয়—দূরত্বের ব্যবধানে—মনোমালিন্যের মলিনত্বে ইহা ম্লান হয় না। ইহা বিলুপ্ত হইবার নহে। কে ইহা বিলুপ্ত করিতে চাহে? এই যে হৃদয়ে হৃদয়ে আকর্ষণ, হৃদয়ের তৃষ্ণা—হৃদয়ের ভাষা, ইহার স্বরূপ বুঝান যায় না। যে ইহা অনুভব না করিয়াছে, সে ইহার স্বরূপ বুঝিবে কিরূপে? কিন্তু এ অনুভূতি কি জীবনে একাধিকবার অনুভব করা যায়? আসঙ্গলিপ্সা যখন হৃদয়ের বাহিরে ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহা আর পূর্ব্বপ্রকৃতির থাকে না—তখন সে ধরার ধূলিস্পর্শে মলিন হইয়াছে। আমি তখন সেই অনুভূতির আনন্দে ধন্য হইয়াছি। আজও যে হৃদয় হইতে সে অনুভূতির বিলয় হয় নাই! তাহাতে সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই। যে আমার চিরকল্যাণময়ী না হইয়া অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়াছিল—আমি স্বয়ং কর্ত্তব্যচ্যুত—আত্মবিস্মৃত—উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যাহার ব্যবহারকে আমার ক্রটীর কারণ মনে করিয়া আত্মদোষ-ক্ষালনের বৃথা চেষ্টা করিয়াছি, সেই বিলোলার মিলনানন্দে—সেই আমার সকল সুখ ও সকল দুঃখ—পত্নীর মিলনে আমি সেই অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিলাম। আজও তাহার স্মৃতি হৃদয়ে সমুজ্জ্বল। তাহা সুখের—না দুঃখের?

এই এক বৎসরের মধ্যে যে আমার সহিত বিলোলার সাক্ষাৎ হইত না, এমন নহে। তবে সে সর্ব্বদা নহে। বিনা নিমন্ত্রণে আমি শ্বশুরালয়ে যাইতাম না সত্য—এবং সে জন্য শ্যালিকাদিগের গঞ্জনা সহ্য করিতাম, সেও সত্য; কিন্তু নিমন্ত্রণও হইত, এবং আমিও যাইতাম—আর সে যাওয়া সাগ্রহেও বটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, ও আইন পড়িতেছিলাম। এম, এ, পরীক্ষার পুস্তক লইয়া পড়িবার জন্য মেজদাদার কাছে উপস্থিত হইলে, তিনি সাগ্রহে পুস্তকগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "এখন কি আর তোমাকে পড়ান আমার বিদ্যায় কুলাইবে?" তাহার পর বলিলেন, "ভাল, পুস্তকগুলি রাখিয়া যাও—দেখি, পারি কি না।" তিনি তখন দর্শনের ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, তিন সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয় আমার অজ্ঞাত ছিল না। পরদিনই তিনি আমাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। দেখিলাম, অধ্যাপকের অধ্যাপনায় যাহা বুঝিতে পারিতাম না—মেজ-দাদার ব্যাখ্যায় তাহা সুস্পষ্ট হইত। তিনি পড়াইতে পড়াইতে লেখকের ভাবে যেন তন্ময় হইয়া যাইতেন—সেই ভাবের ভাবুক হইয়া ভাব বুঝাইতেন। শ্বশুরালয়ে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে জানিলেই তিনি আমাকে যাইতে বলিতেন। তিনি বিলম্ব করিয়া জীবনে যে সুখের আস্বাদে বঞ্চিত হইয়াছিলেন—যাহার অভাবে তাঁহার জীবন মরুভূমি হইয়াছিল, তাহার অপ্রাপ্তির জন্য তিনি আপনাকেই দোষী মনে করিতেন। পাছে আমি—তাঁহার স্নেহভাজন ভ্রাতা—নিজ কর্ম্মদোষে সে সুখলাভে বঞ্চিত হই, সেই আশঙ্কায় তিনি আমাকে যাইতে বলিতেন। তাঁহার অনুরোধ আমার পক্ষে আদেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার সেই আদেশে আমি তাঁহার জীবনের বেদনার পরিচয় পাইতাম—সে পরিচয়ে আমার হৃদয় বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিত।

বিলোলার সহিত আমার সাক্ষাৎ সর্ব্বদা হইত না বলিয়াই বুঝি সাক্ষাতের জন্য আমার আগ্রহ কিছুতেই মিটিত না। সে তৃষ্ণা অতৃপ্ত

বলিয়াই ত সুখের সীমা থাকে না। তখনও কর্ত্তব্য কঠোর হয় নাই—কুসুমহার আয়স-শৃঙ্খলে পরিণত হয় নাই। তখন সুখ সীমাহীন—আনন্দের অন্ত নাই, প্রীতি ফুরাইবার নহে, জীবন কুসুমিত কাননের মত শোভাময়। সে দিন আজ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত। কিন্তু সে দিনের স্মৃতি সুখের কি দুঃখের, তাহা আমি আজও স্থির করিতে পারি না। কখনও পারিব কি? কেহ বলেন, দুঃখের দিনে সুখের স্মৃতির মত দুঃখ আর নাই। কিন্তু অমাবস্যার রাত্রিতে ক্ষীণজ্যোতিঃ সুদূর নক্ষত্রের আলোক কি অন্ধকার অম্বর আলোকিত করে না? সে আলোক অন্ধকার বর্দ্ধিত করে না—দূর করে।

তাহার পর কত দিন ভাবিয়া দেখিয়াছি—স্মৃতির শরণ লইয়া দেখিয়াছি—আমার সহিত সাক্ষাতে বিলোলার নয়নে ও আননে আনন্দ-প্রফুল্ল দীপ্তি লক্ষ্য করিয়াছি। পাণ্ডুরোগগ্রস্ত রোগী যেমন যাহা দেখে, তাহাই পাণ্ডুরবর্ণে রঞ্জিত দেখে, আমি কি তেমনই আমারই হৃদয়-ভাব বিলোলার—আমার সেই মানসীর নয়নে ও আননে দেখিতাম? বোধ হয় আমি ভ্রান্ত হই নাই। কারণ প্রেম অন্ধ নহে—সে শ্যেন-দৃষ্টি। সে প্রণয়াস্পদের স্পন্দন পর্য্যন্ত সযত্নে ও সাগ্রহে লক্ষ্য করে, তাহাতে বিরাগের ছায়ামাত্র লক্ষ্য করিলে আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠে। সে ভুজপাশবদ্ধা প্রণয়িণীর অভিমান-স্ফুরিতাধরে তাহার আগ্রহের স্বরূপ সন্ধান করে—তাহাকে ছলনায় ছলিত করা নিপুণ অভিনয়পটুতা ব্যতীত কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আমি বিলোলাকে সে অভিনয়পটুত্বের গৌরব দিতে পারি না। তখনও তাহার অনাবিল হৃদয়ে ছলনার ছায়াপাতের কারণ ছিল না, তখনও তাহার প্রেমা-

লোকোজ্জ্বল হৃদয়ে বিরক্তির মেঘ দেখা দিবার কারণ ঘটে নাই। সেও তখন আমারই মত তাহার নবযৌবন-পুলকিত হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার অনুভব করিতেছিল—সেও রবিকরস্পর্শে প্রভাতপবনান্দোলিত নলিনীর মত আমারই প্রেমস্পর্শে হৃদয়ের সঞ্চিত সৌরভ লইয়া বিকশিত হইতেছিল। তখনও আমিই তাহার জগৎ পূর্ণ করিয়াছিলাম। তাহার পর যখন সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—যখন মনোমালিন্য তুচ্ছ উপাদানে জন্ম লইয়া দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধিত হইয়া আমার জীবন যাতনাময় করিয়াছে—যখন সে মনোমালিন্য আর গোপন করা সম্ভব হয় নাই, তখনও কোন দিন বিলোলাকে ছলনার আবরণে মনোভাব গোপন করিতে দেখি নাই—সে কোন দিন মনোভাব গোপন করে নাই; পরন্তু সে ভাব প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। তাহার ব্যবহারে ও তাহার বাক্যে আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছি, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছি, দেখিয়াও সে ভাব-গোপনের চেষ্টা করে নাই। আর যাহাই হউক, ছলনা যে তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

তবে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে কি স্বাভাবিক বৈষম্য-সঞ্জাত? মানুষে মানুষে—স্বামি-স্ত্রীতেও কি এত স্বাভাবিক বৈষম্য থাকে যে, প্রেমও তাহা দূর করিতে পারে না? প্রেম ত সত্য সত্যই অসম্ভবকে সম্ভব করে, পাষাণে প্রবাহিণী প্রবাহিত করে, উদ্‌ভ্রান্তকে শান্ত করে, পাপীকে পুণ্যবান্ করে। তবে কি আমারই প্রেমে কোনও দুর্ব্বলতা—কোনও ত্রুটী ছিল যে, তাহারই জন্য আমি তাহাকে আমার করিতে পারি নাই? বৈষম্য দূর করিতে না পারিয়া

বর্দ্ধিত করিয়া শেষে আপনার সুখস্রোতের গতি রুদ্ধ করিয়াছি? ক্রটী আপনার মনে করিলে শান্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ হয় সত্য, কিন্তু সেইরূপ মনে করাই ভাল। যে অশান্তির তাড়নায় শান্তির সন্ধানে সব ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু বিস্মৃতিও লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে আর অশান্তিকে ভয় কি? অশান্তি ত যাতনারই মত একটা সীমা অতিক্রম করিলে আর আতিশয্যে কাহাকেও পীড়িত করিতে পারে না।

ছয় মাস কাটিয়া গেল। আমার কবিতা আমার খাতার পৃষ্ঠা হইতে ক্রমে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় আত্ম-বিকাশ করিতে লাগিল— প্রথমে যেন সঙ্কুচিতপদে অগ্রসর হইতেছিল, ক্রমে তাহার গতি দ্রুত হইল। নদীর প্রবাহ একবার উপল-বাধা অতিক্রম করিতে পারিলে, যুবতীর প্রেমবিকাশ একবার লজ্জার আবরণ ভেদ করিতে পারিলে, তাহাদের আত্ম-বিকাশে কি আর বিলম্ব ঘটে? এই সময় আমার মনে আর একটা দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিল। আমি উপন্যাস রচনা করিব। প্রণয়োচ্ছ্বাসে যখন হৃদয়ে কবিত্ব ফুটিয়া উঠে, তখন প্রেমের রচনা আপনিই রচিত হয়। কয়টি পরিচ্ছেদ রচনার পর আমার মনে হইল, বিলোলা শ্বশুরালয়ে আসিবার পূর্ব্বেই আমি গ্রন্থ শেষ করিব। স্বামি-গৃহে আসিয়া সে সেই উপহার পাইবে।

বৎসর কাটিয়া গেল। সংসারের কোনও কথায় মা প্রায় কথা কহিতেন না। কিন্তু বিলোলাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ এবার তাঁহাকে কথা বলাইল। পিসীমা তাহাকে আনিবার কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি সে কথা বলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্জিকাকারের নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে বিলোলা পতিগৃহে আসিল। আমি আমার হৃদয়ভরা প্রেম, সদ্যঃ-সমাপ্ত উপন্যাস ও একটি নূতন কবিতা লইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—

১

আয়, প্রিয়তমে, আয়!
সারা জীবনের অতৃপ্ত বাসনা
হৃদয়ে বহিয়া যায়।
ওই বহে যায় দখিণা বাতাস
ফুলবালা ফেলে সুরভির শ্বাস,
নীলিমা শোভায় মগন আকাশ,
অনন্ত উজ্জ্বল কায়।
আয়, প্রিয়তমে আয়।

২

আয়, প্রিয়তমে, আয়।
আকুল নয়ন বিরাম-বিহীন
ওই মুখপানে চায়।
আশা নিরাশায় ব্যাকুল পরাণ,
প্রকৃতি করিছে প্রণয়ের ধ্যান;
দূর নদীকূলে কোকিলের গান
বহিয়া আনিছে বায়।
আয়, প্রিয়তমে, আয়!

৩

আয় প্রিয়তমে, আয় !
কাতর হৃদয়ে ঢাল প্রেমরাশি
যাতনা জুড়ায় যায়।
সারা জীবনের সোণার স্বপন
পূর্ণ হবে তোমার পরশে এখন।
আশার উজল অরুণ-কিরণ
আঁধার হৃদয়ে ভায়।
আয়, প্রিয়তমে, আয়।

৪

আয়, প্রিয়তমে, আয়,
চির জীবনের অতৃপ্ত কামনা
তৃপ্তি-পথপানে ধায়।
শোক-তাপ-ভার ঘুচিবে সকল
শুকাবে নয়নে নয়নের জল
জুড়াবে কাতর হৃদয় বিকল
ওই প্রণয়ের ছায়।
আয়, প্রিয়তমে, আয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার

যেদিন বিলোলা বর্ষান্তে স্বামি-গৃহে আসিল, সে দিনের স্মৃতি আমার হৃদয়ে আজও সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। আমার সুসজ্জিত কক্ষ সে দিন গৃহস্বামিনীর আগমন-প্রতীক্ষায় আরও সুসজ্জিত হইয়াছিল, তাহার কোথাও ধূলিমলিনতা বা বিশৃঙ্খলার শ্রীহীনতা ছিল না। কুসুমে আলোকে সেও আপনার আনন্দ ব্যক্ত করিতেছিল। আর সেই কক্ষ-স্বামীর হৃদয়—সে তাহার অনাবিল প্রেমের পরিপূর্ণ আগ্রহ লইয়া হৃদয়-স্বামিনীর প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়াছিল।

রাত্রিতে আমি একখানা কবিতা-পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছিলাম। পাঠে মন ছিল না; দৃষ্টি পুস্তকের পৃষ্ঠায় ছিল, কিন্তু শ্রবণ দ্বারে শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এত বিলম্ব! শেষে দ্বারদেশে অলঙ্কার-শিঞ্জিত শ্রুত হইল। আমার পুলকান্দোলিত হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইল। ব্রীড়া-কুণ্ঠিত-চরণা অবগুণ্ঠিতা বিলোলাকে লইয়া বড় বৌদিদি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমাকে বলিলেন, "এই লও, ছোট ঠাকুরপো, তোমার ধন তুমি বুঝিয়া লও।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "কেন, রসিদ্ দিতে হইবে নাকি?" উত্তর হইল, "তোমার জিনিষ তুমি লইবে, তাহার আবার রসিদ কেন? বরং তোমার দাদাকে বলিব, তিনি তোমার জন্য বিলোলার কাছ হইতে একখানা রসিদ লইয়া রাখেন। আর ত পাইবার আশা থাকিবে না।" আমি বলিলাম, "কেন,

আমরা কি দাদাদের একেবারেই হারাইয়াছি?” তিনি বলিলেন, “সে তোমাদের বরাত, আর আমাদের হাতযশ। কিন্তু সব কি একই রকম হয়—জানই ত, যত শেষ তত বেশ।”

বিলোলা দাঁড়াইয়া ছিল। বৌদিদি বলিলেন, “এখন কেতাব রাখ, উঠিয়া ঠাকুরাণীটিকে যত্ন করিয়া বসাও।”

তিনি কক্ষত্যাগ করিয়া যাইলেন—যাইবার সময় একটু সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া গেলেন।

আমার কক্ষে আমি আমার বিলোলাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলাম—আমার হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সে আমার—সে আমার—সে আমারই।

তাহার কতকগুলি চূর্ণকুন্তল কিছুতেই কবরীর বন্ধন মানিত না, এবং তাহার আননস্পর্শ-লালসায় তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। আজও তাহারা অবগুণ্ঠনাকর্ষণে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি মুগ্ধনেত্রে কান্তার সেই আকুলীকৃত-কুন্তল অব্জসঙ্কাশ কান্ত মুখ-মণ্ডল পান করিলাম। আমার মনে হইল, সে দিন সে মুখে যে নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলাম, পূর্ব্বে কখনও সে সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাই নাই।

দেখিয়া বোধ হইল, সে কাঁদিয়াছে। স্মৃতি-সুমধুর—চিরপরিচিত—পিতৃগৃহত্যাগকালে সে কাঁদিয়াছে। বিচ্ছেদ দুঃখের। কিন্তু সেই বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কি তাহার হৃদয়ে আশার ও আনন্দের অনুভূতি হয় নাই? আমি যখন বলিলাম, “তুমি কি আমার কাছে আসিতে কাঁদিয়াছ?” তখন তাহার নয়নে অশ্রু ও অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

যেন শরতের প্রকৃতি বর্ষণে ও রবিকরে অভিনব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। আমি সেই সৌন্দর্য্যের অধিকারী তাহার অশ্রুসিক্ত নয়নপল্লবে ও স্মিত-লিপ্ত ওষ্ঠাধরে চুম্বন দান করিলাম। আমাদের ওষ্ঠাধর মিলিত হইলে তাহার ওষ্ঠাধরও চুম্বন-লালসা নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তাহার চলদ্বলয়-নিস্বন্দিত ভুজলতা আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিল; বিকশিত-পঙ্কজ-তুল্য মুখ যেন সন্ধ্যার নলিনীর মত হইয়া উঠিল। সেই লজ্জানত-নেত্র-শোভিত মুখ আমার বক্ষে আপনার লজ্জা লুকাইবার প্রয়াস পাইল। আমার মনে হইল, আমার মত সুখ-সম্ভোগ-সৌভাগ্যলাভ কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?

এই ভাব—এই বিশ্বাস—এই মোহ আমার হৃদয় হইতে শরতের রবিকরের মত দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যায় নাই। আমি দীর্ঘকাল সেই সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ—পক্ষের পর পক্ষ—মাসের পর মাস—আমার হৃদয়ে আমি সেই সুখের গুঞ্জন শুনিয়াছি। আমি সুখী—সে আমার—সে আমার—সে আমারই।

তাহার পর তাহাকে বসাইয়া আমি তাহার হাতে তাহারই উদ্দেশে রচিত কবিতা দিলাম। কবিতা-পাঠকালে তাহার মুখে ও চক্ষুতে যে হর্ষদীপ্তি বিকশিত হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই কি আমার যথেষ্ট পুরস্কার হয় নাই?

কবিতা-পাঠ শেষ করিয়া সে হাসিয়া আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম, "তোমার জন্য আর একটা জিনিষ রাখিয়াছি।"

এইবার সে কথা কহিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

আমি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "এই উপন্যাস।"

পাতা উল্টাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি লিখিয়াছ ?"

"হাঁ।"

"কিন্তু, তুমি ত এ কথা আমাকে বল নাই !"

আমার সাহিত্যসেবার আর কোনও কথাই আমি তাহার কাছে গোপন রাখি নাই। আমি বলিলাম, "তোমাকে উপহার দিব বলিয়া পূর্ব্বে এ কথা তোমাকে জানাই নাই। আজ তোমাকে দিব বলিয়াই তুমি আসিবার পূর্ব্বে পুস্তক শেষ করিয়াছি।"

বিলোলা আমার দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি প্রেমপ্রোজ্জল ও প্রশংসাপূর্ণ। খাতাখানি আমার হাতে দিয়া সে বলিল, "তুমি পড়, আমি শুনি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত বড় বহি শুনিতে তোমার শ্রান্তি হইবে না ?"

বিলোলা বলিল, "না।"

আমি পড়িতে লাগিলাম।

মুখর—অধীর ঘড়ীটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজাইয়া রাত্রি কৌতুক-কম্পিত গতিতে কেমন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। আমি তদ্গতচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম ; আর মধ্যে মধ্যে বিলোলার দিকে চাহিতেছিলাম। সে পুস্তকের নায়িকাচিত্রে যে তাহারই চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা কি সে বুঝিতে পারিয়াছিল ? তখন সে আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া বিরাজিত—আমার চিত্রিত মানসীর

চিত্রের কি অন্য আদর্শ হইতে পারে? আমি তাহারই চিত্র—কল্পনার সমুজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত তাহারই চিত্র—চিত্রিত করিয়াছিলাম—তাহাতেই তখন আমার পরম আনন্দ।

পুস্তক শেষ করিয়া আমি বিলোলার দিকে চাহিলাম।

সে বলিল, "কি সুন্দর!"

সেই সামান্য শিক্ষায় শিক্ষিতা কিশোরীর প্রশংসার মূল্য তখন আমার কাছে শত প্রবীণ সমালোচকের প্রশংসার মূল্যের অপেক্ষা অনেক অধিক! আমরা যে সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা কিশোরীকে হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা করি—সে আমাদের স্বেচ্ছায় ও আদরে প্রতিষ্ঠিতা বলিয়াই তাহার মত আমাদের কাছে অমূল্য—তাহার আদেশ পালন করিয়া আমরা সুখী হই।

তাহার পর আমার দৃষ্টি ঘড়ীর দিকে পড়িল—চারিটা বাজিয়া গিয়াছে! আমি আবার বিলোলার দিকে চাহিলাম—কই তাহার নয়নে ত নিদ্রাবেশ বা আননে শ্রান্তির চিহ্নমাত্র নাই! তাহার বিস্ফারিত নয়নে তেমনই প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টি, তাহার মুখে তেমনই প্রফুল্ল ভাব। আমি বলিলাম, "রাত্রি চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। তোমাকে এতক্ষণ ঘুমাইতে দিই নাই! বড় অন্যায় করিয়াছি।"

বিলোলার ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ ঘুমাইতে বলিলাম বটে, কিন্তু কথায় কথায় আমিই তাহার পক্ষে সুপ্তিলাভ অসম্ভব করিয়া তুলিলাম। আমার সুখের আতিশয্য আমাকে এমনই স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে রজনীর অবশিষ্ট আয়ু ফুরাইয়া গেল, বারান্দায় পিঞ্জরমধ্যে পাখীগুলি ডাকিয়া উঠিল।

বিদায়কালে আমার আলিঙ্গনবদ্ধ তাহার এলায়িত কোমল—তপ্ত দেহলতার স্পর্শে আমার মনে হইল, সে যেন এমনই আদরের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। আমি তাহার নয়নে—অধরে—গণ্ডে—চুম্বনের পর চুম্বন দিলাম।

বিলোলার আগ্রহে আমি উপন্যাসখানি মুদ্রিত করিতে দিলাম। সে পুস্তকে স্থায়িত্বের লক্ষণের একান্ত অভাব ছিল—কেবল ভাবোচ্ছ্বাস। কেবল কবিতায় যে উপন্যাস রচিত হয় না—তাহা আমি পরে বুঝিয়াছি। পাঠক ও সমালোচকদিগের অনাদরে আমার সে শিক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু বিলোলার প্রশংসাহেতু সে শিক্ষায় আমি হতাশার দংশন-যাতনা অনুভব করিতে পারি নাই।

এক চন্দ্র রজনীর অন্ধকার হরে,
শত তারা না ঘুচায় আঁধার অম্বরে।

কিন্তু কেবল ইহাই নহে। সেই প্রশংসা আমাকে আরও একখানি উপন্যাস-রচনায় প্রোৎসাহিত করিল। উপাদানের অভাব—যে ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া প্রথম পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা ব্যয়িত, সুতরাং এবার পুস্তক-রচনা শ্রমসাধ্য হইয়া উঠিল। আর শ্রমসাধ্য রচনায় যাহা হয়, তাহাই হইতে লাগিল। রচনা মনোমত হয় না—চিত্তে কেবল অসন্তোষ সঞ্চিত হয়।

এই সময় একখানা পুস্তক পড়ান শেষ হইলে, মেজদাদা এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরীক্ষার আর ছয় মাস রহিল কি?" বরাবরই মেজদাদার কাছে পড়িতে যাইবার পূর্ব্বে আপনি পড়িবার অংশটি পড়িয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতাম। মেজদাদাই সে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এখন মধ্যে মধ্যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, কি কেবল জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিশীথে সুপ্ত প্রহরী অদূরে শত্রুর বন্দুকের শব্দে সহসা উন্নিদ্র হইয়া যেমন অবহেলিত কর্ত্তব্যপালনে ব্যস্ত হয়, আমিও সেইরূপ হইলাম। অপর্ণার কথাও আমার মনে পড়িয়া গেল। আমার অসাফল্যে আমার নিন্দা হউক আর না হউক, বিলোলার নিন্দা হইবে। আমি সাগ্রহে অধ্যয়নে মন দিলাম।

আমার পুস্তক-প্রকাশে, আমার পুস্তক-রচনায়, পরীক্ষায় আমার সাফল্যে, বিলোলা আনন্দিত হইবে—এই বিশ্বাসও আমাকে দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইল। তাহার জন্য আমি কি না করিতে পারিতাম?

এই সময় আমার কার্য্যবাহুল্যে কি বিলোলা কোনরূপে আপনাকে উপেক্ষিতা মনে করিবার অবকাশ পাইয়াছিল? সত্য বটে, এক একদিন গভীর রাত্রিতে পাঠ করিতে করিতে চাহিয়া দেখিয়াছি, সে তখনও জাগিয়া আছে, আমার পাঠসমাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তাহাকে কোন দিন অসন্তুষ্টা বুঝিতে পারি নাই। যদি কোন দিন তাহার মুখে অভিমানের আভাস দেখিয়াছি, তবে সে আভাস ত আমার অধরস্পর্শেই দূর হইয়াছে। বরং কতদিন আমি পাঠত্যাগ করিয়া আসিলে সে বলিয়াছে, আমার পাঠত্যাগের সময় তখনও হয় নাই।

কিন্তু সে সময় কিশোরী প্রথম প্রণয়াবেগে মনে করে, স্বামী যেমন

তাহার সর্ব্বস্ব, তেমনই সে-ই যখন স্বামীর সর্ব্বস্ব, তখন সে-ই কেন স্বামীর অখণ্ড মনোযোগের অধিকারিণী হইবে না—সে সময় স্বামীর সামান্য অবহেলায় তাহার অভিমান ফুটিয়া উঠে। সে অভিমান সে ব্যক্ত করে না। যে আদর তাহার অবশ্যপ্রাপ্য, সে আদর কি সে যাচিয়া লইবে? সে তাহার সর্ব্বস্ব প্রেম দিয়াছে—সে কি ভিক্ষা করিয়া আদর লইবে? তাই সে সে অভিমান ব্যক্ত করে না। স্বামীর সোহাগে সে অভিমান অচিরে বিলুপ্ত হয়—একটি চুম্বনে নারী-হৃদয়ের কত ব্যথা নিমেষে দূর হইয়া যায়। কিন্তু যদি সেই অভিমান কার্য্যান্তর-রত স্বামীর দৃষ্টি অতিক্রম করে, তবে তাহা বাড়িতেই থাকে; কল্পনার ইন্ধনপুষ্ট বহ্নির মত তাহা হৃদয় দগ্ধ করে, সংসার সুখরসহীন করে; জীবন মরুভূমি করে; প্রেম ভস্মীভূত করিয়াও বুঝি নির্ব্বাণ লাভ করে না। তাই যে অভিমান সোহাগের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে প্রেম সমুজ্জলতর ও সুখ নিবিড়তর করে, সেই অভিমানই উপেক্ষিত হইলে জীবনের অভিসম্পাতে পরিণতি লাভ করে। তাই আমার সন্দেহ হয়, এই সময় —এই প্রথম প্রণয়োচ্ছ্বাসকালে, আমারই ব্যবহারে বিলোলার প্রেমালোকোজ্জ্বল হৃদয়ে অভিমানের মেঘ দেখা দিয়াছিল—আর সেই মেঘ দিনে দিনে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া আপনার শোণিতে যে বজ্র গঠিত করিয়াছিল, তাহাই আমার সকল সুখের আশা নষ্ট করিয়া দিল। দোষ আমার।

আজ জীবনের ভ্রমের আলোচনা করিতে করিতে আক্ষেপ হয়। হায়, সাহিত্য-সাধনা, তুমি যশের মদিরায় মত্ত করিয়া কত লোককে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছ; যে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সে তোমার

দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না ; শেষে তোমার জন্য সে সর্ব্বস্বান্ত হয়। তুমি মানুষকে—বিশেষ অপরিণতবুদ্ধি যুবককে তাহার ক্ষমতার সীমা দেখিতে দাও না—যখন জগৎ তাহার পদতলে—যখন সে নূতন উৎসাহে আশাফুল্ল হৃদয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন তুমি তাহার নিকট তাহার ক্ষমতার সীমা চক্রবালরেখার মত দূর হইতে দূরতর স্থানে লইয়া তাহাকে ভ্রান্ত কর। সে তোমার মোহে মুগ্ধ হইয়া যে যশের সন্ধান করে, তাহা ত পায়ই না ; পরন্তু যে সাংসারিক সুখে সকল মানবের অধিকার, তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়। যাহারা অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেবল তাহারাই তোমাকে পদানত করিয়া সদর্পে যশের মন্দার-মুকুট গ্রহণ করে। আর যাহারা সেরূপ প্রতিভার অধিকারী নহে, তাহারা তোমার জন্য জীবনের সুখ নষ্ট করিয়া, বেদন-বিক্ষত-হৃদয়ে জীবনের ভার বহন করিয়া, শেষে বিস্মৃতির অন্ধ অতলে শান্তি লাভ করে। তাহাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় —মৃত্যু-সুপ্তিতে যখন তাহাদের নয়ন মুদ্রিত হয়, তখনও কেহ তাহাদের জন্য অশ্রুপাত করে না। তুমি যদি আমার তরুণ জীবনের উৎসাহ আকৃষ্ট করিয়া, আমাকে তোমার সেবায় যশ অর্জ্জনের ভ্রান্ত চেষ্টায় চেষ্টিত না করিতে—আর বিলোলার প্রশংসা যদি আমাকে সে কার্য্যে আরও উত্তেজিত না করিত—তবে হয় ত আমার এত দুর্দ্দশা হইত না। তাহা হইলে আমি আপনার কক্ষচ্যুত হইবার অবসর পাইতাম না। তাহা হইলে বিলোলার যে প্রেমলাভ করিয়া আমি এক দিন আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম, সেই প্রেম আমার জীবন সুখময় ও হৃদয় মধুময় করিয়া রাখিত। তুমি আমাকে কোন্ স্থান হইতে কোথায় আনিয়াছ ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভ্রান্তি

পরীক্ষা হইয়া গেল। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি সফল-প্রযত্ন হইলাম। সংবাদ লইয়া সর্ব্বাগ্রে মেজদাদার কাছে উপস্থিত হইলাম। মেজদাদার ঘরের দ্বার ভেজান থাকিত, আমরা কেহ কখনও না ডাকিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতাম না। কাকাবাবুও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন না। সে কক্ষ যেন দেবমন্দির—পুরোহিতের আদেশ ব্যতীত তথায় প্রবেশ করিতে নাই। আমি বাহির হইতে ডাকিলাম, "মেজদাদা!" স্নেহস্নিগ্ধস্বরে উত্তর আসিল, "বিকাশ! আইস।" আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আমার সাফল্যের সংবাদ দিলাম। মেজদাদা তখন বেদান্তের ব্যাখ্যা পাঠ করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কাকাবাবুকে সংবাদ দিয়াছ? ছোট বৌমা জানিতে পারিয়াছেন?" তাহার পর তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "এখন আমাকে আবার একটা কাজ খুঁজিতে হইবে—অবসর অনেক বাড়িল। প্রায় সাত বৎসর তোমার সঙ্গে কত পুস্তক পড়িয়াছি।" তিনি হাসিয়া কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে আমি যেন নিরাশ ব্যথার আভাস পাইলাম। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে প্রাচীর-বিলম্বিত তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর চিত্রের উপর নিবদ্ধ হইল। ছবিখানির নিম্নেই একটি মর্ম্মর ব্রাকেট—মেজদাদা তাহাতে প্রত্যহ কতকগুলি

ফুল সাজাইয়া রাখিতেন। তাঁহার জীবনের শূন্যভাব মনে করিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইল। তাঁহার নয়নে কি আমি অশ্রু লক্ষ্য করিলাম? ভাবিতে ভাবিতে আমি কাকাবাবুর সন্ধানে অগ্রসর হইলাম।

কাকাবাবু বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন—সেই সঙ্গে নাতি-নাতনীরা যাইবে। গাড়ী আনিতে বলিয়া তিনি "মা ষষ্ঠীর" মত ছেলের দলে বেষ্টিত হইয়া বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসিয়া আছেন। দিদির যে ছেলেটির নল-টানাটানির উৎপাতে তাঁহাকে তামাক পর্য্যন্ত ছাড়িতে হইয়াছে, সে তাঁহার এক কাণ ও দাদার একটি মেয়ে তাঁহার আর এক কাণ ধরিবার চেষ্টায় আছে ;—বৌদিদি পশ্চাৎ হইতে মেয়েকে বারণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় চেষ্টিত; কাকীমা হাসিতেছেন। এই সময় আমি ঘরে ঢুকিয়া বলিলাম, "কাকাবাবু, আমাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে।" কাকীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর ভালত? কাকাবাবুর খবর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়। ঘোড়া বাজী জিতিয়া আসিলে অশ্বস্বামী যেমন আনন্দে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া তাহাকে আদর করেন, তিনি উঠিয়া তেমনই করিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া আমাকে আদর করিলেন। কাকীমা বলিলেন, "আমরা ত আগেই বলিয়াছি, বৌমার 'পয়' ভাল। আমাদের বৌদের সকলেই অমনই।" কাকাবাবু বৌদিদিকে বলিলেন, "বৌমা, যাও, ছোট বৌমাকে ডাকিয়া আন।" তিনি যাইয়া দাদার আফিসে টেলিফোনে সংবাদ দিয়া আবার বারান্দায় আসিলেন। এ দিকে বৌদিদি বিলোলাকে হাজির করিলেন। কাকাবাবুর কাছে বধূদিগের ঘোমটা দিবার হুকুম

ছিল না। বিলোলা অনবগুণ্ঠিতা অবস্থায় আসিয়া সম্মুখে আমাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া ঘোমটা টানিল। আমি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে কাকাবাবু আমাকে ধমক দিলেন, "পলাইতেছিস যে?" ততক্ষণে বাড়ীতে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে। পিসীমা ও জ্যেঠাইমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন—মাও আসিলেন। ননন্দাকে দেখিয়া কাকীমা মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন। কাকাবাবু বিলোলাকে বলিলেন, "শুনিয়াছ ত, মা, বিকাশ পাশ হইয়াছে। এখন আমাদের সন্দেশ খাওয়াও। সেবার কেবল অপর্ণাকে খাওয়াইয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছ—এবার খাইবার লোক অনেক।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "ভাল। তুমি না হয় পরে খাওয়াইও। আজ আমি বিকাশকে খাওয়াইব—তোমাকে রাঁধিতে হইবে।" পিসীমা আমাকে বলিলেন, "এবার তুই যেমন পড়িয়াছিস, তেমন আর কখনও পড়িস্ নাই। এবার তোর শরীর যেন আধখানা হইয়া গিয়াছে।" জ্যেঠাইমা বলিলেন, "পড়াও ত ক্রমে শক্ত হয়।"

কাকাবাবুর আর বেড়াইতে যাওয়া হইল না—তিনি জিনিষের ফর্দ্দ করিলেন। সরকার জিনিস আনিতে গেল। এ দিকে গাড়ী আসিলে, সেই গাড়ী অনুকূলকে ও অপর্ণাকে আনিবার জন্য পাঠান হইল। দাদা ও সেজদাদা শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিলেন। সে দিন বাড়ীতে যেন একটা উৎসব চলিল। অপর্ণা আসিলে জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কেমন, আমার বধূর 'পয়' আছে ত?" অপর্ণা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বিলোলাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "পয়স্বিনী মহাশয়া! আপনার ক্ষুরে নমস্কার।" গুরুজন-দিগের সম্মুখে বিলোলা কোনও উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু অপর্ণা

যেরূপে বাহুতে হাত বুলাইতে লাগিল, তাহাতে বুঝিলাম, উত্তরটা বাচিক না হইয়া কায়িক হইয়াছে।

বিলোলার সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন আমি তাহার আগমন প্রতীক্ষাই করিতেছিলাম। বিলোলা কক্ষে প্রবেশ করিতেই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম—সাফল্যোৎফুল্লহৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলাম। সে যে আমার আনন্দে আনন্দিত হইবেই, তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি তাহার মুখে হর্ষদীপ্তি দেখিতে পাইলাম না। আনন্দ-সূচক কোনও কথা আমি তাহার মুখে শুনিতে পাইলাম না।

আমি হতাশ হইলাম ; কিন্তু মনকে বুঝাইতে বিলম্ব হইল না। রাত্রি অধিক হইয়াছে; বিলোলা শ্রান্ত, তাই তাহার এ ভাবান্তর দেখিতে পাইলাম।

আমি উপন্যাসখানির আখ্যানবস্তু অত্যন্ত জটিল করিবার চেষ্টা অসম্ভবের পর অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ করিতেছিলাম—সামঞ্জস্যের ও সরলতার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিলাম। সেই কাজে খানিকটা সময় কাটাইয়া যখন শয়ন করিতে যাইলাম, তখন বিলোলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি ধীরে ধীরে তাহার মুখচুম্বন করিলাম—যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া না যায় ; তাহার পর শয়ন করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বিলোলা চলিয়া গিয়াছে। তাহার ব্যবহারে আমি কিছু বিস্মিত হইলাম—একটু ব্যথিতও হইলাম। কিন্তু তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলাম না—তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

তখন যদি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিতাম ; যদি তাহার অভিমান সন্দেহে

পরিণতিলাভ করিবার পূর্ব্বেই তাহা উন্মূলিত করিয়া দিতাম ; যদি নিষ্ফল সাহিত্য-চর্চ্চায় অপব্যয়িত সময় প্রেমসুখ-সম্ভোগে ব্যয় করিতাম !

প্রতিকূল ঘটনা সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আসিয়া উপস্থিত হয়। কেন আইসে, কোথা হইতে আইসে, তাহার নির্ণয় করা মানবের সাধ্যাতীত। তাই লোক তাহাকে অদৃষ্ট বলে—অদৃষ্টের বাহিরে পথ নাই বলিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করে—চেষ্টা ফলবতী হউক, আর নাই হউক, চেষ্টার ত্রুটী হয় না। তাহার পর বিচার একবার আরব্ধ হইলে মূল বিষয়টা দূরে পড়িয়া থাকে—বিচার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। অদৃষ্ট লইয়াই কত বিচার—কত মত-প্রকাশ—কত তর্ক হইয়া গিয়াছে। মানুষ এক দিকে যেমন যাহা দেখিতে পায় না, তাহাকে অদৃষ্ট বলে, আর এক দিকে তেমনই যাহা দেখে না, তাহাকে দর্শন বলে ! এই দর্শনের চর্চ্চায় কত মানুষ আত্মনিয়োগ করিয়াছে—অবাঙ্মনসগোচরের সন্ধানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে ! কিন্তু কেহ তাঁহার সন্ধান পাইয়াছে কি ?

যে প্রতিকূল ঘটনার কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। এক পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল—আর এক পরীক্ষা সম্মুখে—এক বৎসরও নাই। এতদিন পর্য্যন্ত আইনের পুস্তকের পাতা কাটা হয় নাই—এবার পাতা কাটিলাম। পাতা কাটিতে কাটিতে দেখিলাম, জিনিষটা একেবারেই অপরিচিত। এখন কি হইয়াছে, বলিতে পারি না ; কিন্তু আমাদের সময় জনকতক পাঠনিরত ছাত্র ব্যতীত আর কেহ আইনের কলেজে নিয়মিত পাঠ করিত না। তখন প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থিত হইয়া হাজিরা লিখান বা হাজিরা লিখাইবার সময় উপস্থিত হওয়াই রীতি ছিল।

আমিও সে রীতির ব্যতিক্রম করি নাই। এখন ভয় হইল—এত পুস্তক, সময় এত অল্প, কি হইবে? সাহিত্যের সহিত জিনিষটার সম্পর্কমাত্র নাই। শেষে মেজদাদার কাছে উপস্থিত হইলাম। আমার হাতে আইনের পুস্তক দেখিয়া মেজদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি বিকাশ?" আমি বহিগুলি টেবলের উপর রাখিয়া বলিলাম, "কোন্ বহি প্রথমে পড়াইবেন?" মেজদাদা বলিলেন, "এ যে আইন! আমি ত কখনও আইন পড়ি নাই। আমার অপেক্ষা তুমিই অধিক পড়িয়াছ। আমি ত পড়াইতে পারিব না।" শেষ আশা ছিল, মেজদাদা পড়াইলে নীরসও সরস করিয়া গলাধঃকরণ করাইয়া দিতে পারিবেন। সে আশাও শেষ হইল। এখন উপায়? মেজদাদা বলিলেন, "আপনি পড়িলেই হইবে। আর কাহারও সাহায্য লাগিবে না।" আমি আইনের পুস্তক লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলাম। যে জিনিষ একেবারেই ভাল লাগে না, তাহার অধ্যয়ন যে কত কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। তাহাতে অল্পেই শ্রান্তি বোধ হয়।

তাহার পর, তখন আমার সাহিত্যসেবার নেশা জমিয়াছে। যে নদী ক্রমশঃ বিস্তৃত ও পুষ্ট হইয়া ভূভাগে কল্যাণ বিতরণ করে, তাহার মূল যেমন সুদূর পর্ব্বতের উপর তরুছায়াস্নিগ্ধ উপলমধ্যে লুক্কায়িত থাকে, আমার আলোচনার মৌলিকতার মূল তেমনই মেজদাদার কক্ষ-মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। কেহ তাহার সন্ধান পাইত না।—যশ আমিই পাইতাম। সেই যশের জন্য আমার বিরলপ্রাপ্ত অবসর সাহিত্য-সেবায় ব্যয়িত হইত। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, আমি অসার কাচের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া অমূল্য মণির সন্ধান ত্যাগ করিতেছিলাম।

বালক সমুদ্র-সৈকতে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্রবর্ণ ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া আনন্দিত হয়—মুক্তাগর্ভ শুক্তি সে চিনিতে পারে না। আমারও সেই দশা হইয়াছিল। সে জন্য আমি বিনোলার দোষ দিতে পারি না। এক দিন আমি তাহাকে দোষী মনে করিয়াছিলাম। তাহার পর আপনার মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছি—তখন আমি স্বার্থপর প্রেম লইয়া বিচার করিয়াছিলাম। তাই মন হইতে অভিমান ধৌত করিয়া দোষগুণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি নাই। দোষ আমার। যে প্রেমকেই ঈপ্সিত মনে করিয়া তাহার জন্য আর সব—অর্থ—যশ ত্যাগ করিতে না পারে, সে প্রেমোপভোগ করিবার অধিকারী নহে—প্রেম ধর্ম্মেরই মত, সে অনধিকারীর অধিকৃত হয় না। সংসারে তাহার পক্ষে দুঃখভোগ অনিবার্য্য। আমি সেই জন্য আমার কর্ম্ম-দোষেই দুঃখভোগ করিতেছি, সে জন্য আর কাহাকেও দোষী করিতে পারি না। আমি শান্তিলাভের অধিকারী নহি, সে আশা করিতে পারি না—তবে যদি বিস্মৃতি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট বিবেচনা করিব। কিন্তু বিস্মৃতি—তাহাও কি আমি পাইব না? স্মৃতির দাবদাহে দগ্ধ হৃদয় লইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে অস্থির-ভাবে ছুটিয়া বেড়াইব!

মাসের পর মাস যাইতে লাগিল—পরীক্ষার সময় যতই নিকটে আসিতে লাগিল, আমার ভাবনা ততই বাড়িতে লাগিল। তখনও আমি জীবনে অসাফল্য কি, তাহা জানি নাই—এতদিন মনে অসাফল্যের আশঙ্কাও কখনও উদিত হয় নাই। এবার সে আশঙ্কা দেখা দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বাজী জিতিয়া আসিয়া কি শেষ বাজী হারিব?

ব্যবসার প্রবেশদ্বারেই কি আঘাত পাইব ? এ কথা আমি যতই মনে করিতে লাগিলাম, আমার আশঙ্কা ও চাঞ্চল্য ততই বাড়িতে লাগিল। আমি অধ্যয়নের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে লাগিলাম। এমন কি, কিছু দিনের জন্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানিও আর টেবলের দেরাজ হইতে বাহির হইল না। অবান্তর হইলেও বলিয়া রাখি, সে উপন্যাস প্রকাশিত হয় নাই। পাঠকদিগের সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই। দুই বৎসরের কাজ এক বৎসরেরও অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতে হইলে যে দারুণ শ্রম অনিবার্য্য, আমি সেই শ্রম করিতে লাগিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া কাকাবাবু এক দিন বলিলেন, "বিকাশ, তুই যে দেখিতেছি, পরীক্ষার তাড়ায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলি! যদি ভালরূপ প্রস্তুত না হইতে পারিস, না হয় আগামী বার পরীক্ষা দিবি। শরীর নষ্ট করিস্ না।" আমি কিন্তু মনে করিলাম, অপ্রিয় কর্ত্তব্য যত সত্বর পারা যায়, শেষ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এ দুশ্চিন্তা আর অধিক দিন—আরও এক বৎসর সহ্য করা চলিবে না; আর এ শ্রম—এও কি আর অধিক দিন চলিতে পারে ? আমি স্থির করিলাম, না—এইবারই পরীক্ষা দিয়া শেষ করিব। আমি পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিতে লাগিলাম।

পরীক্ষাও দিয়া আসিলাম।

পরীক্ষা দিয়া ফল কি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই,—সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত না। এবার কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না,—কি জানি কি হয় ? কাজেই পরীক্ষা শেষ হইলেও দুশ্চিন্তা গেল না।

দিদির স্বামী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার কর্ম্মস্থানে দিদি ম্যালেরিয়া বাধাইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর চিকিৎসাতেও শরীর সারে নাই। তখন কথা হইল, কাকাবাবু তাঁহাকে লইয়া পশ্চিমে যাইবেন। দাদার ও সেজ দাদার আফিস। মেজদাদাকে কাকাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে যাইবে?" মেজদাদা বলিলেন, "যদি দরকার হয়, যাইব।" তাঁহার আগ্রহের অভাব বুঝিয়া কাকাবাবু আর সে কথা বলিলেন না—মেজদাদা আপনার ঘরটির মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,—তাঁহার পত্নীর স্মৃতিপূত সেই কক্ষ তাঁহার নিকট দেবমন্দিরের মত প্রিয় ছিল। আমার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল, আমার শরীরে গুরুশ্রমের চিহ্নও বিলুপ্ত হয় নাই। কাকা বাবু আমাকে বলিলেন, "তুই চল।" স্থির হইল, দিদি তাঁহার পুত্র কন্যা ও কাকীমা যাইবেন,—সঙ্গে কাকাবাবু, আমি ও বিলোলা। পিসীমা যাইবার কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু মেজদাদার যাওয়া হইবে না জানিয়া তিনিও আর যাইতে চাহিলেন না। কাকাবাবুও বলিলেন না। তাঁহাকে কে দেখিবে?

যাইবার সব আয়োজন হইয়া যাইলে সংবাদ আসিল, সহসা একটি সুপাত্রের সন্ধান মিলিয়াছে, এবং বিলোলার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই পাত্রে কন্যা-সমর্পণে আর বিলম্ব করা সুবুদ্ধির কার্য্য মনে করিতেছেন না। বিবাহের আর অধিক বিলম্ব নাই। সেই জন্য তিনি বিলোলাকে রাখিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কাকাবাবু সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

বিলোলা পিত্রালয়ে গেল। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে পশ্চিমে যাত্রা

করিলাম। এক মাস পরে আমি শ্যালকের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। পরীক্ষার ফলও বাহির হইল। আমি পরীক্ষা-সমুদ্র পার হইয়া কূলে উপনীত হইতে পারিয়াছি।

কিন্তু ততদিনে আমার ভ্রান্তি-বৃক্ষে ফল ফলিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভ্রান্তির ফল

দুই বৎসর পরে আমি যখন অবসর পাইলাম, তখন বিলোলার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে, সে আমার কাছে তাহার প্রাপ্য পায় নাই। সে উপেক্ষিতা! সে যে আমাকেই গুণে, শিক্ষায়—সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা আমি তাহারই কাছে শুনিয়াছি। কিন্তু যুবতী তাহার প্রণয়কে কেবল ভক্তিতে পর্য্যবসিত করিয়া সুদূর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায় আপনার উদ্দাম আশাকে সংযত ও আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না, তাই বিধবার পক্ষে স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া প্রেমকে ভক্তিতে পরিণত করিবার জন্য কঠোর সংযম-শিক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু বিধবা স্বামীকে নিকটে পায় না,—স্বামী মৃত্যুর অন্তরালে মানুষের সকল প্রবৃত্তির অতীত হইয়া দেবতারূপেই তাহার হৃদয়ে বিরাজিত থাকেন,—মৃত্যু বিধবার আশাকে সংযত ও আকাঙ্ক্ষাকে ইহলোকের উত্তেজনা-মুক্ত করিয়া দেয়। সধবা যুবতী স্বামীকে অন্তরে বাহিরে পাইয়াও যদি মনে করিবার অবসর পায় যে, সে তাহাকে পাইতেছে না,—তবে তাহার বেদনার অন্ত থাকে না; সে যদি মনে করিতে পারে যে, তাহার প্রেমপূর্ণ পানপাত্র পতির অধর-স্পৃষ্ট হইয়াই পরিত্যক্ত হইয়াছে,—আর স্বামীর সাদর ব্যবহারে তাহার

হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটিতেছে না—তবে তাহার মনে অভিমান-কুজ্ঝটিকার উদ্ভব হয়। সে কুজ্ঝটিকা যত গাঢ় হয়, ততই সে প্রকৃতিকে বিকৃত দেখিতে থাকে—ততই সুখের আশা হতাশায় নষ্ট হইতে থাকে। বিলোলার তাহাই হইয়াছিল। সে আমার হৃদয়ের পক্ষে যেরূপ অত্যাবশ্যক হইয়াছিল, আমি তাহাকে বুঝাইতে পারি নাই যে, সে আমার গৃহের পক্ষে ও বাহিরের আমার পক্ষেও তেমনই অত্যাবশ্যক। সে ত্রুটী আমার। তাই বলিয়াছি, আমার ভ্রান্তি-বৃক্ষে ফল ফলিল। তখনও যদি বুঝিতে পারিতাম, তবে বিশেষ চেষ্টায় হয় ত সে বৃক্ষ উৎপাটিত করিতে পারিতাম—হয় ত জীবনে সুখলাভ করিতে পারিতাম। তাহা হয় নাই।

বিলোলা তাহার হতাশার বেদনা বা বিরক্তির যাতনা, যতদিন পারিয়াছিল, আমাকে জানিতে দেয় নাই। সে হৃদয়ে যখন বেদনা যাতনা সহ্য করিয়াছে, তখনও রমণীস্বভাব-সুলভ সহিষ্ণুতায় আমাকে তাহার অস্তিত্ব জানিতে দেয় নাই। ইহা যে কেবল অভিমানেরই ফল, এমন নহে। যে আমাকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহাকে আমার বেদনা জানাইব না,—এই অভিমানে অনেক সময় রমণী ভ্রান্তি-বশে জীবনের সুখ নষ্ট করে,—আপনি আপনার মনে বেদনা রাখিয়া স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি সব হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় সত্য; কিন্তু স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা ব্যতীত রমণীর পক্ষে সে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন সম্ভব হয় না। রমণী তাহার সর্ব্বস্ব সন্তানের শোকে বিদীর্ণ-হৃদয় লইয়াও শ্মশান হইতে প্রত্যাগত স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়, দুঃখের ভার বহিয়াও স্বামীর সংসারের শ্রী অক্ষুণ্ণ রাখে,—উদ্ভ্রান্ত পতিকে শান্ত করিবার চেষ্টায় কত কষ্ট সানন্দে সহ্য করে। রমণীর এই স্বাভাবিক সহিষ্ণুতায় এই দেবত্বের ফলে সংসারে

মানুষ অমৃতের আস্বাদ পাইয়া ধন্য হয়। কিন্তু সময় সময় আবার এই সহিষ্ণুতার প্রলেপহেতু স্বামী স্ত্রীর হৃদয়-ক্ষত দেখিতে না পাইয়া ভ্রান্ত হয়,—সংসার অসুখের আগার হয়।

তখন বিলোলার হৃদয়ে প্রেমের ও বিরক্তির যুগ্ম প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল। প্রেমের প্রবাহ তখনও প্রবল। তাহার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা তখনও আমার হৃদয়তটে প্রতিহত হইয়া সুখের শ্বেতফেন হাস্যে ছড়াইয়া পড়িত—আমি সেই প্রবাহের অস্তিত্বই অনুভব করিতে পারিতাম। দ্বিতীয় প্রবাহ তখনও ক্ষীণ—আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু প্রবল বল সঞ্চিত করিতে পারে নাই; সংযমের কূল লঙ্ঘন করিতে পারে না। বিলোলাও তাহাকে আমার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতেই চেষ্টা করিত। তাই আমি তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না। তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহই হয় নাই, তাই আমি তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টাও করি নাই। যদি করিতাম!—

আমি জীবনে আমার হতাশার বেদনাই বড় বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু তখন যদি বিলোলার যাতনার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিতাম, তবে আমার সেই স্বার্থসঞ্জাত ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইত। আমার সাফল্যের গৌরব ছিল, যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল, ব্যবসার উত্তেজনা ছিল, বিলোলা ছিল—তথাপি আমি তুচ্ছ অভিমানে তাহার নিকট যতখানি আশা করিয়াছিলাম, ঠিক ততখানি পাই নাই মনে করিয়া, হতাশার বেদনায় জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম—যে সংসারে আমি অবারিত সুখ পাইয়াছিলাম, সেই সংসারের প্রতি, আমার প্রতি, বিলোলার প্রতি কর্তব্য অতলতলে ডুবাইয়া সাজান বাগান শ্মশান করিয়াছি। কিন্তু বিলোলার ত আমি ছাড়া আর

কিছুই ছিল না।—আমার প্রেমলাভ করিয়া আমার জীবনসর্ব্বস্ব ও হৃদয়-সর্ব্বস্ব হইবার আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কোনও আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। এ অবস্থায় সে যদি ভুল বুঝিয়া মনে করিয়া থাকে, সে উপেক্ষিতা, তবে তাহার হতাশার বেদনার পরিমাণ করা কি সম্ভব? সে মনে করিয়াছিল, সংসারে তাহার সুখ নাই, জীবনে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, জগতে তাহার স্থান নাই!

বধূ যখন স্বামীর ঘরে আইসে, তখন সে অভ্যস্ত অবস্থা হইতে অনভ্যস্ত অবস্থায় আসিয়া অনেক অসুবিধা অনুভব করে। তাহাকে অভ্যাসবশে সে সব অসুবিধা সুবিধা মনে করিয়া নূতন অবস্থার মত করিয়া আপনাকে গঠিত করিতে হয়। স্বামীর প্রেম তাহাকে সে কার্য্যে সাহায্য করে—স্বামীকে সুখী করিবার বাসনার উত্তেজনা তাহাকে সকল বাধা অতিক্রম করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। যে স্থানে সে উত্তেজনা হতাশার বেদনায় বিলীন হইয়া যায়, সে স্থানে বাধা অতিক্রান্ত হয় না—অসুবিধা অসুবিধাই থাকিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে বেদনা উৎপন্ন করে—চরণতলবিদ্ধ কণ্টক যেমন চলিতে ফিরিতে কেবলই খচ্ করিয়া উঠে, তেমনই সর্ব্বদা খচ্ করিয়া উঠে।

বিলোলার তাহাই হইয়াছিল। মা'র মৌনস্নেহ, পিসীমা'র মুখর যত্ন, জ্যেঠাইমা'র আবেগোচ্ছ্বাসহীন কিন্তু গভীর ভালবাসা, কাকীমা'র ও কাকাবাবুর সর্ব্বদা সপ্রকাশ আদর—এ সব যে তাহার হৃদয় স্পর্শ করিত না, এমন পাষাণী সে নহে; বরং আমি তাহার কোমলতার পরিচয়ই পদে পদে পাইয়াছি। বরং আমি দেখিয়াছি, সে তাহার কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধির বাঁধ দিয়া তাহার কোমলতার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করিত।

সংসারের কাহারও প্রতি তাহার কর্ত্তব্যে কোনও ত্রুটী কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। পিসীমা বলিতেন, "ছোট বৌমা'কে কোন কাজ দুইবার দেখাইয়া দিতে হয় না।" সে যন্ত্রবৎ সব কাজ করিয়া যাইত। কিন্তু তাহার হৃদয়ে কোমলতার, স্নিগ্ধতার, সরসতার অভাব ছিল—এমন নহে। পদ্মের হৃদয় যেমন সৌরভপূর্ণ থাকে, তাহার হৃদয় তেমনই সকল সরসতার সার প্রেমে পূর্ণ ছিল। তাহার পরিচয় আমি পাইয়াছি। সে সৌরভ শারদপবনবাহিত কমলকাননোত্থিত সৌরভেরই মত আমার হৃদয় সুরভিত করিয়াছিল। আমি ভ্রান্তির অনল জ্বালিয়া অভিমানের ধূমে হৃদয় পূর্ণ করিয়া সে সৌরভ দূর করিয়াছি। কিন্তু আজও যেন সময় সময় মনে হয়, হৃদয়ের প্রান্তে প্রান্তে তাহার অবশেষ লাগিয়া আছে। সেও কি ভ্রান্তি? কতবার ভাবিয়া দেখিয়াছি, ঠিক বুঝিতে পারি নাই। হউক ভ্রান্তি। যে জীবনে ভ্রান্তিতে কেবল যাতনাই পাইয়াছে, সে ইচ্ছা করিয়া যে ভ্রান্তিতে সুখ, সে ভ্রান্তি দূর করিবে কেন? সে প্রেম যদি পুষ্পিত হইতে না পারিয়া থাকে, তবে সে জন্য দায়ী তাহার ভ্রান্ত বিশ্বাস। আর সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য দায়ী আমি। কারণ, আমার প্রেমের অভিব্যক্তিতে কোনও ত্রুটী ছিল—নহিলে, তাহার হৃদয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস স্থান পাইবে কেন? আর আমিও ত অভিমানকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম। অভিমানকে হৃদয়ে স্থান দিলে প্রেমের প্রবাহ প্রতিহত হয়। সে প্রতিহত হইলে জীবনে আর কি সুখের আশা থাকে?

চিরসুন্দর প্রেমকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে একাগ্র সাধনার প্রয়োজন, সে কি কেবল কবিতার কথা? কবিতা যে সত্য প্রচার করে

তাহাকে জীবনে প্রযুক্ত করিবার আদর্শও ত আমি দেখিয়াছি। কাব্য-সাহিত্যে এই সব কথা আমাকে বুঝাইবার সময় মেজদাদা তন্ময় হইয়া যাইতেন—তিনি, আমি, কাব্য সব ভুলিয়া যেন ভাবলোকে বিচরণ করিতেন, তাঁহার আননে অপূর্ব্ব ভাব ও নয়নে অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিত। দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। চিরসুন্দর প্রেমকে সাধনার দ্বারা চিরস্থায়ী করিয়া জীবন কেমন করিয়া চিরসুন্দর করিতে হয়—লোকাতীত প্রেমকেও কেমন করিয়া স্মৃতির বন্ধনে বদ্ধ করিয়া হৃদয়ে রাখিতে হয়, তাহা ত আমি আমার ঘরেই দেখিয়াছি। তবুও কেন আমি ভুল করিলাম? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে!

বিলোলা আমাদের সংসারের নূতন ব্যবস্থাগুলার অসুবিধা সুবিধা মনে করিয়া লইতে পারে নাই—কেন না, সে মনে করিয়াছিল, সে উপেক্ষিতা; সে কাজে তাহার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সে, সে ভাব ব্যক্ত করে নাই। সে মনে করিয়াছিল, সে যখন স্বামীর উপেক্ষিতা, তখন এ সংসারে তাহার আর কোনও জোর নাই—সে কেন এ সংসারকে আপনার করিয়া লইবে, আর কেনই বা তাহার অনুভূত অসুবিধার কথা প্রকাশ করিবে? তাই দারুণ অভিমানে সে ভাব সে ব্যক্ত করে নাই। তাহার প্রথম সন্তান পুত্রের জন্মের পর যখন সে মনে করিল, সংসারে তাহার অধিকার জন্মিয়াছে তখন সে আর অসুবিধাকে সুবিধা মনে করিবার চেষ্টা করিল না; কিন্তু সে যে অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহা আর অব্যক্ত রাখিল না।

কিন্তু যেরূপে তাহার বিরক্তি আমার কাছে প্রথম ব্যক্ত হইল, তাহাতে বড় অনর্থ ঘটিল। বিলোলা যদি সে কথা আমাকে বলিত,

তবে তাহাতে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার কোনও সম্ভাবনাই থাকিত না। বরং সে যে এই সব অসুবিধায় কষ্ট পাইয়াছে, তাহাতে আমার হৃদয়ও তাহার সহিত সমবেদনায় ব্যথিত হইত—প্রেমাস্পদের হৃদয়ে কোন ব্যথা বাজিলে সে বেদনা প্রেমিকের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হইয়া বাজে। ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। আমি তাহাকে তাহার অসুবিধাগুলির স্বরূপ বুঝাইয়া দিতাম, এবং আমার বিশ্বাস, আমি বুঝাইলে সে তাহার ভ্রম বুঝিত। কারণ, তখনও তাহার হৃদয়ে আমার জন্য সঞ্চিত প্রেমামৃত বিকৃত হইয়া ঘৃণায় পরিণত হয় নাই। তখনও আমিই তাহার সর্ব্বস্ব।

সে দিন আমি শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। পিসীমা পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া "দিন" দেখাইয়া বিলোলাকে আনিবার কথা বলিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন। বিলোলার জ্যেষ্ঠাগ্রজা তখন পিত্রালয়ে। তাঁহার স্বামী পশ্চিমে ব্যবহারাজীবের কাজ করিতেন; সংসারে আর কেহ ছিল না—এই জন্য তাঁহার পক্ষে পিত্রালয়ে আগমনের সুযোগ বড় হইত না। বিশেষ, আদালত বন্ধ হইলেই তাঁহার স্বামী পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতেন—সস্ত্রীক যাইতেন। এবার তিনি পত্নীর অনুরোধে দার্জ্জিলিং যাইবেন বলিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। বিলোলা তাহার দিদির কাছে তাহার অসুবিধা ব্যক্ত করিয়াছিল। বলিয়াছি, তাঁহার সংসারে অন্য লোকের অভাব; সুতরাং একটা বড় সংসারের যে সব অনিবার্য্য ব্যবস্থায় বিলোলা অসুবিধা বোধ করিয়াছি, সে সব তাঁহার কাছে অত্যধিক অসুবিধা বলিয়াই মনে হইয়া থাকিবে, এবং তিনিই স্বতঃ-প্রবৃত্তা হইয়া আমাকে সে

সব অসুবিধার কথা বলিয়া প্রতীকারে চেষ্টিত করিবার ভার লইয়া থাকিবেন। তিনি যেরূপ অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতায় স্বামি-সোহাগ-সুখে জীবন কাটাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে বড় সংসারের ব্যবস্থা ভগিনীর পক্ষে দুঃসহ মনে করিয়া, সরল ভাবে আমাকে তাহা জানাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তাহাতে যে কোনও দোষ হইতে পারে, সে কথা বোধ হয়, তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি অতিক্রান্ত-যৌবনা হইলেও, মীনাকরা জিনিষ যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, তাঁহার দেহ ও মন উভয়েই তেমনই যৌবন অক্ষুণ্ণ ছিল।

আমি কিন্তু তাঁহার কথা সে ভাবে লইতে পারিলাম না,—তাঁহার কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, আমি এ কথার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যে সংসারে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং পালিত হইয়াছি, যে সংসার আমাকে সর্ব্বাঙ্গ সুখে সুখী করিয়াছে, সে সংসারে যে কাহারও কোনও অসুবিধা হইতে পারে, তাহা স্থিরভাবে বিচার ব্যতীত আমি মনে করিতে পারি নাই। তাই এই অতর্কিত বিরক্তি-ব্যক্তির জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দ্বিতীয়তঃ, যদি সে সংসারে বিলোলার কোনও অসুবিধা হইয়া থাকে, তবে তাহা কখনই এত অধিক নহে যে, তাহা পরের কাছে ঘোষণা করা তাহার পক্ষে সঙ্গত। আমি বিবেচনার সময় পাই নাই,—পাইলে হয় ত বুঝিতে পারিতাম, বিলোলার সহোদরা আমার পর হইলেও তাহার একান্তই আপনার,—আমার কাছে আমার দাদা, মেজদাদা, সেজদাদা যাহা, তাহার কাছে তাহার দিদি তাহাই। আর সে হয় ত সরলভাবেই আপনার অসুবিধা

ব্যক্ত করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, এই কথায় আমার মনে অভিমান প্রবল হইয়া উঠিল। আমার পত্নী আমার গৃহে তাহার অসুবিধার কথা আমাকে না বলিয়া অপরকে বলিল! আমি কি তাহার এমনই পর? তিনি যেমন হাসিতে হাসিতে কথাটা বলিয়াছিলেন, ধৈর্য্যচ্যুতিহেতু আমার উত্তর তেমন হাসিতে হাসিতে বলা হইল না,—অশিষ্ট না হউক, অশান্তির পরিচায়ক হইল। বিলোলার জ্যেষ্ঠা তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তিনি বিদ্রূপই করিলেন,—আমার "পল্লীবাস কলঙ্কের" একটু উল্লেখ করিলেন। তাহাও হাসিতে হাসিতে। কিন্তু তিনি জানিতেন না, এই "কলঙ্ক" আমি গৌরব মনে করিতাম,—সে গৌরবে আঘাত আমার সহিত না।

কিন্তু আমার কথার ভাবে আমার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কন্যার কথার পরিণাম ভাবিয়া শঙ্কিতা হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, কন্যা বিদ্রূপ করিয়া কোনও কথা বলিয়া থাকিলে, আমি যেন তাহাতে মনে কিছু না করি; দুহিতা বহুদিন বাঙ্গালা ছাড়া, সামাজিক ব্যবহার জানেন না, ইত্যাদি।

বিলোলার সহিত আমার যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন দেখিলাম, সে অতিরিক্ত গম্ভীর! সে তাহার ভগিনীর কথার উত্তরে রাগ করিয়াছে। আমি ভাবিলাম, দোষ আমার, না তাহার? আমি তোমার পর, আর তোমার ভগিনীই তোমার আপনার?

বিনা বাক্যব্যয়ে বেদনাপূর্ণ দীর্ঘরাত্রি অতিবাহিত হইল। আঘাত পাইলে গোখুরা সাপ যেমন গজরাইতে থাকে, আমার মনের মধ্যে

অভিমান তেমনই গজরাইতে লাগিল। তাহার পর সে তাহার সঞ্চিত বিষ আমারই হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়াছিল।

দশ মাস পিতৃগৃহে বাসের পর ছয় মাসের পুত্র লইয়া বিলোলা যখন পতিগৃহে আসিল,—তখন তাহার মুখ অন্ধকার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুঃখারম্ভ

অন্ধকার মুখ লইয়া বিলোলা পতিগৃহে আসিল। আমার হৃদয়েও অভিমানের কুজ্ঝটিকান্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। যে অভিমান শারদ প্রভাতের লঘু কুজ্ঝটিকার মত প্রকৃতির মুখ ক্ষণতরে আবৃত করিয়া অরুণবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া যায়, এ সে কুজ্ঝটিকা নহে। ইহা বদ্ধ-জলার অস্বাস্থ্যকরবাষ্পপুষ্ট ঘন কুহেলিকা—রবিকর তাহা ভেদ করিতে পারে না—তাহা মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর—শ্মশানের সহচর। তাহা কেবলই ঘন হইতে লাগিল।

কি দুঃখেই আমার দিন কাটিতে লাগিল! যদি একবার সে দুঃখ ব্যক্ত করিতে পারিতাম? কিন্তু ব্যক্ত করিব কোথায়? বিলোলার কাছে! তখন আমার যৌবনাবেগোচ্ছ্বসিত প্রেম আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছে। বিলোলাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বক্ষে ধরিবার জন্য যে ব্যাকুলতা—তাহার ওষ্ঠাধরে আবেগতপ্ত চুম্বন দান করিবার জন্য যে আকুল আকাঙ্ক্ষা—তাহা সংযত করিবার জন্যই আমার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি যেন প্রযুক্ত করিতে হইত। কেবলই যাতনা পাইতাম। আমার বসিবার ঘরেই আমার শয়নের ব্যবস্থা ছিল। পার্শ্বের ঘরটি বিলোলার—তাহার দ্রব্যাদিতে সজ্জিত ছিল। এবার পুত্র লইয়া আসিয়া সে পূর্ব্বে অনধিকৃত সেই ঘরটিই অধিকৃত করিয়াছিল। আমি তাহার আগমন-

প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া প্রভাতে ঘুমাইয়া পড়িতাম, কিন্তু ভ্রান্ত মানের জন্য তাহার কক্ষে পদার্পণ করিতে পারিতাম না ; করিলে ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিতাম, তাহাকে ডাকিতে পারিতাম না ! কিসে এ ভ্রান্তির উদ্ভব ?

আমি রাত্রি জাগিয়া কবিতায় আমার মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করিতাম—

প্রার্থনা আজি, ক্ষমা কর যত
জীবনের অপরাধ।
তোমার প্রণয় দিয়াছে আমারে
মরতে অমৃত-স্বাদ ;
অন্ধ নয়নে ফুটেছে আলোক,
ধন্য হয়েছি জানি'—
ধরায় অমরা প্রেমে আসে নামি'
প্রেম দেয় কতখানি ;
স্বার্থ-গন্ধ- বিহীন প্রণয়
চাহে না আপন পানে,—
আপনা বিলায়ে ভিখারী সাজিয়া
গৌরব গণে দানে।
তোমার প্রণয়ে চিনেছি, দেবতা
বিরাজে মানব-মাঝে,
চিনিলে তাহারে এই জীবনের
দুখমাঝে সুখ রাজে।

তুমি বুঝায়েছ, যে লভে প্রণয়,
জয়ী সে জীবন-রণে ;
বিঘ্ন-বহুল সংসারে শত
বিপদ কভু না গণে।
তুমি দেখায়েছ, লভিলে প্রণয়,
অভাব থাকে না আর—
কিসের দৈন্য সুখ-হিল্লোলে
পূর্ণ হৃদয় যা'র ?
বুঝেছি প্রণয় শক্তি—শান্তি ;
বুঝেছি, প্রণয় সুখ ;
বুঝেছি, ধরায় চির-মধুময়
প্রণয়-পূর্ণ বুক।

কিন্তু ভ্রান্তিবশে মিথ্যা মান ত্যাগ করিতে পারি নাই। এক এক-দিন রাত্রিতে উন্নিদ্র পুত্রের ক্রন্দন শুনিয়া তাহার সুপ্তিমগ্না মাতাকে জাগাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি ; যদি সে মনে করে, পুত্রের জন্য তাহাকে জাগাইবার ছলে আমি পরাজয় স্বীকার করিয়াছি, তবে তাহার অধরে অবিশ্বাসের যে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিয়া—বিদ্যালয়ের প্রহৃত বালক গৃহে অভিভাবক সে কথা জানিতে পারিবেন ভাবিয়া যেমন ভীত হয়, তেমনই ভীত হইয়াছি। কাঁদিতে পারি নাই—কেবল মনে হইয়াছে, কোনও তীব্র-দংশন কীট যেন আমার বক্ষে দংশন করিতেছে। কিন্তু তাহার অন্ধকার মুখে প্রফুল্লতার বিকাশ দেখিলে—তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা দেখিলে আমি কত সুখী

হইতাম! সেই প্রফুল্লতার—সেই হাসির কিরণে বুঝি আমার হৃদয়ের অন্ধকারও দূর হইত!

জয়! জগতে জয় কি সর্ব্বত্রই সুখের? যে জেতা গৃহ গ্রাম অগ্নি-দাহে শ্মশান করিয়া রক্তসিক্ত ভূমিতে আপনার বিজয়বৈজয়ন্তী-দণ্ড প্রোথিত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের নির্ঘোষে আপনার জয় ঘোষণা করে—পীড়িত পরাজিতের প্রীতির পরিবর্ত্তে ঘৃণামাত্র লাভ করিয়া সে জয়ী কি তাহার জয়ে সুখলাভ করে? যে পিতা স্নেহের পরিবর্ত্তে কঠোর ভীতির দ্বারা পুত্রকে পরাজিত করেন, সে জয়ী পিতা কি তাঁহার জয়ে সুখ লাভ করেন? যে পতি সুখ—শান্তি—সব হারাইয়া কেবল কঠোর দাম্ভিক মানে পতিগত-প্রাণা পত্নীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ ও জীবন দুঃখময় করিয়া জয় লাভ করে, সেই জয়ী পতি কি তাহার জয়ে সুখ লাভ করে? দম্ভ সুখের হইতে পারে না—বিষবৃক্ষে কি কখনও অমৃত-ফল ফলিতে পারে?

আর পরাজয়! মানুষ কি স্থানে স্থানে সাধিয়া পরাজয় লয় না—পরাজয়েই সুখ পায় না? স্নেহের নিকট—ভালবাসার নিকট—প্রেমের নিকট পরাজয় কত সুখের! সেজদাদা আফিসের কাজ শিখিলে বাবা প্রায়ই বলিতেন, "বিভাষ, আমার অপেক্ষা ভাল কাজ করে!" আফিসের অধিকারী এক দিন হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কেন—ইহাতে কি তোমার আনন্দ হয়?" বাবা উত্তর দিয়াছিলেন, "আমাদের একটা কথা আছে, মানুষ সর্ব্বত্র জয় ইচ্ছা করে—পুত্রের নিকট পরাজয়ই তাহার প্রার্থ-নীয়—তাহাতেই তাহার সুখ।" বাবার মৃত্যুর পর এই কথা বলিতে বলিতে সেজদাদা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাঁহাদের প্রেম-প্রবাহে

কোনও দিন কোনও বাধা লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সেই কাকাবাবু কাকীমাতে তর্ক হইলেই কাকাবাবু বাজী রাখিতেন। আমরা কাকীমা'রই জয় কামনা করিতাম ; কারণ, কাকাবাবু হারিলে আমাদের আহারের আয়োজন আড়ম্বরপূর্ণ হইত। কাকাবাবু আপনিও যে পরাজয় কামনা করিতেন, তাহা তাঁহার পরাজয়ের আনন্দেই বুঝিতে পারিতাম। অনেক সময় বুঝিতে পারিতাম, কাকীমাকে জয়ের আনন্দ দিবার জন্য কাকাবাবু ইচ্ছা করিয়াই হারের দিক লইতেন। যে এরূপ স্থলে জয় কামনাই করে—পরাজয়ে অপমান মনে করে—তাহার দারুণ দম্ভই তাহাকে মোহাবিষ্ট করিয়া তাহার স্নেহ—ভালবাসা—প্রেম ক্ষুণ্ণ করে। নহিলে তাহার এমন ভাব হইতে পারে না। আমিও ভ্রান্তিবশে দারুণ দম্ভেই জয়পরাজয়সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলাম। দম্ভ পাষাণ-প্রাচীরের মত আমার দৃষ্টিপথ হইতে বাস্তবের মূর্ত্তি অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিল। সুখের দিনে যাঁহার সত্তা অনুভব করিতে পারি নাই, তিনি দুঃখের দিনে ঘটনার বজ্রাঘাতে সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন—আমার দম্ভ ভূমিতে লুটাইয়াছে, তাই আমি আজ বাস্তবের স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছি।

বিলোলা আমার স্ত্রী—বয়সে শিক্ষায় আমার ছোট—আমার শিষ্যা, সঙ্গিনী—সকল বিষয়ে সে আমারই উপর নির্ভর করে—তাহার সুখাসুখের জন্য শুভাশুভের জন্য আমিই দায়ী—সে আমার জীবনের সুখ—সংসারের কেন্দ্র—সন্তানের জননী—তাহার কাছে আমার পরাজয় কি ? সে যদি ভুল বুঝিয়া থাকে, তবে সে ভ্রান্তির অপনোদন করাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি তাহা বুঝিলাম না ; যাহার সুখের জন্য আমি

সর্ব্বস্ব দিতে পারিতাম, তাহাকে একবার স্নেহস্নিগ্ধ আহ্বান দিতে পারিলাম না।

যত দিন যাইতে লাগিল, তত দম্ভের সঙ্গে সঙ্কোচ দেখা দিতে লাগিল। এতদিন এই কঠোর ব্যবহারের পর কেমন করিয়া আপনার ভ্রম স্বীকার করিব? বিলোলা কি মনে করিবে? সে আমার দৌর্ব্বল্যে মনে মনে কত হাসিবে—হয় ত জয়োল্লাসে পিতৃগৃহে সে কথা বলিবে—আর কাহাকেও না বলিলে তাহার দিদির আহত অভিমানে ভেষজ-প্রয়োগের জন্য তাঁহাকে যে বলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন তাহার সেই অনির্ব্বাপিত-যৌবন-বহ্নি নয়নে কি কৌতুক-দীপ্তিই ফুটিয়া উঠিবে! আমি যে অভিমানের জন্যই তাঁহার বিদ্রূপকে বিদ্রূপ বলিয়া মনে করি নাই—করিলে আমার এ যন্ত্রণা হইত না, তাহা আমি তখনও বুঝি নাই—তাহার পরেও অনেক দিন বুঝি নাই। এমন সামান্য ভুলেও লোকের সর্ব্বনাশ হয়! আর মনে হইত, বিলোলা যদি আমাকে দুর্ব্বলচিত্ত মনে করে; মনে করে, আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নাই—মতের স্থিরতা নাই। তবে? তবে সে কি আর আমাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে? এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমি কৃত্রিম কঠোরতায় চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিলাম—একটা ইংরাজী কবিতার কয় ছত্র কেবলই মনে করিতে লাগিলাম—

কোমল বিছুটী লতা পরশ কোমল করে,
সাদর সোহাগ লভি নিঠুর দংশন করে;
সবলে কঠোর করে ধর চাপি' লতিকায়,
কোমল কৌষেয় সম অনুভূত হবে তা'য়!

বালক যেমন যোদ্ধা সাজিবার জন্য খরধার তরবারি লইয়া খেলা করিতে যাইয়া তাহার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়, আমিও তেমনই কঠোর সাজিবার জন্য এই দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া তাহার আঘাতে ব্যথিত হইতে লাগিলাম। আমার হৃদয়ের শান্তি ও জীবনের সুখ অন্তর্হিত হইল।

যদি হৃদয় হইতে প্রেম দূর করিতে পারিতাম,—তবে বোধ হয় যাতনা ভোগ করিতে হইত না। যে উৎস হইতে অনাবিল সুখই অবিরত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আমি সেই উৎসের মূলে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। বিষ-বারি উৎসারিত হইয়া জীবনে কেবল জ্বালার সঞ্চার করিতেছিল; কিন্তু আমি সে উৎস শুষ্ক করিতে পারি নাই। প্রেম কি কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে? তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে, কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে,—কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—আমি পরিপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তি না পাই,—বিস্মৃতি লাভ করিতে পারিব, এবং বিস্মৃত হইব, এই আশায়—এই দুরাশায় গৃহ ছাড়িয়া গৃহ-হীন হইয়া, গৃহীর হৃদয় ও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ লইয়া দেশে দেশে ফিরিয়াছি, কিন্তু প্রেম মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছি কি? মায়াবাদের আলোচনা করিয়া সংসার ঐন্দ্রজালিকের মায়া-সৃষ্টি মনে করিবার চেষ্টা করিয়াছি—চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতের কত তীর্থে ঘুরিয়া অনাহারে অনিদ্রায় দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, হে দেবতা, আমি শান্তির আশা করিতে পারি না,—কিন্তু বিস্মৃতি, তাও কি পাইব না? তুমি আমার দারুণ দাবদাহ করুণা-বারি দিয়া নির্ব্বাপিত করিয়া দাও,—আমাকে চরণে স্থান দাও। দেবতা আমার করুণ আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করেন নাই। আমি কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। বিনিদ্র হইয়া দেবতার ধ্যান করিবার

সময় মানস-পটে আমার সেই সকল সুখের ও দারুণ দুঃখের স্মৃতি-মন্দির গৃহের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে,—আর ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে আমার সকল সুখ ও সকল দুঃখ সেই বিলোলার চিত্র। যাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি,—তাহার এত চিত্র যে আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। যে দিন অনুকূলের গৃহে তাহাকে প্রথম সৌন্দর্য্যের স্বপ্নের মত একবার দেখিয়া লজ্জায় চক্ষু নত করিয়াছিলাম—যে দিন আমার গৃহে সে "ঘর করিতে" আসিলে তাহাকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, আমার মানসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত,—যে দিন তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া মনে করিয়াছিলাম, সংসারে আমার অপেক্ষা সুখী আর কেহ নাই,—যে দিন পুত্র-ক্রোড়ে তাহাকে দেখিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারি নাই,—দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি হয় নাই,—সেই সব দিন তাহাকে যে যে রূপে দেখিয়াছিলাম, তাহার সেই সেই রূপ যে আমার হৃদয়-পটে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তাহা ত পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আরও বিস্ময়ের বিষয়, তাহার আঁধার মুখের কথা কই মনে আসিত না,—চেষ্টা করিয়াও তাহার বিরক্তি-ব্যঞ্জক মুখের চিত্র মনে করিতে পারিতাম না। প্রেম ভ্রান্তি-মুক্ত হইয়া স্মৃতির কাঁটাটুকু ফেলিয়া দিয়াছে,—তাহার সৌরভেই আমার হৃদয় সুরভিত—আমার সাধ্য নাই, সে সৌরভ মুছিয়া ফেলি।

ধর্ম্ম অগ্নির মত সর্ব্বগ্রাসী,—সর্ব্বশুচি। ধর্ম্ম যাহার হৃদয় স্পর্শ করে, তাহার সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট করে,—অন্য কোনও বিষয়ে তাহার আসক্তি থাকে না, আর সে পবিত্র হয়। আমি সর্ব্বশুচিরূপে ধর্ম্মের

সাধনা করি নাই,—সর্ব্বগ্রাসিরূপে বিস্মৃতির জন্য তাহার সাধনা করিয়াছি; ফল ফলে নাই। চুম্বক লৌহকেই আকৃষ্ট করে,—আমার হৃদয়ে সে আকৃষ্ট করিবার কিছুই পায় নাই বলিয়াই বুঝি ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমার মনে আছে, একদিন ধর্ম্মের নিকট আত্মবলি দিয়া বিস্মৃতি-লাভের চেষ্টায় আমি সমস্ত রাত্রি বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করিয়া যখন ঈপ্সিত বিস্মৃতি লাভ করিতে পারি নাই,—তখন প্রত্যূষে নিষ্ফল চেষ্টায় উন্মত্তের মত অতীত জীবনের শেষ স্মৃতি-চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার ব্যর্থবাসনার উত্তেজনায় জাহ্নবীকূলে গিয়াছি,—আমার বক্ষের তাপে বিবর্ণ, কত যত্নে রক্ষিত,—কত অশ্রুসিক্ত, আমার পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মানা বিলোলার প্রতিকৃতি বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া জাহ্নবীজীবনে ফেলিয়া দিয়াছি; তাহার পর যেন আমি আপনি আপনার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছি,—যেন আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে—এমনই বেদনায় সেই সিক্ত সৈকতে বসিয়া অবিরল অশ্রু-বর্ষণ করিয়াছি। যখন বাহ্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তখন সূর্য্য মধ্যগগনে উপনীত হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুঃখ

কুড়ি হইতে ত্রিশ,—এই বয়সই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় সময়। এই সময় মানুষ জীবনের সকল সুখের আস্বাদ পায়,—সোৎসাহে সাফল্য-লাভের জন্য সচেষ্ট হয়—জীবনের অবলম্বন ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই সময় আমার পক্ষে অনন্ত দুঃখের আকর হইয়া উঠিল। আমার জীবন তিক্ত ও হৃদয় উৎসাহহীন হইয়া গেল।

আমি ব্যবসায় বাছিয়া লইয়াছিলাম। এখন তাহাতে সাফল্য-লাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলাম। কিন্তু সাফল্যলাভ ঘটিল না; কারণ, আমার সে চেষ্টা সাফল্য-লাভের জন্য নহে, সে চেষ্টা মনকে ভুলাইবার জন্য; সে চেষ্টা হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য। যে অবস্থায় হৃদয়ে কোনও কাজেই উৎসাহ থাকে না,—হতাশার অবসাদে হৃদয় বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হয়, সে অবস্থায় ব্যবসায়ে সাফল্যের চেষ্টা আন্তরিকতাহীন বলিয়া জীবনী-শক্তি-হীন রোগীর দেহে তেজস্কর ঔষধের মত ব্যর্থ হয়। আমারও তাহাই হইল। আমি যথাকালে আদালতে যাইতাম,—উকীলদিগের কামরায় বসিয়া সোৎসাহে রাজনীতির চর্চ্চা করিতাম,—কখনও কখনও এজলাসে বসিয়া মামলা শুনিতাম,—তাহার পর সভা-সমিতি সারিয়া বাড়ী ফিরিতাম। সব যথানিয়মে নিষ্পন্ন হইত; কিন্তু ভাগ্যদেবী প্রফুল্ল-মুখে সাফল্য বর দিবার জন্য দেখা দিতেন না। মক্কেল মিলিত, কিন্তু

সময় সময়, অনেক দিনের ব্যবধানে। মামলা করিতেও যে ভাল লাগিত, এমন নহে। যদি বর্ষার পর গিরিনদীর প্লাবনের মত কাজ সহসা প্রবলপ্রবাহে দেখা দিত, তবে হয় ত তাহাতে আমি ডুবিয়া যাইতে পারিতাম, কি নৌকাখানি সানন্দে ভাসাইয়া সাফল্যের কূলে লইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। আমার কাজের ক্ষীণ প্রবাহে নৌকাখানিকে লগী ঠেলিয়া সাফল্যের দূর কূলে লইয়া যাইবার জন্য যে অসাধারণ ধৈর্য্যের প্রয়োজন, সে ধৈর্য্য তখন আমার নিকট বিরক্তিকর। আমি নানারূপে কেবল কষ্টই পাইতে লাগিলাম। এই সময় আমার হৃদয়ের সকল আগ্রহ আমার পুত্রকেই আঁকড়িয়া ধরিল,—আমার সকল স্নেহ তাহারই উপর ন্যস্ত হইল। আমি বিস্মৃতির সন্ধানে বাহির হইবার সময় তাহাকে আদর না করিয়া যাইতাম না—বিস্মৃতি-লাভের ব্যর্থ চেষ্টায় দিন কাটাইয়া আসিয়া প্রথমে তাহাকেই বক্ষে লইতে চাহিতাম। সে কেমন দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল—তাহার মুখে কেমন ক্রমে ক্রমে কথা ফুটিতে লাগিল, সে আমার আহ্বানে কেমন হাসিতে শিখিল—আমি সে সব সাগ্রহে লক্ষ্য করিতাম। একটা অবলম্বন না পাইলে মানুষের জীবন দুর্ব্বহ হয়। কিন্তু আমি সর্ব্বদা তাহাকে পাইতাম না। এবার পিত্রালয় হইতে আসিবার পর হইতে বিলোলার পিত্রালয়ে গমন কিছু ঘন ঘন হইতে লাগিল। ইহাতে তখন আমার রাগ হইত; কারণ, তখন আমি মনে করিতাম, পুত্রকে নাড়িয়া চাড়িয়া আমি সুখ পাই বলিয়া আমাকে সেই সুখটুকু হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া বিলোলা ঘন ঘন তাহাকে লইয়া পিত্রালয়ে যায়—যে, আমার পক্ষে কোনও সুখলাভ সম্ভব না হয়। কিন্তু

তাহার যে আর একটা কারণ থাকিতে পারে ; তাহা তখন মনেও করি নাই। আমার ব্যবহারে ব্যথিতা—মর্ম্মপীড়ায় পীড়িতা বিলোলা স্বজনের স্নেহে সাময়িক শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের জন্যই হয় ত ঘন ঘন পিত্রালয়ে মাতার নিকট যাইত। আমি যেমন বাহিরের শত কাজে বিস্মৃতিলাভের চেষ্টা করিতাম, তাহার ত তেমন কোনও উপায় ছিল না। তাই সে তাহার পক্ষে কেবল যে পথ মুক্ত ছিল, সেই পথই অবলম্বন করিত—সমবেদনাকাতর জননীর স্নেহে ও সান্ত্বনায় জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিত—যে বেদনা আর কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে পাইত না, সে বেদনা মাতার কাছে ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিত—যে অশ্রু পাছে আর কেহ দেখিতে পায় বলিয়া নয়নেই রুদ্ধ করিয়া রাখিত, মাতার নিকট তাহা বর্ষণ করিয়া দুঃসহ দুঃখ প্রশমিত করিত। তাহার পক্ষে জ্বালা জুড়াইবার—দুঃখের যন্ত্রণা নিবাইবার ত আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু তখন আমি তাহা দেখি নাই—আমি তাহার দোষসন্ধানেই ব্যস্ত ছিলাম ; কারণ, তাহাকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে পারিলে আপনার কাছে আপনাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে পারিব—আপনাকে আপনি বুঝাইতে পারিব—আমার উপরই অত্যাচার হইয়াছে।

বিলোলা যে সুখী ছিল না—সেও যে আমারই মত যাতনা ভোগ করিতেছিল, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। তাহারও মুখে হাসি ছিল না—সে দৃঢ়তাসহকারে লোককে আপনার দুর্ভাগ্য জানিতে দিত না বলিয়া, তাহার ব্যবহারে সহসা কেহ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিত না—তাহার আননের পাণ্ডুতা লোকে প্রসূতির দৌর্ব্বল্য-

জাত মনে করিত। কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত কারণ অনুমান করিতে পারিতাম। আর অনুমান করিয়া মনে করিতাম, সে পরাজয় স্বীকার করিবে। কিন্তু আমার হিসাবে ভুল হইয়াছিল। সংযমে রমণীর শ্রেষ্ঠত্ব—সহ্যগুণে সে পুরুষকে অনায়াসে পরাভূত করিতে পারে। পতির চিতায় দেহত্যাগ করিয়া রমণী একনিষ্ঠ পূত প্রেমের যে আদর্শ দেখাইয়াছে, সে আদর্শের সন্নিহিত হওয়াও পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। দুষ্কৃত পতির দুর্ব্যবহারের স্মৃতি ও বেদনা বক্ষে লইয়া পত্নী যেরূপে পতির শুশ্রূষা করে, তাহাতে তাহার দেবীত্বই বিকশিত হইয়া উঠে। সুখের দিনে যে রঙ্গিণী—দুঃখে সে সঙ্গিনী। সুখের দিনে যাহার স্ফুরিতাধর চুম্বন করিলে সুখের সিন্ধু উথলিয়া উঠে, দুঃখের দিনে তাহার সান্ত্বনায় চঞ্চল হৃদয় শান্ত হয়—অকূলে কূল মিলিয়া থাকে। সুখের দিনে সে চঞ্চলা-প্রেমবিহ্বলা, মানিনী, প্রণয়িনী, শঙ্কিতা, সঙ্কুচিতা ; দুঃখের দিনে সে স্থির, গম্ভীর, সান্ত্বনাময়ী, পরামর্শদাত্রী—শঙ্কাহীনা, সঙ্কোচ-হীনা। সুখের দিনে পত্নী খেলিবার পুতুল—দুঃখের দিনে সে অবলম্বন।

বেদনা-তাড়িত যবে, কাতর যখন,
দেবীমূর্ত্তি হেরি তব, রমণী, তখন।

সামান্য সোহাগে—আদরে পত্নী পতির সব দোষ ভুলিয়া যায়, তাহার পদানত হইয়া তাহার জন্য সানন্দে আপনার সর্ব্বস্ব তাহার পদতলে প্রদান করে। কিন্তু সে যখন মনে করে, সে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিতা, তখন সে ইচ্ছা করিলে যেরূপ কঠোর হইতে পারে, পুরুষ সেরূপ কঠোর হইতে পারে না। পুরুষ চঞ্চল, উত্তেজনার বশীভূত ; রমণী স্থির, সংযত। বিলোলা যে তাহার যৌবনপুলকিত হৃদয়ে স্বামীর

প্রেমের এবং সেই প্রেম বিকাশের জন্য ব্যাকুল হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে সে সেই ব্যাকুল বাসনা সংযত করিত। কিন্তু তাহাতে তাহার যাতনার অন্ত ছিল না। সে যদি তাহার স্নেহের অবলম্বন পুত্রকে লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে না পারিত, তবে সে কি করিত, বলিতে পারি না। সে আপনার সমস্ত স্নেহ পুত্রকে দিয়া তাহাকে বক্ষে ধরিয়া দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছিল। সে পুত্রকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিত না। আর যখন তাহার পক্ষে সে ভার একান্তই দুর্ব্বহ বোধ হইত, তখন সে তাহার মাতার সান্ত্বনা সন্ধান করিত। আরও এক দিকে সে সান্ত্বনার সন্ধান করিত—তাহার কক্ষ-প্রাচীরে বিলম্বিত দেবীমূর্ত্তির নিম্নে দাঁড়াইয়া আমি তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে দেখিয়াছি—তখন তাহার মুখে যেন শান্তির স্নিগ্ধভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। একটা বিশ্বাস বক্ষে না লইয়া রমণী জীবনধারণ করিতে পারে না। যত দিন স্বামীর প্রেমে তাহার বিশ্বাস অবিচলিত থাকে, তত দিন তাহার অন্য কোনও বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে বিশ্বাস হারাইলে সে অন্য বিশ্বাস অবলম্বন করে—আর ধর্ম্মে বিশ্বাসই সর্ব্বপ্রথম অবলম্বন করে। বিলোলা তাহাই করিয়াছিল। আমি লক্ষ্য করিতাম, দেবীমূর্ত্তীর প্রণামে সে দিন দিন অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। সে কি তাহার কোমল নারী-হৃদয়ে সত্য সত্যই দেববিশ্বাসের অগাধ শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিল? যদি পারিয়া থাকে, তবে তাহার সৌভাগ্য বলিব। সে সৌভাগ্য আমার পক্ষে বহুচেষ্টায়ও অলব্ধই রহিয়াছে।

তাহার বিষণ্ণভাব ও বেদনা সহ্য করিবার চেষ্টা আমার দৃষ্টি অতিক্রম

করিতে পারিত না। আমার যে দৃষ্টি সুখের সময় মধুপের মত তাহার মুখভাব হইতে আনন্দ-মধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমার হৃদয়ে সঞ্চিত করিত—যে দৃষ্টি তাহার মুখে প্রফুল্লতার সন্ধান করিয়া ফিরিত, সে দৃষ্টির নিকট সে কি কিছু গোপন রাখিতে পারে?

আরও এক জন আমাদের এ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কাকীমা স্বয়ং ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কি চতুরা অপর্ণা এ দিকে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন।

আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ঘামাচী মারা কাকীমা'র একটা বাতিক ছিল। তাঁহার এক ভ্রাতা পুরীতে ওকালতী করিতেন। তিনি যখনই বাড়ী আসিতেন, তখনই তাঁহাকে কাকীমা'র জন্য জগন্নাথের প্রসাদের সঙ্গে এক বাক্স করিয়া ছোট ছোট ঝিনুক আনিতে হইত। তিনি যখনই আসিতেন, আমাদের জন্য খেলনা আনিতেন। কিন্তু আমরা সেই বিচিত্র বর্ণের ঝিনুকগুলা চুরি করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতাম—সেগুলা কি সুন্দর—কত বর্ণ—কে আঁকিল? কিন্তু কাকীমা সেগুলা চাবীর মধ্যে রাখিতেন, আর আমাদের ঘামাচী গালিবার জন্য ব্যবহার করিতেন। কাকাবাবুর বিশ্বাস ছিল, ছেলেদের ঘামাচী গালিলে ফোড়া হয়। তাই কাকীমা আমাদের ঘামাচী গালিতে বসিলেই তিনি বলিতেন, "ছেলেদের লাগিবে যে।" কাকীমা'র ঘামাচী গালায় কিন্তু ব্যথা লাগিত না, বরং আরামে ঘুম আসিত।

কাকীমা ঘামাচী গালা ছাড়িলেও আমি গালাইবার অভ্যাসটি ছাড়ি নাই। কাকীমা'র পর অপর্ণাকে সে কাজে বহাল করা হইয়াছিল। সে

শ্বশুরবাড়ী যাইবার পর, নূতন চুক্তিতে দাদার বড় মেয়ে সে কাজে বহাল হইয়াছিল। চুক্তি এই যে, সে সমস্ত গ্রীষ্মকাল আমার ঘামাচী গালিবে, আর তাহার পুতুলের বিবাহে আমি কবিতা লিখিয়া দিব।

সে দিন রবিবার। মধ্যাহ্নে আমি ঘরে শুইয়া ছিলাম। দাদার বড় মেয়ে আমার ঘামাচী গালিতেছিল, আর তাহার পুতুল-মেয়ের বিবাহের আয়োজনের গল্প করিতেছিল—কি কি পোষাক হইবে, কেমন বাজনা হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাকীমা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "বিকাশ, বাবা,—আমার একটা কাজ করিয়া দিতে হইবে।"

আমি বলিলাম "কি, কাকীমা ?"

"অপর্ণার মেয়ের জন্মতিথি। আজ বৈকালে তুই যাইয়া ভাল ফুল কিনিয়া আনিবি, আর একটি কবিতা লিখিয়া দিতে হইবে।"

"তবে ত দুইটা কাজ হইল।"

"তা দুইটাই করিতে হইবে।"

"করিয়া দিব।"

"লক্ষ্মী ছেলে।"

তাহার পর কাকীমা বলিলেন,"কত দিন তোর ঘামাচী গালি নাই। আজ গালিয়া দিব। আমার বারান্দায় চল,—বেশ হাওয়া আছে।"

আমি কাকীমা'র সঙ্গে চলিলাম।

কাকাবাবু ঘরে শুইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; ছেলেদের হাঙ্গামে পারিয়া উঠিতেছিলেন না। তাহাদের গোলমালে ঘর ধ্বনিত হইতেছিল।

কাকীমা ঘর হইতে একখানা মেদিনীপুরের মছলন্দ আনিয়া পাতিয়া দিলেন,—তাহার উপর একটা বালিশ দিলেন। আমি শুইয়া পড়িলাম। তিনি আমার বাল্যকালে যেমন করিয়া আমার ঘামাচী গালিয়া দিতেন, তেমনই করিয়া গালিয়া দিতে লাগিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, যখন সত্য সত্যই ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন জীবন কেমন সুখের ছিল। যদি সে দিন ফিরিয়া আসিত! সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কিন্তু আজ আমার দুঃখ কেন?

এই সময় কাকীমা বলিলেন, "বিকাশ, তোকে একটা কথা বলিব,—তুই ছোট বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিস্?"

এ অতর্কিত প্রশ্ন এমনই অপ্রত্যাশিত যে সত্য গোপন করিবার জন্য আমাকে একটু বিব্রত হইতে হইল। সে বিব্রত-ভাবটুকু বোধ হয়, কাকীমা'র দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আমি যখন বলিলাম, "সে কি, কাকীমা?" তখন তিনি বলিলেন, "মা'র সঙ্গে মিথ্যা বলিতে নাই। বৌমার মুখ দেখিয়া আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। বাছার মুখ দেখিলে কষ্ট হয়। ছেলেমানুষ—যদি কোন দোষই করিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি রাগ করিতে আছে? ছিঃ—ঝগড়া করিস না।"

আমি আরও বিব্রত হইলাম, "কাকীমা, যাই; কবিতাটা লিখিয়া ফেলি"—বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমার কথা যদি না শুনিস্, তবে আমি তোর কাকাকে বলিয়া দিব।"

কাকীমা কি মতলব করিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু তিনি যে আমাকে ও বিলোলাকে পরস্পরের নিকটে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগি-

লেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি যখন তখন আবশ্যক অনা-বশ্যক নানা দ্রব্য বিলোলাকে দিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দিতেন, এবং সুবিধা পাইলেই আমার কাছে কোনও শিশুকে দিয়া বিলোলার কাছে দিবার আদেশ করিতেন। তাঁহার ব্যবস্থায় আমার অনেক কাজের ভার বিলোলার উপর পড়িল, আমরা পরস্পরের সন্নিহিত হইতে লাগিলাম।

কাকীমা'র এই স্নেহচেষ্টার স্বরূপ আমরা উভয়েই বুঝিয়াছিলাম, এবং আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা যে কেহ জানিতে পারে, তাহাও আমাদের অভিপ্রেত ছিল না। কাজেই আমরা কাকীমা'র নির্দ্দেশমত কাজ করিতে লাগিলাম; লোকের কাছে দেখাইতে লাগিলাম—কিছুই হয় নাই। সমস্ত ব্যবহারেই একটা মিথ্যার আবরণ দিয়া—মিথ্যার মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম। ইহা যে আমাদের উভয়ের পক্ষেই দুঃখের, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কাকীমা যেরূপে কাজ আরব্ধ করিয়াছিলেন—তাহাতে ভবিষ্যতে কি হইত, বলা যায় না। কারণ, মিলনব্যাকুল যুবক যুবতী—পতি পত্নী যদি ভ্রান্ত অভিমানে পরস্পরের সন্নিহিত হইতে না পারে, তবে একটা সুযোগ উপস্থিত হইলে সে অন্তরায় স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মত বিধৌত হইয়া যাইতে পারে। আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ আসিয়াও ফিরিয়া গেল—ভাগ্যদোষে আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না।

নবম পরিচ্ছেদ

কাকীমা

কাকীমা'র স্বাস্থ্য ভাল ছিল—আমরা কখনও তাঁহাকে দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিতে দেখি নাই—কখনও সামান্য অসুখ হইলে অল্প দিনেই সারিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি কোনও দিন অসুখকে আমল দিতেন না। আষাঢ়ের মধ্যভাগে—তাঁহার যখন জ্বর হইল, তখনও তিনি তাহাই করিলেন; প্রথম তিন চারি দিন ঔষধ গ্রহণও করিলেন না। তবুও জ্বর গেল না দেখিয়া পরদিন ডাক্তার ডাকা স্থির হইল। পরদিন প্রাতে অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "প্লুরেসি।" কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, "ও সব ভয় দেখান কথা।"

কিন্তু আমরা ভয় পাইলাম। ডাক্তারদিগের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইতে লাগিল। ব্যাধির বেগ প্রশমিত হইল না। রোগের চিকিৎসা রোগীর পক্ষে বিশেষ যন্ত্রণাকর হইলেও কাকীমা'র হাসি মুখের প্রফুল্লতা ক্ষুণ্ণ হইল না। তিনি আমাদের সহিত হাসিয়া কথা কহিতেন; আমাদের ভয়ের জন্য বিদ্রূপ করিতেন—বলিতেন, "তোদের ত মা'র অভাব নাই—একগণ্ডা; তাহার মধ্যে যদি একটা কমে, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাতে তোদের কোনও অসুবিধা হইবে না।" আমরা রাত্রি জাগি বলিয়া তিরস্কার করিতেন। মৃত্যুর জন্য তাঁহার মনে আশঙ্কার কোনরূপ ছায়াপাত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অসুখ বাড়িয়াই চলিল।

ডাক্তাররা ভয় পাইলেন। সংবাদ পাইয়া দিদি আসিলেন। দিদিকে দেখিয়া কাকীমা হাসিলেন; বলিলেন, "এইবার সব উদ্যোগ হইয়াছে। মরিবার এমন সময় আর পাইব না। চারি দিকে তোদের দেখিতে দেখিতে যদি মরিতে পারি, তবে ত আমি ভাগ্যবতী।" কাকীমা'র কথা শুনিয়া দিদি কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া কাকীমা বলিলেন, "তুই কাঁদিয়া ফেলিলি!" তাহার পর তিনি মা'কে বলিলেন, "দিদি, তোমার মেয়ে তুমি শান্ত কর—এখন হইতে আমার অবসর।" মা বলিলেন, "ছিঃ, অমন কথা বলিও না।" বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মা ও কাকীমা প্রায় সমবয়সী—দুই জনের মধ্যে ভগিনীভাবই ছিল—কৈশরে উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ভগিনীভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল, সময়ের সঙ্গে তাহা বর্দ্ধিতই হইয়াছিল। মা'র স্নেহ অত্যন্ত গভীর, কিন্তু মৌন। কিন্তু কাকীমা জানিতেন, মার ভগিনী-স্নেহ তিনিই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

পিসীমা দিদিকে লইয়া যাইলেন। মা তখনও কাঁদিতেছিলেন। কাকীমা বলিলেন, "দিদি, এই বুঝি তুমি আমাকে ভালবাস। আজ যদি তুমি মরিতে, তবে আমি কত আনন্দিত হইতাম।" মা বলিলেন, "তোমাতে আর আমাতে?" কাকীমা বলিলেন, "তবে ত তোমার আরও আনন্দ হইবার কথা।" তাহার পর তিনি কাকাবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "উঁহার বড় কষ্ট হইবে। না, দিদি?" কাকীমা'র হাসিমুখে একবার বিষণ্ণভাব দেখা গেল—নয়নপল্লব একবার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। যখন জীবনও সুখের, মরণও সুখের, তখন পরিচিত ও অপরিচিত উভয়ের মধ্যে কে প্রিয়তর, স্থির করা দুঃসাধ্য।

কাকীমা'র মৃত্যু হইলে কাকাবাবুর পক্ষে জীবন কিরূপ নিরানন্দ—জগৎ কিরূপ অন্ধকার হইবে, তাহার আভাস আমরা পাইতেছিলাম। তিনি ঘণ্টায় তিন চারিবার আমাদের কাছে কাকীমা'র সংবাদ লইতেছিলেন, ঘন ঘন কাকীমা'র ঘরে আসিতেছিলেন; কিন্তু তথায় তিষ্ঠিতে পারিতেছিলেন না। কাকীমা'র মুখের পাণ্ডুবর্ণ যেন তাঁহারও মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল—কাকীমা'র রোগ-যাতনা যেন তাঁহারও বক্ষে অনুভূত হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিলে কষ্ট হইত।

মৃত্যুর সহিত জীবনের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। পিসীমা ছেলেদের দেখিতে লাগিলেন—অপর্ণা তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল; জ্যেঠাইমা সংসারের কাজ দেখিতে লাগিলেন। মা, দিদি ও বধূরা তিন জন পর্য্যায়-ক্রমে কাকীমা'র শুশ্রূষা করিতেন। মেজদাদা ও আমি, দুই জন পর্য্যায়-ক্রমে তাঁহার কাছে থাকিতাম। দাদাকে ও সেজদাদাকে এক একবার আফিসে যাইতে হইত।

তাঁহারা আসিয়া আমাদের স্থান গ্রহণ করিলে আমরা বিশ্রাম করিতাম। বিশ্রাম করিবার অবসর পাইতাম বটে; কিন্তু বিশ্রাম করিতে পারিতাম না,—কারণ, উদ্বেগের মাত্রা যখন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন মানুষের আহারনিদ্রারও প্রয়োজন হয় না। শরীরের সমস্ত শক্তি সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে, অবসন্ন হয় না। আমি নিদ্রার জন্য শয়ন করিতাম,—নিদ্রিত হইতে পারিতাম না, পার্শ্বের কক্ষের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম।

মেজদাদাকে আমি কখনও রোগীর শুশ্রূষা করিতে দেখি নাই। বিশেষ, বিপত্নীক হইবার পর হইতে তিনি যেন সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া

স্বতন্ত্র জগতে বাস করিতেন,—সংসারের কোনও ভাবনা ভাবিতেন না,—কোনও কথায় থাকিতেন না। কাকাবাবুও কোনও কারণে সেই ভাব ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। এবার তাঁহার শুশ্রূষাতৎপরতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। বুঝিলাম, তিনি চিত্তকে সংযত করিয়া জয়ী হইয়াছেন,—যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, সেই কার্য্যেই অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন। তিনি কিছুতেই চঞ্চল হয়েন না। সর্ব্বদাই সর্ব্বাবস্থাতেই স্থির। শোকের বহ্নি তাঁহার মানবভাব ভস্মীভূত করিয়া দেবভাবই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

কাকাবাবু আমাদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। আমাদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিতেন, প্রবোধ দিতেন। কিন্তু, তাঁহার বিশ্রাম ছিল না;—তাঁহার চিত্ত যে কোনও প্রবোধ মানিতেছিল না, তাহা তাঁহার বিবর্ণ শ্রীহীন মুখে বুঝা যাইত। তাঁহাকে কে বুঝাইবে, কে বুঝাইতে পারে? তাঁহার বেদনার কি পরিমাণ করা যায়? তিনি রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত আপনার অন্তরস্থিত বহ্নিদাহে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন।

এক একটি দুশ্চিন্তা-দুর্ব্বহ, আশঙ্কা-ভার-গুরু দিন কতই দীর্ঘ বোধ হইত। দিনে যে চব্বিশ ঘণ্টা, আর প্রতি ঘণ্টায় যে ষাট মিনিট, তাহা শঙ্কিতহৃদয়ে প্রিয় জনের রোগ শয্যা-পার্শ্বে না বসিলে বুঝিতে পারা যায় না। যখন ঘড়ী দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঔষধ ও পথ্য পান করাইতে হয়,—শুশ্রূষা করিতে হয়,—আর শঙ্কা-সতর্ক নয়ন কেবলই রোগীর মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করে, তখনই বুঝিতে পারা যায়, দিন কত দীর্ঘ। যখন জানিতে পারা যায়, এই কয় দিন কাটিলে রোগীর জীবন-দীপ বোধ হয়

আর নিবিবে না,—তখন মনে হয়, দীর্ঘ দিনগুলাকে যদি কোনরূপে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতাম। এমনই ভাবে দীর্ঘ পক্ষ কাল কাটিল। তাহার পর সকলেই বুঝিল, মৃত্যুর জয় অনিবার্য্য; তাহার আগমন দুই দিন বিলম্বিত হইলেও হইতে পারে, রুদ্ধ হইবে না। আমাদের হৃদয়ে আশার আলো নিবিয়া গেল।

কাকীমা সাত ভ্রাতার এক ভগিনী, বড় আদরের। তাঁহার তিন ভ্রাতা বিদেশে থাকিতেন, তিন জনই আসিয়াছিলেন। যিনি পুরীতে থাকিতেন, তিনি অন্যান্য বারের মত এবারও জগন্নাথের প্রসাদ ও ঝিনুক লইয়া আসিয়াছিলেন। কাকীমা প্রসাদ মস্তকে স্পর্শ করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন; ঝিনুকের বাক্স অপর্ণাকে দিয়া বলিলেন; "ছোটবৌমাকে রাখিতে দে; বিকাশের ঘামাচী মারিয়া দিবে। ছেলেটি আমার এখনও ছেলেবেলার মত ঘামাচী গালাইতে ভালবাসে।" আমার কতকগুলা চুল কপালে পড়িয়াছিল; কাকীমা সেগুলি সরাইয়া দিয়া সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তিনি একবার আমার দিকে, আর একবার অদূরে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠনবতী বিলোলার দিকে চাহিলেন। বিলোলা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল কি না, এবং করিয়া থাকিলে সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, জানি না। আমি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াছিলাম,—"ছিঃ, ঝগড়া করিস্ না।" যিনি মা না হইয়াও আমাকে মাতৃস্নেহ দিতে কার্পণ্য করেন নাই; পরন্তু আপনার সন্তানদিগের সহিত সমভাগে আমাদিগকে যে স্নেহ দিয়াছিলেন,—মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া রোগযাতনার মধ্যেও যিনি আমার সুখের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সেই শেষ অনুরোধও রাখি নাই,

বিলোলাকে ডাকিয়া বলিতে পারি নাই,—"আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি। আমার মাতার আজ্ঞা,—আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" কবে বিস্মৃতির শীতল প্রলেপে এই মর্ম্মপীড়ার জ্বালা জুড়াইবে? আমার মত হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি? আমার মনস্তাপের বহ্নিদাহ নির্ব্বাপিত হইবার নহে,—যে সলিলে তাহা নির্ব্বাপিত হইত, সে সলিলের মঙ্গল-কলস যে আমি স্বহস্তে ভাঙ্গিয়াছি। কাকীমা'র চিতানলেও আমি আমার দম্ভ ভস্মীভূত করিতে পারি নাই,—তাহাকে তখন এমনই প্রিয়,—এমনই প্রয়োজনীয়,—এমনই সযত্নে রক্ষার উপযোগী মনে করিয়াছিলাম!

দিন দিন মৃত্যুর জয় সপ্রকাশ হইতে লাগিল—শেষে আসন্ন মৃত্যুর চিহ্নসকল প্রকাশ পাইল। কাকীমা'র তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি আমাদের সকলের অগ্রেই বুঝিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন,—পতি-পুত্র-কন্যা রাখিয়া পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র দৌহিত্রী-পরিবেষ্টিত হইয়া যাঁহাদিগকে তিনি পুত্রস্নেহে পালিত করিয়াছিলেন, সেই ভাসুর-পুত্রদিগের পরিপূর্ণ সংসার দেখিয়া,—আনন্দে ইহলোক ত্যাগ করিবেন। ফলটি পুষ্ট হইলে ফুল যখন ঝরিয়া যায়, তখন তাহার ঝরিতে দুঃখ কি? হিন্দুর ঘরে সীমন্তে সিন্দুর ও প্রকোষ্ঠে লৌহ লইয়া সধবা রমণী যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন লোক বলে,—তিনি বিজয়গর্ব্বে ডঙ্কা বাজাইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। লোক তাঁহার চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হয়,—তাঁহার সীমন্তসিন্দুর সযত্নে রক্ষা করে। কাকীমা তেমনই ভাবে মহাপ্রস্থান করিতেছিলেন। তিনি জীবনে কখনও স্বজনের অকালমৃত্যুর শোক ভোগ করেন নাই। তিনি

পিত্রালয়ে সকলের আদরের—বড় ভালবাসার ছিলেন। তাহার পর তিনি যে সংসারে আসিয়াছিলেন, সে সংসারও তাঁহাকে সুখ ব্যতীত দুঃখ দেয় নাই। স্বামীর সহিত তাঁহার একপ্রাণতা হেতু তিনি প্রৌঢ়েও যৌবনের প্রফুল্লতা—রহস্য-প্রিয়তা হারান নাই। তাঁহার স্বভাব-গুণে আমরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতাম, ভক্তি করিতাম। তিনি সংসারে সকলের সুখের জন্যই ব্যস্ত থাকিতেন। এই অবস্থায় সাজান সংসার রাখিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিতেছিলেন। সেই জন্য তিনি আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

যখন তিনি বুঝিলেন, দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে, চরণসঞ্চালন কষ্টসাধ্য বোধ হইতেছে, কথা কহিতে কষ্টবোধ হইতেছে, তখন তিনি একবার ছেলেদের আনিতে বলিলেন। ছেলেদের তিনি যেমন ভালবাসিতেন—তাহারা তাঁহাকে তেমনই ভালবাসিত। কয় দিন তাহারা তাঁহার কাছে আসিতে পায় নাই; আজ আসিবার আহ্বানে সানন্দে কোলাহল করিতে করিতে ঘরে আসিল—"দিদি", "দিদ্দা" "দিদিমা" "ছোটদিদি"—"দিদিমণি" নানা আহ্বানে কক্ষ মুখর করিয়া তুলিল। আমরা তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিলে কাকীমা বারণ করিলেন—"এমন মিষ্টি কথা শুনিতে বাধা দিও না।" তিনি হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি আমি দেখিয়াছি—শারদীয় মহোৎসবে দেবীর ওষ্ঠাধরে; আর কোথাও দেখি নাই।

কাকীমা ছেলেদের প্রত্যেককে আদর করিলেন; অপর্ণাকে তাঁহার আলমারী হইতে খেলানা আনিতে বলিলেন; প্রত্যেককে একটি করিয়া খেলানা দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

তাহার পর তিনি জ্যেঠাইমা'র, পিসীমা'র ও মা'র পদধূলি লইলেন; তাঁহার পিত্রালয়ের প্রণম্যদিগকে প্রণাম ও আর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন আমরা আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। কেবল মেজদাদা স্থির। তিনি কাকাবাবুকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। বেদনার যে চাঞ্চল্য পূর্ব্বে কাকাবাবুকে ঘরে তিষ্ঠিতে দেয় নাই, আজ তাহার অবমান হইয়াছিল। আসন্ন সর্ব্বনাশের সময় হৃদয়ে বল আপনা হইতেই আইসে—নহিলে মানুষ শোকশেল হৃদয়ে লইয়াও জীবনধারণ করিতে পারে না। কাকাবাবু স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন—কেবল তাঁহার বিবর্ণ শুষ্কমুখে অন্তরস্থ বহ্নিদাহ বুঝা যাইতেছিল—কেবল তাঁহার কোটরগত চক্ষু দুইটি জ্বলিতেছিল,—তিনি প্রাণান্ত চেষ্টায় অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়া রাখিতেছিলেন।

মস্তকে হস্ত স্থাপিত করিয়া আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, কন্যাদ্বয়ের চক্ষু মুছাইয়া ও বধূত্রয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিয়া কাকীমা কাকাবাবুর দিকে চাহিলেন।

কাকাবাবু উঠিতেছেন দেখিয়া মেজদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকা-বাবু, কোথায় যাইতেছেন?" কাকাবাবু বলিলেন, "কোথাও যাইতেছি না, বাবা, আমি তোমার কাকীমা'র কাছে প্রতিশ্রুত আছি, মৃত্যুকালে তাঁহার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিব।"

তিনি কাকীমা'র বিছানায় যাইয়া তাঁহার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যেমন সুখে যাইতেছ, যদি জন্মান্তর থাকে, তবে তাহাতেও তেমনই সুখী হইও।"

কাকীমা দুই হাত তুলিয়া সাগ্রহে স্বামীর চরণ মস্তকে চাপিয়া ধরিলেন—বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিলেন ; যেন ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তাহার পর তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শিথিল হস্ত পতিপদ ত্যাগ করিল। তিনি অন্তিমে স্মরণ করিলেন—"গঙ্গা!"

মা কাকীমা'র মুখে গঙ্গাজল দিলেন। কাকীমা কর জপ করিতে লাগিলেন। তিনি যতক্ষণ বাঁচিয়া ছিলেন, আর কথা বলেন নাই। কয় ঘণ্টা পরে সব ফুরাইল! পিতৃশোক ভোগ করিয়াছিলাম, আজ মাতৃহীনের দুঃখ বুঝিতে পারিলাম।

কাকীমা অলক্তরঞ্জন বড় ভালবাসিতেন। বধূদের বা ভগিনীদের কেহ নাপিতানী আসিলে আলতা পরিতে না চাহিলে তিনি রাগ করিতেন—"এয়স্ত্রী মানুষের আল্‌তা পরিতে আলস্য কি?" আজ তাঁহারা অলক্তক দিয়া তাঁহার মৃত্যুশীতল চরণ রঞ্জিত করিলেন—যাবক-রঞ্জনে আমরা কাগজে সেই চরণের ছাপ লইলাম। তাহার পর চরণে অলক্তক ও সীমন্তে সিন্দূর দিয়া, বধূরূপে তিনি যে বারাণসী-শাটী পরিয়া প্রথম পতিগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই শাটীতে তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া, শ্মশানে লইলাম। কাকীমা আমাদিগকে ছাড়িয়া কোন্ অজ্ঞাত দেশে গমন করিলেন।

শ্মশানেও দেখিলাম, মেজদাদা স্থির—কাকাবাবুকে লক্ষ্য করিতেছেন। কাকীমা'র দেহ ভস্মীভূত হইল। আমরা কলসে কলসে গঙ্গাজল আনিয়া চিতানল নির্ব্বাপিত করিয়া স্নানান্তে শুভ্র নব-বাসে শূন্যহৃদয়ে গৃহাভিমুখগামী হইলাম। যাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাঁহাকে রাখিয়া চলিলাম। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ ; সকলেরই নয়ন অশ্রু-

ভারাক্রান্ত। তবে তখন সকলেই শান্ত; শোকের অস্থিরতা তখন অপগত।

গৃহে ফিরিবার সময় কাকাবাবু মেজদাদার স্কন্ধে ভর দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন—তাঁহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, আর পুনঃ পুনঃ মেজদাদার দিকে চাহিতেছিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টিতে যেন তাঁহার অন্তরের কথা ব্যক্ত হইতেছিল; তিনি যেন পুত্রাধিক ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিতেছিলেন—"তোমার বক্ষে যে বেদনা সে বেদনার স্বরূপ আমি এতদিনও বুঝিতে পারি নাই; আজ বুঝিলাম। তুমি কি বেদনাই বহিতেছ!"

দশম পরিচ্ছেদ

শ্মশান-বহ্নি

আমরা গঙ্গাজল ঢালিয়া কাকীমা'র চিতা নির্ব্বাপিত করিয়াছিলাম। কাকাবাবু সে বহ্নি বক্ষে লইয়া আসিয়াছিলেন—সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর তাঁহাকে শোকক্লিষ্ট দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেবারে আর এবারে কি প্রভেদ! সেবার কর্ত্তব্যের উত্তেজনায়—সংসারের কাজের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়া শোক জয় করিয়াছিলে—দুই ভ্রাতার কর্ত্তব্য একক এমন ভাবে সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন যে, আমরা সংসারে বাবার অভাব অনুভব করিবার অবসর পাই নাই। আর কাকীমা'র শুশ্রূষায় তিনি যে সে শোকে শান্তি পাইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবার যেন সংসারে তাঁহার আর কোনও কাজ ছিল না, কোনও আকর্ষণ ছিল না; তিনি যেন সংসারের হাটে সব কাজ শেষ করিয়া খেয়াঘাটে আসিয়া খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরপারে গৃহে যাইবেন, দিবসব্যাপী শ্রমের পর তথায় বিশ্রাম লাভ করিবেন।

শোকে আর্ত্তনাদে তিন দিন কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিন দিদিকে ও অপর্ণাকে "চতুর্থী" করিতে হইবে। কাকাবাবু সব উদ্যোগ করিয়া দিলেন—সে কাজ কাকীমা'র তৃপ্ত্যর্থ।

সেই দিন তিনি পিসীমা'র নিকট হইতে কাকীমা'র অলঙ্কারগুলি

চাহিয়া লইলেন, আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাকীমা সর্ব্বদা যে অলঙ্কারগুলি ব্যবহার করিতেন, সেগুলি দুই ভাগ করিয়া দিদিকে ও অপর্ণাকে দিলেন,—কেবল যে অঙ্গুরীয় কাকীমা'র অঙ্গুলীতে শোভা পাইত, সেইটি আপনার জন্য রাখিলেন। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার শব শেষ-শয়নে শায়িত করিয়াছি, তখনও আমরা সে অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলীচ্যুত করি নাই।

বাক্স খুলিয়া তিনি অন্য অলঙ্কারগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন —তিন বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা সকল, এই তিন ভাগ তোমাদের তিন জনের। তিনি তোমাদের কত ভালবাসিতেন, বোধ হয়, তোমরাও তাহা জান না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার কথা মনে করিও।" কাকাবাবুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। আমার মনে পড়িল, শুনিয়াছি, জ্যেঠামহাশয় জ্যেঠাইমা'র জন্য স্বতন্ত্র একখানি শাটী আনিলে পিতামহদেব তাহা তিন খণ্ড করিয়া তিন বধূকে দিয়াছিলেন। চন্দন-বৃক্ষ হইতে চন্দন বৃক্ষই উৎপন্ন হয়। বংশমর্য্যাদা কি কুসংস্কার?

তাহার পর কাকীমা'র শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। বাবা ও কাকাবাবু পিতামাতার—পিতামহ-পিতামহীর বার্ষিক শ্রাদ্ধও কখনও বাদ দিতেন না—যথানিয়মে সম্পন্ন করিতেন। বাবার মৃত্যুর পর হইতে আমরাও তাঁহার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতাম।

কাকীমা'র শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কাকাবাবু কাজ দেখিলেন; তাহার পরে অবসাদে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে সংসারে সব কাজই তিনি দেখিতেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ঘরে দাদার,

সেজদাদার ও আমার ডাক পড়িল। যাইয়া দেখি, পিসীমা, জ্যেঠাইমা, মা ও দিদি তথায় উপস্থিত। কাকাবাবু বলিলেন, "একটু কাজের জন্য তোদের ডাকিয়াছি। আমি বুড়া হইয়াছি—আর ত পারি না, সংসারের ভার বহিতে পারি না; তোরা কেহ হাতে কর।" দাদা উত্তর করিলেন, "আমরা কিছুই জানি না,—আপনি যখন যাহা করিতে বলিবেন, করিব। কিন্তু আমরা কেহ ভার লইবার উপযুক্ত নহি।" কাকাবাবু বলিলেন, "তোরা এক জন ভার লইয়া যখন যাহা দরকার আমাকে জিজ্ঞাসা করিস। দেখ, আমি যে অকর্ম্মা হইয়া জীবন কাটাইলাম, সে সংসারের জন্য—বাবার আদেশে। দাদা যখন আমাকে তাঁহার সঙ্গে কাজে বাহির করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন উপার্জ্জনের আশায় আমিও উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। কিন্তু বাবা বুঝাইয়াছিলেন, যে সংসারটার জন্য এত, সে সংসারটা ভাল করিয়া দেখিতে হয়—নহিলে সবই ভস্মে ঘৃতদান। তিনি আমাকে সংসার দেখিতে শিখাইয়াছিলেন। বুড়া হইয়া আমারও মনে হইতেছে, তোরা কেহ সংসার না দেখিলে সংসার চলিবে না। আগে সে কথা বড় মনে করি নাই—মৃত্যুর কথাটা লোক যেন ভাবিতেই চাহে না; কিন্তু এখন মনে করিতেছি।" কাকাবাবুকে কাজে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে, ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত ছিল। দাদা বলিলেন, "সংসার আমাদের, না আপনার? আমরা আপনার কথায় খাটিব।" কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "কিন্তু খাটাইবার লোক আর কতদিন থাকিবে?" দাদা বলিলেন, "সে তখন যাহা হয় হইবে।" কাকাবাবু বলিলেন, "বাবা, তাহাও বুঝি—কাহারও জন্য কাজ আটকাইয়া থাকে না, আর সংসারেও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। তবু ইচ্ছা করে, তোদের যেমনটি

রাখিয়া যাইব, অন্ততঃ তোরা কয় ভাই তেমনই থাকিস।” দাদা বলিলেন, “কাকাবাবু, আপনি সে জন্য ভাবিবেন না। আমি সকলের বড়; যত দিন আমি থাকিব, তত দিন আপনার সংসার আপনি যেমন রাখিয়া যাইবেন, তেমনই রাখিব।” আমি বলিলাম, “আমাদের সম্বন্ধে অবিশ্বাস কেন, কাকাবাবু?” কাকাবাবু বলিলেন, “অবিশ্বাস নাই; থাকিলে আমি সংসারে ঝগড়ার বীজ রাখিয়া যাইতাম না—তাহার মত ব্যবস্থা করিয়া যাইতাম। তবে দেখ, কাজও অনেক। দিদিকে, বড়বৌকে, মেজবৌকে দেখিতে হইবে; আর দেখিস্, প্রভাসকে যেন কোনরূপে বিরক্ত করিস্ না।” তিনি পিসীমাকে বলিলেন, “আমি বলি, বুড়ারা বিশ্রাম করিবে—ছেলেরা খাটিবে। তুমি বড়বৌমাকে তোমার কাজ শিখাইয়া দাও, বড়বৌ সেজবৌমাকে কাজ শিখাউন; আর সেজবৌমা’র কাজ ছোটবৌমা শিখুন। জিত ছোটবৌমারই হইবে, কারণ, সেজবৌমা সব কাজই নিজে করিবেন, কথাটি বলিবেন না।”

আমার দিকে ফিরিয়া কাকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, “আমি ছোট ভাই সংসার দেখিয়াছি। সে নজীরে তোকে দেখিতে হয়।” আমি বলিলাম, “আমি!” কাকাবাবু হাসিয়া উঠিলেন; দাদার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “ওকে দিয়া কোনও কাজ হইবে না। ও কবিতা লিখে।” এই বলিয়া সেক্সপীয়র যে রচনায় পাগল, প্রেমিক ও কবিকে একশ্রেণীর লোক বলিয়াছেন, সেই রচনাটির আবৃত্তি করিলেন। তাহার পর আবার দাদাকে বলিলেন, “আভাস, তুই বড়—তোকেই এ কাজ করিতে হইবে। আমি ছোট ভাই সংসার দেখিতাম বটে; কিন্তু দোষ গুণ সব দাদার ছিল। দোষ গুণ সবই তোর হইবে—তোকেই কাজ করিতে হইবে।

তোর কাজ বড় বেশী হইল বটে ; কিন্তু উপায় নাই। তবে আমি যতটুকু পারি, তোর সাহায্য করিব।”

যে শক্তি কেন্দ্র হইতে নানারূপে নানাদিকে বিস্তৃত হইয়া যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, সেই শক্তির অভাব হইলে যন্ত্রের যে দশা হয়, কাকীমা'র মৃত্যুতে কাকাবাবুর সেই দশা হইল। বাহিরের কেহ তাঁহার পরিবর্ত্তন সহজে বুঝিতে পারিত না। তিনি মেজদাদারই মত আহারে আমিষ ও বেশে বিলাস বর্জ্জন করিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলাম। দিদি পিতৃগৃহেই রহিলেন। আমরা সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যে তরু বক্ষঃস্থিত বহ্নিদাহে দগ্ধ হয়—বারিদের বারিবর্ষণে তাহার কি হইবে ?

অশৌচের সময় আমরা চারি ভ্রাতাই তাঁহার ঘরে শয়ন করিতাম। যখনই জাগিতাম, তখনই দেখিতাম, তিনি জাগিয়া আছেন—হয় ত বারান্দায় বেড়াইতেছেন। অশৌচান্তেই তিনি পিসীমা'কে বলিলেন, “দিদি, ছেলেরা যেন যে যাহার ঘরে শয়ন করে।” সে কথা শুনিয়া মেজদাদা বলিলেন, “কাকাবাবু, আমি আপনার কাছে থাকিব।” কাকাবাবু সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠে কর বুলাইয়া বলিলেন, “না বাবা, তুমি তোমার ঘরে শুইবে।”—অর্থাৎ, যে ঘর তোমার পত্নীর স্মৃতিপূত, সেই ঘরেই তোমার আশ্রয়। মেজদাদা কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিলেন—সম-শোককাতর হৃদয়ে ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয়। তিনি বলিলেন, “কিন্তু আপনার সুনিদ্রা হয় না—কাছে এক জন থাকিতে হইবে।” দাদার মধ্যম পুত্র পূর্ণেন্দু নিকটে ছিল, কাকাবাবু দক্ষিণ বাহুতে তাহার

গলদেশ বেষ্টিত করিয়া বলিলেন, "যদি থাকিতেই হয়, তবে পূর্ণেন্দু থাকিবে। কি বলিস্ পূর্ণেন্দু ?" পূর্ণেন্দু সাগ্রহে সম্মতি জানাইল। তখন কাকাবাবু তাহাকে একটু ঠাট্টা করিলেন ; নাতি নাতিনীর সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবহার সেকালের ধরণের মিষ্ট। বোধ হয়, একটু বিশেষ কারণে তিনি পূর্ণেন্দুকে বাছিয়া লইয়াছিলেন—সে তরুণবয়স্ক এবং ব্যায়ামপ্রিয় ; কাজেই তাহার গাঢ় নিদ্রা হইবে—তিনি জাগিয়া থাকিলেও—উঠিয়া বেড়াইলেও সে জানিতে পারিবে না।

কোনও কাজেই কাকাবাবুর মন বসিত না। পূর্ব্বে তিনি প্রতিদিন অপরাহ্নে বালকবালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন ; এখন আর যাইতে চাহিতেন না ; কেবল আপনার ঘরে স্মৃতি লইয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন। মেজদাদা যৌবনে বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার মানসিক শক্তি—হৃদয়ে বল প্রদীপ্ত। তিনি সে শোক সহ্য করিয়াছিলেন—বেদনা বক্ষে বহিয়া অবসন্ন হয়েন নাই ; শাস্ত্রচর্চ্চায় মন দিয়া জীবনের একটা উদ্দেশ্য গড়িয়া লইয়াছিলেন। কাকাবাবু যখন বিপত্নীক হইলেন, তখন জরা তাঁহার দেহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—হৃদয়ের বল কমিয়া গিয়াছে। তিনি আর শোক সংযত রাখিতে পারিলেন না—সেই আঘাতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তিনি আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতেন ; পারিতেন না। এক দিন তিনি মেজদাদাকে খানকতক পুস্তক দিতে বলিলেন। মেজদাদা বাছিয়া কয়খানি পুস্তক দিলেন। দেখিলাম, কাকাবাবু কয় দিন মন দিয়া কয়খানা পুস্তক পাঠ করিলেন—তাহার পর এক দিন সেগুলা মেজদাদার ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে গাড়ীতে

বেড়াইতে যাইবার সময় মেজদাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বহি-গুলা পড়িলেন?" তিনি বলিলেন, "কতকগুলা পড়িলাম।" তাহার পর বলিলেন, "কিন্তু, দেখ, হৃদয়ের তৃপ্তির অপেক্ষা ভালমন্দের বড় বিচারক আর নাই। আর দর্শনের অপেক্ষা শোক অনেক অধিক পবিত্র।" মেজদাদা আর কোনও কথা কহিলেন না।

কাকাবাবুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে দেখা মেজদাদা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি এতদিন সংসারের কোনও খোঁজই লইতেন না—আপনার কক্ষে স্মৃতি ও অধ্যয়ন লইয়া থাকিতেন। এবার তিনি সে অভ্যাস ত্যাগ করিলেন। তিনিই অপরাহ্নে কাকাবাবুকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন—আমি এক এক দিন সঙ্গে যাইতাম। তিনি কাকাবাবুকে দেখিবার ভার লইলেন। তাঁহার সঙ্গে কাকাবাবুও যেন কিছু ভাল থাকিতেন। তাঁহার কথায় কাকাবাবু এক দিন পিসীমাকে বলিলেন, "দিদি, ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে?" পিসীমা বলিলেন, "পড়ে বই কি? কেন, প্রকাশ?" কাকাবাবু বলিলেন, "আমার মনে হয়, আবার যেন আমার সেই সময় আসিয়াছে। তুমি জান, আমি বড় দুরন্ত ছিলাম। কিন্তু জ্যেঠামহাশয় আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল-বাসিতেন। সেইজন্য আমাকে দেখিবার ভার তিনিই লইয়াছিলেন। মা'রও আমাকে দেখিতে হইত না। জ্যেঠামহাশয়ই দেখিতেন। এখন প্রভাস ঠিক তেমনই করিয়া আমাকে দেখিতেছে। আপনার ব্যর্থজীবনের সব ব্যথা গোপন করিয়া আমার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছে। দিদি, তুমি এমন ছেলে কি আর দেখিয়াছ? যে বংশে প্রভাসের মত ছেলে জন্মগ্রহণ

করে, সে বংশের সৌভাগ্য।" পিসীমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বাছা আমার সন্ন্যাসী হইয়া জীবন কাটাইল।" কাকাবাবু বলিলেন, "কিন্তু দুঃখ মানুষকে দেবতা করে—দেখিলে ?"

যত দিন যাইতে লাগিল কাকাবাবুর জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা ততই বাড়িতে লাগিল। কালের ঔষধে যে শোক প্রশমিত না হয়, তাহার তীব্রতা শোকার্ত্তকে বিনষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। যে দাবানল বর্ষণেও নির্ব্বাপিত হয় না, তাহা বন দগ্ধ না করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করে না—দাহ্য পদার্থের অভাব ব্যতীত কিছুতেই তাহার নির্ব্বাণ নাই। এত দিন যে দেহে জরার লক্ষণ লক্ষিত হইত না, এখন সে দেহ যেন জরায় জীর্ণ হইয়া গেল।

তিনি ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতেন—হাসিতেন, তাহাদিগকে আদর করিতেন—তাহারা তাঁহার কাছে খাইত—শুইত—ঘুমাইয়া পড়িত। কিন্তু তাঁহার অধরে যে হাসি পূর্ব্বেরই মত লাগিয়া থাকিত, তাহা আর হৃদয়স্থিত প্রফুল্লতার উৎস হইতে উৎসারিত হইত না।—সে উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল। আমরা তাঁহার কাছে কাছে থাকিতাম—কথায় কথায় তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিছুতেই কিছু হইত না। একদিন পিসীমা বলিলেন, "ভাই, শরীর যে পাত করিতে বসিলি। ছেলেরা তোর জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া শুকাইয়া যাইতেছে—উহাদের দিকে চাহিয়া দেখ।" কাকাবাবু বলিলেন, "কেন দিদি, আমার শরীর ত ভালই আছে। আমার যত্নেরও ত কোন ত্রুটী হইতেছে না। কিন্তু দেখ, এই সব সোনার পুতল রাখিয়া সাজান সংসার দেখিতে দেখিতে ছোটবৌ যেমন গিয়াছে, তেমনই যদি যাইতে পারি, তবে

তাহার অপেক্ষা সুখের আর কি আছে?" পিসীমা কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "সে আমার সতীলক্ষ্মী—কোনদিন কাহাকেও কোনও কষ্ট দেয় নাই—কোনদিন কোনও কষ্ট পায় নাই।" কাকাবাবু বলিলেন, "দিদি, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না। আমার সব কাজ শেষ হইয়াছে—সব ছেলেমেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে; ছেলেরা সব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে—সকলেই সুশিক্ষিত—সুশীল। আমার কত সুখ। কিন্তু কাজ শেষ হইয়া গেলে আর থাকিয়া লাভ কি, দিদি? এখন যে কয়দিন থাকিব—উহাদের সুখ দেখিয়া সুখী হইব। যাইতে দুঃখ নাই।" পিসীমা বলিলেন, "কেবল আমারই মরণ নাই।" কাকাবাবু বুঝাইলেন,—"তুমিও কি চিরদিন থাকিবে? তবে যে কয়দিন যে আছি—কাজ করিয়া যাইব।"

বধূরাও কাকাবাবুর কাছে যাইয়া বসিতেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতাম, বিলোলা সর্ব্বদা যাইত না। লক্ষ্য করিয়া আমি তাহার উপর বিরক্ত হইতাম। কিন্তু আমি বুঝিতাম না যে, দোষ আমার। আমার ব্যবহারে তাহার হৃদয় বেদনায় তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যখন তাহার তরুণ হৃদয়ের সব আশায় হতাশ হইয়া আমার উপরই বিরক্ত হইয়াছিল—তখন আমার স্বজনের প্রতি তাহার স্নেহ বর্দ্ধিত হইবে কিরূপে? তাই কাকাবাবুর স্নেহও তাহার হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব সংস্থাপিত করিতে পারিত না।

কাকাবাবুও বিলোলার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া এক এক দিন তাহাকে ডাকিয়া আনাইতেন; বলিতেন, "মা, আমার কাছে আজও তোমার লজ্জা গেল না? আমি মেয়েতে বধূতে প্রভেদ দেখিতে জানি

না—মনে করি, আমার পাঁচটি মেয়ে। তুমি লজ্জা করিও না। তুমি দাদার আদর পাও নাই—তাঁহার স্নেহ পাইলে বোধ হয় বুড়া ছেলেদের পর ভাবিতে পারিতে না।”

কিন্তু আমার পুত্র প্রসূন অন্যান্য ছেলেদেরই মত কাকাবাবুকে ভাল বাসিত—তাঁহার কাছে থাকিলে আর কাহাকেও চাহিত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাণ

এক বৎসর কাটিয়া গেল। কাকীমা'র বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন দিদির এক দেবর কাকাবাবুকে বলিলেন, "আপনার শরীর যে বড় খারাপ দেখাইতেছে!" কাকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আর কত দিন?"

পর দিন প্রভাতে পূর্ণেন্দু আসিয়া আমাকে বলিল, "ছোট কাকা, ছোট দাদা আপনাকে চা করিতে বলিলেন। তাঁহার চা ঘরে পাঠাইয়া দিওন।" দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" সে উত্তর দিল, "তাঁহার অসুখ বোধ হইতেছে।" আমাদের বাড়ীতে সকালে চা'র পর্ব্ব একটা প্রকাণ্ড পারিবারিক সম্মিলন ছিল। তখন ছেলে বুড়া সব একত্র হইতেন। প্রাপ্ত-বয়স্কগণ চা পান করিতেন,—ছেলেরা খাবার খাইত; সকলে কথাবার্ত্তা হইত। সেই সম্মিলন দেখিতে বাবা ও কাকাবাবু বড় ভালবাসিতেন,—পিসীমাও আসিয়া দাঁড়াইতেন,—মাও সময় সময় একবার আসিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেন না। কাকাবাবুই সে সম্মিলনে সরসতা সঞ্চার করিতেন। তাঁহার ঠাট্টা বিদ্রূপে হাসিতে গল্পে সকলেই হাসিত। মেজদাদা চা পান করিতেন না; তিনিও একবার ঘুরিয়া যাইতেন। চা করিবার ভার কাকাবাবুর ছিল। কবে তিনি প্রথম সে ভার পাইয়াছিলেন, সে কথা আমরা

জানি না। আমরা ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার করা চা পান করিয়া আসিয়াছি। কাকাবাবু চা না করিলে বাবার পছন্দ হইত না। কোনও কারণে কোনও দিন কাকাবাবু চা না করিতে পারিলে, বাবার চা পান করিয়া তৃপ্তি হইত না। দাদার ছেলেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "ছোট দাদার ভ্রাতৃস্নেহ দাদার কাছে চিনির অপেক্ষা মিষ্ট লাগে।" তিনি না থাকিলে আমাদেরও মনে হইত,—সে দিন সম্মিলনই হয় নাই।

আজ কাকাবাবু আসিবেন না শুনিয়া দাদার ছেলেদের চা করিতে বলিয়া আমরা কয় ভ্রাতা তাঁহার ঘরে চলিলাম। যাইয়া দেখিলাম, তিনি ঘর হইতে যাইয়া বারান্দায় আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ বিবর্ণ। এক রাত্রিতে যে মানুষের এত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পূর্ব্বে মনে করিতে পারি নাই। দাদা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকাবাবু, অসুখ করিতেছে?" তিনি উত্তর করিলেন, "শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না।" কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিলাম, কথা কহিবার সময় তিনি শ্বাসকষ্ট বোধ করিতেছিলেন। দাদা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার এক শ্যালক বড় ডাক্তার। তিনি ঘরের গাড়ী যুড়িয়া তাঁহার বাড়ী লইয়া যাইতে বলিয়া একখানা ভাড়া গাড়ী লইয়াই তাঁহার গৃহে গমন করিলেন।

ডাক্তার আসিয়া কাকাবাবুকে দেখিলেন। কাকাবাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "কেমন,—আর কয়দিন মেয়াদ?" ডাক্তার বলিলেন, "মেয়াদ অনেক দিন।" তিনি বলিলেন, "না, বাবা। মেয়াদের মালিক তত নির্দ্দয় হইবেন না।" ডাক্তার তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন, উইল করিবেন ?" কাকাবাবুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমরা চারি ভ্রাতা ও দুই ভগিনী তাঁহার শয্যাপার্শ্বেই ছিলাম। তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন "কি উইল করিব ? সম্পত্তির মধ্যে এই ছয়টি যে দুইটি দান করিবার, সে দুইটি পূর্ব্বেই দান করিয়াছি। এ ত উইল করিবার নহে।"

বাহিরে আসিয়াই দাদা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলে ?" ডাক্তারের উত্তর শুনিয়া দাদা থমকিয়া দাঁড়াইলেন; বারান্দার রেলিং না ধরিলে তিনি বোধ হয় পড়িয়া যাইতেন। ডাক্তার বলিলেন, "রোগ চিকিৎসার অতীত। উনি আপনাকে হত্যা করিয়াছেন। বোধ হয়, পক্ষ কালের অধিক সময় পাওয়া যাইবে না।"

আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ঔষধ, পথ্য, শুশ্রূষা, কিছুরই ক্রটী হইল না। কিন্তু জীবনীশক্তি যেন দ্রুত তাঁহার দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। আমরা সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিতাম। এক দিন তিনি দাদাকে বলিলেন, "দেখ, দাদা তোদের কোনও কষ্ট দেন নাই। আর আমি কত কষ্ট দিতেছি!" দাদা বলিলেন, "বোধ হয় বাবার অপেক্ষাও আপনি আমাদের অধিক ভালবাসেন,—তাই আমাদিগকে আপনার শুশ্রূষা করিবার অবসর দিলেন।" কাকাবাবু বলিলেন, "তোরা আর কয় দিন দাদার স্নেহ ভোগ কর্‌লি ?" আমি জন্মাবধি সেই স্নেহ পাইয়াছি! সে স্নেহের তুলনা নাই, তাহাতে জীবন মধুময় হয়। দাদার মুখে কোন দিন একটা তিরস্কারের কথা শুনিতে পাই নাই।"

তিনি বোধ হয় অতীত কথাই ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে

আবার বলিলেন, "বাল্যকাল হইতেই দাদা আপনার জন্য কোনও জিনিষ কিনিলে আমি যদি তাহার প্রশংসা করিতাম, তবে যতক্ষণ আমি সে জিনিষ না লইতাম, ততক্ষণ দাদা যেন শান্তি পাইতেন না। আর দাদার এই ভাব দেখিয়া জ্যেঠামহাশয় কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন।" তিনি আবার বলিলেন, "যৌবনে দাদার ঠিক জ্যেঠামহাশয়ের মত চেহারা ছিল। বাবার মৃত্যুর পর হইতেই জ্যেঠামহাশয়ের শরীরের সে লাবণ্য নষ্ট হইয়াছিল,—দিদির বৈধব্য ও বড়দাদার মৃত্যু তাঁহাকে বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।"—কিছুক্ষণ পরে তিনি সেজদাদাকে বলিলেন, "বিভাষ, বৈঠকখানার ঘরে দাদার অল্প বয়সের যে ছবিখানা আছে, সে-খানা এ ঘরে টাঙ্গাইয়া দে।" আমরা সেই চিত্র আনিয়া কাকাবাবুর ঘরে টাঙ্গাইয়া দিলাম। দেখিয়া কাকাবাবু হাসিলেন—বলিলেন, 'দাদার ইহার অপেক্ষাও কম বয়সের ছবি ছিল। দেশ হইতে আসি-বার সময় সেখানা হারাইয়া যায়। এক জন জয়পুরী শিল্পী সেখানা আঁকিয়াছিল। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা ছবিকে কি বলিতাম জানিস্?—তসবির! তখনও মুসলমানী আমালের অনেক চিহ্ন দেশে ছিল। বাবা মৌলবীর কাছে ফার্সী পড়িয়াছিলেন,—শেষে অধিক বয়সে কাজ চালাইবার মত ইংরাজী শিখেন। তখনও লোক ঢাকাকে জাহাঙ্গীরনগর বলিত। এক জীবনে আমরা কত পরিবর্ত্তনই দেখিলাম!"

আর এক দিন তিনি আমাকে বলিলেন, "বিকাশ, তুই সেবার গ্রামে গিয়াছিলি। বাড়ীটা কি এখনও আছে বোধ হয়?" দাদা বলিলেন, "আছে—আমরা যাইব বলিয়া সেবার যেরূপ সারান হয়, তাহাতে

কিছুদিন থাকিবে।” তিনি বলিলেন, “বাড়ীর দ্বিতলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘরটায় দাদা ও আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ঘরটার দুইটা দ্বার, আর এক-দুই-তিন-চারি-পাঁচ, পাঁচটা জানালা আছে। বাড়ীটা আর কোনও কাজেই লাগিল না! কিন্তু ঐ বাড়ীটার সঙ্গে আমাদের কত দিনের কত স্মৃতিই জড়িত!”

তিনি দাদাকে এক দিন বলিলেন, “আভাস, সংসারের কোনও কথা যদি কিছু জানিবার থাকে, তবে এই সময় জানিয়া নে।” দাদা বলিলেন, “আপনি কেন ও কথা বলিতেছেন। আপনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিলেন।” কাকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, “মরিতে যাহাদের ইচ্ছা নাই, তাহাদিগকে ভুলাইতে হয়, আশা দিতে হয়; মৃত্যু যাহাদের পক্ষে মুক্তি, তাহাদিগকে ভুলাইয়া ফল কি, বাবা?” তাহার পর তিনি বলিলেন, “আমার আর কিছু বলিবার নাই, বলিবার আছে কেবল দিদির ও বড় বৌর কথা। দিদির দুর্ভাগ্যের কথা যথাসম্ভব ভুলাইবার জন্য জেঠামহাশয় সংসারের সব কর্ত্তৃত্ব তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তোরা জানিস না, জ্যেঠামহাশয় বড় ‘রাশভারী’ লোক ছিলেন; দাদারা তাঁহাকে কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেন না, আমি তাঁহার আদরের ছিলাম—আমি তাঁহাদের অপেক্ষা সাহস করিতাম। কিন্তু দিদি যাহা বলিতেন, তিনি তাহাই শুনিতেন—আমাদের সব সুপারিস দিদি করিতেন। দেখিস্, কোনরূপে দিদি যেন মনে না করেন—তাঁহার সে কর্ত্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইল। এ বিষয়ে তোর মা’র সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিস্। আর বড়বৌ; উঁহার কেহ নাই, উনি তোদের লইয়াই সংসারে জড়াইয়া আছেন! কোনরূপে যেন উঁহার কোনও ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কেহ দ্বিধা না করে।”

দেখিতে লাগিলাম, দাদা সংসারের কর্তার দায়িত্বভারের কথা ভাবিয়া ক্রমেই শঙ্কিত ও অবসন্ন হইতে লাগিলেন। যে গাছ ছায়ায় থাকিয়া—নিত্য সলিলসেচনে পুষ্ট হইয়া কুসুমে শোভিত হয়, সে সহসা মুক্ত স্থানে আসিলে রবিকরে ও ঝটিকায়, করকাপাতে ও শীতবাতে যেমন হয়, দাদারও তেমনই হইতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, তিনি কেমন করিয়া কাকাবাবুর মত সংসার সুচারুরূপে চালাইবেন?

পিসীমা যখন হইতে কাকাবাবুর অবস্থার কথা বুঝিতে পারিলেন, তখন হইতে যেন বজ্রাহতা হইলেন। আমরা তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া নানা আশা দিয়া তবে কাজে রত রাখিতে পারিলাম। কিন্তু সেও কেবল কাকাবাবুর শুশ্রূষার কাজ। অন্য কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না—কেবলই বলিতেন, "আমারই মরণ নাই! আমি সর্ব্বনাশী সব নষ্ট করিবার জন্যই আসিয়াছি।" তিনি কাঁদিতেন, আর চক্ষুর জল মুছিয়া কাকাবাবুর শুশ্রূষায়—কাকাবাবুর কাজে প্রবৃত্ত হইতেন।

মানসিক অবসাদের আধিক্যে কাকাবাবুর দৈহিক অবসাদও বাড়িতে লাগিল। ক্রমেই দিন শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। ডাক্তার দেখিয়া আমাদিগকে বলিয়া যাইলেন, "সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও—এখন সপ্তাহ নাই—দিন—ঘণ্টা। যখন তখন দুর্ব্বল হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।" হায় চিকিৎসক! প্রস্তুত হইতে বলা যত সহজ, প্রস্তুত হওয়া যদি তত সহজ হইত! যাঁহার স্নেহ শোকে সান্ত্বনা—জীবনে সুখ, তাঁহাকে হারাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তবু আমরা প্রস্তুতই ছিলাম—কাকীমা'র মৃত্যুর সময় হইতেই বুঝিয়াছিলাম, এ দুর্দ্দিন অধিক বিলম্বিত হইবে না—কাকাবাবুর পক্ষে জীবন কেবল দিন-গণনায়

পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছিলাম কই? মন যে প্রবোধ মানিতে চাহে না।

কেবল মেজদাদা স্থির ছিলেন। তাঁহার অন্তরস্থিত যন্ত্রণার বাহ্য বিকাশ ছিল না। তিনি স্থিরভাবে কাকাবাবুর শুশ্রূষা করিতেছিলেন। আমরা অস্থির হইলে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া স্থির করিতেছিলেন; দিদিকে ও অপর্ণা দেখিতেছিলেন; কখনও যাহা করেন নাই, তাহাও করিতেছিলেন—ছেলেদের খবরও লইতেছিলেন, মা'কে ও জ্যেঠাই-মা'কে তাহাদিগকে দেখিতে বলিতেছিলেন।

দিদি ও সেজদাদা স্বভাবতঃ একটু গম্ভীর। তাঁহাদের হৃদয়ের অস্থিরতা ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছিল না। উভয়েই এ সৌভাগ্য-সম্ভোগ আর ঘটিবে না মনে করিয়া অক্লান্তভাবে পিতার সেবা করিতেছিলেন।

উদ্যানপ্রহ্লাদিনী স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী রবিকরে প্রদীপ্ত বীচি-মালায় যেমন উদ্যানে সৌন্দর্য্যসঞ্চার করে, অপর্ণা তেমনই তাহার সদা-প্রফুল্লভাবে সংসারে আনন্দালোক বিকীর্ণ করিত—সে যে স্থানে যাইত, তথায় আনন্দালোক লইয়া যাইত। কিন্তু সে আজ মেঘাচ্ছন্ন দিবায় অন্ধকারবারি নদীর মত বিষন্ন হইয়াছিল। যাহার মুখ কখনও অন্ধকার দেখা যাইত না—তাহার মুখে বিষণ্ণ ভাব দেখিলে অকালজলদোদয়ে নিবারিতরবিকর সঙ্কুচিত নলিনীর মত মনে হয়; দেখিলে দুঃখ হয়।

সে দিন আমি কাকাবাবুর জন্য কয়টি জিনিষ কিনিতে গিয়াছিলাম। হয় ত তাঁহার জন্য কোনও কাজ করিবার সুযোগ আর পাইব না বলিয়া সরকারকে না পাঠাইয়া আপনি গিয়াছিলাম। বাছিয়া বাছিয়া জিনিষ

কিনিয়াছিলাম। বহুক্ষণ ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিলাম। যখন আমার গাড়ী গৃহদ্বারে আসিল, তখন দেখিলাম, আর একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

নামিয়া জিনিষগুলা চাকরকে দিয়া বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলাম। আমি একবার কাকাবাবুকে দেখিয়া হাত মুখ ধুইতে যাইব। কিন্তু মনে হইল, জিনিষগুলার কথা একবার পিসীমা বা জ্যেঠাইমা যাঁহাকে হয় বলিয়া যাইব। সেই জন্য ভৃত্যের পশ্চাতে আমিও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। জ্যেঠাইমা'কে পাইয়া তাঁহাকে সব বলিয়া ফুলের চুবড়ীটা লইয়া আমি উপরে চলিলাম।

সিঁড়ির উপরে উঠিয়া দেখিলাম, বিলোলা প্রসূনকে কোলে লইয়া নামিবার উদ্যোগ করিতেছে। প্রসূন আমাকে দেখিয়াই বলিল, "বাবা, আমি যাব না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাইবে?" বিলোলা উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে।" প্রসূন বলিল, "আমি দাদু—কাছে—যা—বো।" আমি বিলোলাকে বলিলাম, "তুমি কাকাবাবুর কাছে যাও নাই?" বিলোলা সে কথার উত্তর না দিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" আমি বলিলাম, "এখন তাঁহার কাছে থাকাই কর্ত্তব্য।" যেন বারুদের স্তূপে অগ্নিযোগ হইল,—সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ফারিতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কর্ত্তব্য? আমি এ বাড়ীর কে যে, এ বাড়ীর সম্বন্ধে আমার কোন কর্ত্তব্য আছে? আর তুমি—তুমি আমাকে কর্ত্তব্য শিখাইতে আসিয়াছ! তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমার করে।" আমি বলিলাম, "কেন?" বিলোলার মুখ তখন রক্তবর্ণ হইয়াছে, সে বলিল, "তোমার সঙ্গে সে বিষয়ে তর্কে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

আমার মনে হইতে লাগিল, আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ফুলের চুবড়ী আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমি জামার গলার বোতাম খুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; তাহার পর পুত্রকে লইয়া বক্ষে চাপিয়া চলিয়া যাইলাম। বিলোলার মুখ নিদাঘ-দিনান্তের ঝটিকাতাড়িত আকাশের মত বোধ হইল। সে নামিয়া গেল! সিঁড়ির পরের ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমি দেখিলাম,—সম্মুখে পিসীমা। তিনি কি সব দেখিয়াছেন?

আমি কাকাবাবুর ঘরে প্রবেশ করিলাম। প্রসূন তাঁহাকে দেখিয়া ডাকিল,—"দাদ্দু!" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি, দাদ্দু?" আমার ক্রোড় হইতে নামিয়া সে কাকাবাবুর কাছে গেল,—দিদি কাকাবাবুর পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদে হস্ত বুলাইতেছিলেন, তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া সেও হাত বুলাইতে লাগিল। কাকাবাবু হাসিয়া মা'কে তাহা দেখাইলেন।

আমি আমার ঘরে যাইয়া বসিলাম। আমার হৃদয় হইতে যেন বহ্নিজ্বালা সমগ্র শরীরে বিস্তৃত হইতেছিল। আমার মনে হইতেছিল, আমি সম্মুখে যাহা পাইব, তাহাই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া আপনাকে হত্যা করিয়া তবে শান্ত হইতে পারিব,—নহিলে নহে। উন্মাদ অস্থিরতা আমাকে ধ্বংসে উত্তেজিত করিতেছিল। সে অবস্থায় আমার পক্ষে কোনও কাজ করাই অসম্ভব ছিল না। আমি আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারিতাম। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, আমি ছুটিয়া বাহির হইয়া যাই,—আপনার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া এ জ্বালার নির্ব্বাণ করি। যদি দারুণ শোকের আঘাতে আমার হৃদয় অবসন্ন না হইত,

তবে কি হইত তাহা আমিও বলিতে পারি না। আমার পক্ষে তখন সংসার বিষময়,—জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

মেজদাদা আসিয়া আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলে আমি চমকিয়া উঠিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। মেজদাদা বোধ হয় আমাকে না দেখিতে পাইয়া আমাকে খুঁজিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "বিকাশ, এমন অধীর হইও না! অধীর হইয়া ফল কি? চল, কাকাবাবুর কাছে বসিবে? আর ত বসিবার অবসর পাইবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার কি কিছু বলিলেন?" তিনি বলিলেন, "ডাক্তার আজ থাকিবেন,—কাল আর থাকিতে হইবে না।" মেজদাদার কণ্ঠস্বরও কম্পিত হইল।

আমি যাইয়া কাকাবাবুর কাছে বসিলাম। যখন উঠিয়াছিলাম,—তখন তাঁহার ধরাদগ্ধ হৃদয় চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিলোলা অল্পক্ষণ পরেই কাকাবাবুর কাছে আসিয়াছিল। সে মৃত্যু-শয্যাশায়ী কাকাবাবুর শেষ আশীর্ব্বাদ মস্তক পাতিয়া লাভ করিয়াছিল। সেই আশীর্ব্বাদ তাহাকে শান্তিদান করুক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কি করি?

ভাল লাগে না,—কিছুই ভাল লাগে না। কাকাবাবুর মৃত্যুতে গৃহে যে বিরাট শূন্যতা অনুভূত হইতে লাগিল, তাহাতে যেন হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তিনি আমাদের হৃদয়ে ও সংসারে কতখানি স্থান জুড়িয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার অভাবের পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। যাঁহাকে কোনও দিন অধীর হইতে দেখি নাই, তাঁহার ধৈর্য্যও বিচলিত হইল। কাকাবাবুর মৃত্যুর পর প্রথম দিন হবিষ্যান্ন আহারে বসিয়া মেজদাদা খাইতে পারিলেন না। বিপত্নীক হইয়া মেজদাদা হিন্দুর ঘরের বিবধারই মত একাহারী—নিরামিষাশী হইয়াছিলেন। আমরা সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া কেহ বিদ্যালয়ে, কেহ আফিসে, কেহ আদালতে চলিয়া যাইতাম; কাকাবাবু অপেক্ষা করিতেন। পিসীমা'র ও জ্যেঠাইমা'র সব রন্ধন শেষ হইলে তিনি মেজদাদাকে লইয়া আহারে বসিতেন—রাত্রিতে আমরা সকলে এক সঙ্গে আহারে বসিতাম; মেজদাদা সামান্য ফলাদি আহার করিতেন, তাঁহার স্থান কাকাবাবুর আসনের পার্শ্বেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাকাবাবু বড় কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতেন না—যাইলেও খাইতেন না; পুত্রাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র মেজদাদাকে পার্শ্বে বসাইয়া না খাওয়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। আজ তিনি কোথায়? বোধ হয়, সেই স্মৃতি আজ মেজদাদার অটল ধৈর্য্যও

বিচলিত করিল। তিনি খাইতে পারিলেন না—দুই একবার ভাত নাড়িয়া চাড়িয়া দাদাকে বলিয়া উঠিয়া গেলেন। পিসীমা বলিলেন, "ও কি, প্রভাস! ভাত যে মুখে দিলি না।" মেজদাদা তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন—যাইতে যাইতে চক্ষু মুছিলেন। পিসীমা কাঁদিলেন—আমরাও স্থির থাকিতে পারিলাম না।

কাকাবাবুর শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। আত্মস্থ মেজদাদা আবার অধ্যয়ন ও চিন্তা লইয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন; দাদা ও সেজদাদা আফিসের কাজে মন দিলেন। সংসারের কাজ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। কেবল সংসারের শূন্য পূর্ণ হইল না, আর আমার হৃদয় শান্ত হইল না। কাকাবাবুর মৃত্যুদিন আমার হৃদয়ে যে বহ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইল না—আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সকলেরই কাজ আছে—কেবল আমার কাজ নাই, কাজে মন নাই। আমার আছে কেবল চিন্তা—দুশ্চিন্তা। কোন্ ত্রুটীর—কোন্ অপরাধের জন্য আমার এ যন্ত্রণা—এ অপমান? আমার অপরাধ—আমি আমার তরুণ হৃদয়ের অনাবিল, অসীম প্রেম অযাচিতভাবে আমার পত্নীকে দিয়াছি। এই কি তাহার ফল? আমারই অভিজ্ঞতায় আমি কত অপরাধী স্বামীর প্রতি পত্নীর প্রগাঢ় প্রেম দেখিয়াছি—বিচারবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর উপর স্ত্রীর নির্ভরশীলতা দেখিয়াছি; স্বামীর ত্রুটী ভুলিয়া ভালবাসিতে, স্বামীকে দেবতার আসনে বসাইয়া দেবতার প্রাপ্য পূজাই দিতে দেখিয়াছি;—যাঁহারা স্বামীকে ইহকাল-পরকাল-সর্ব্বস্ব মনে করিয়া স্বামীর সত্তায় আপনার সত্তা মিশাইয়া স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া পরলোকেও স্বামিসঙ্গলাভের আশা ব্যক্ত করিতেন, তাঁহাদেরই আদর্শের

অনুকরণ করিতে দেখিয়াছি। আর আমার ভাগ্যে এ কি ঘটিল? আমি প্রেম দিয়াই অপরাধী হইয়াছি—প্রেম দিয়াই নির্য্যাতিত!

আমার প্রেমের দুর্ব্বলতা তখন আমার নিকট প্রতিভাত হয় নাই। আমি প্রেমের প্রতিদান—প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া ভালবাসিতে পারি নাই, তাই আমার দুঃখ। তখন সেই পরিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যাহা বুঝিতে পারি নাই, এখন তাহা বুঝিয়াছি। তাই আজ অভিমানের দংশন-যন্ত্রণা-মুক্ত হইয়াছি। আরও কত কথা তখন বুঝি নাই—বুঝিতে পারি নাই। সংসারে নিক্তি ধরিয়া ওজন করিয়া অধিকার-ভোগ হয় না। মানুষ ভ্রম করিয়া থাকে। আমি যেমন ভ্রম করিয়াছিলাম, বিলোলাও তেমনই ভুল বুঝিয়াছিল। সেই ভ্রমে সে যে যাতনা পাইতেছিল, তাহাই আপনার বেগে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেদিন আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল; বিলোলা তাহার বেগ সংহত বা সংযত করিতে পারে নাই। বেদনা—যাতনা কেবল আমারই নহে। তাহার কাছে আমি যেমন অসম্ভবের আশা করিয়া হতাশ হইয়াছিলাম, সে-ও তেমনই আমার কাছে অসম্ভবের আশা করিয়া হতাশ হইয়াছিল। আমারই ব্যবহারে আমরাই প্রদত্ত শিক্ষায় তাহার সে আশা সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া থাকিবে। আমি তাহাকে যে আদর্শ দিয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার অভিমানের—বেদনার কারণ আমার প্রতি প্রবল প্রেম। সংসারে বাস করিয়া সুখী হইতে হইলে লোকের ভ্রম ক্ষমা করিতে হয়—ত্রুটী উপেক্ষা করিতে হয়—স্নেহের প্রলেপে আঘাতের বেদনা দূর করিতে হয়। নহিলে কেবলই দুঃখ। বাবার ও কাকাবাবুর জীবনে সুখের কথা সে দিন মনে

করিয়া আপনাকে দুঃখী ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা কিরূপ উদার অবারিত স্নেহে সে সুখের শান্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। তখন যদি তাহা ভাবিতে পারিতাম, তবে জীবনের গতিই পরিবর্ত্তিত হইত; তবে আলয়হীন—আশ্রয়হীন হইয়া কক্ষ্যচ্যুত, লক্ষ্যহীন উল্কার মত আপনার বহ্নিদাহে আপনি দগ্ধ হইয়া ফিরিতাম না; তবে হয় ত এ জীবনে কাহারও কোনও কাজে লাগিতে পারিতাম—কাহারও না কাহারও কোনও উপকার করিয়া ধন্য হইতে পারিতাম। তাহা হয় নাই, যে মানব-জীবনে লোক স্বার্থ ও পরার্থ সিদ্ধি করিয়া কালজয়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যায়, সেই মানবজীবন বৃথা নষ্ট করিলাম—কাহারও কোনও কাজে লাগিলাম না, আপনারও কোন উপকার করিতে পারিলাম না।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—মানব জীবনে এই সকলেরই সিদ্ধি কামনা করে। আমি কি করিয়াছি? অর্থ সাধনার বস্তু; কারণ, তাহা সুপ্রযুক্ত হইলে জীবের অশেষ কল্যাণের কারণ হয়। আমি তাহার সাধনা করি নাই; পরন্তু যে অর্থ আমার ছিল তাহা আমার সর্ব্বস্বত্যাগের সঙ্গেই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। ধর্ম্মের সাধনা আমি ধর্ম্মের জন্য করি নাই—করিতে পারি নাই; করিয়াছিলাম বিস্মৃতিলাভের দুরাশায়। তাই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। যে ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মের সাধনা করিতে পারে না, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না; সে মোক্ষলাভ করিবে কিরূপে? আমার এ জীবনে মানবের কাম্য কোনও কামনাই পূর্ণ হয় নাই। তাই আমি ব্যর্থ বাসনার বিষম বেদনা বহন করিয়া নিষ্ফল জীবন যাপন করিলাম।

কেবল কি আমারই জীবন ব্যর্থ হইয়াছে? আমার জন্য কি আর কাহারও জীবনও ব্যর্থ করি নাই? আর কাহারও মুকুলিত আশা ও আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিয়া আসি নাই? তবু তাহার এক সান্ত্বনা আছে; আমার তাহাও নাই। আমি পিতা হইয়া পুত্রকে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমি পুত্রের প্রতি—পত্নীর প্রতি—ভ্রাতার প্রতি—ভগিনীর প্রতি—জননীর প্রতি সব কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছি। কেবল ভ্রান্তিবশে। আমার জীবনে সকল শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। আমি আপনার কাজে সংসারে আমার অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

এই সময় যখন আমি কাজের অভাবে কেবল চিন্তাতেই ব্যথা পাইতেছিলাম তখন আমার – কেবল আমার কেন, দেশের, সব লোকের একটা কাজ জুটিল—দেশে স্বদেশী আন্দোলন আরব্ধ হইল। বাঙ্গালা দেশ যেন সহসা জড়ত্ব-শাপ-মুক্ত হইয়া জীবন-চাঞ্চল্য অনুভব করিল। বাঙ্গালী বিস্মিত হইল—তাহারই মধ্যে এত আশা—এত আকাঙ্ক্ষা—এত কর্ম্মের জন্য আগ্রহ কোথায় ছিল? আমার মনে হয়, বঙ্গভঙ্গ একটা উপলক্ষমাত্র—বিদেশীবর্জ্জন আগ্রহের আতিশয্যপরিচায়ক; প্রকৃত কথা, দেশের সব লোক দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করিতেছিল, দুঃখ দূর করিবার উপায় পাইতেছিল না। যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক, সেই সম্প্রদায়েই দুঃখ অধিক হইয়াছিল! সেই সম্প্রদায়ই শিক্ষার ফলে মনে করিল, এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত কেবল কৃষিকার্য্যে ও চাকরীতে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না। বঙ্গভঙ্গ লইয়া যখন একটা রাজনীতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তখন তাহারা তাহাদের সেই মত ব্যক্ত করিল; লোক বঙ্গভঙ্গের কথাটা শুনুক

আর নাই শুনুক, দারিদ্র্যদুঃখনিবারণের উপায়ের কথাটা শুনিল; কেন না, সে দুঃখ তাহারাই ভোগ করিতেছিল। তাই এ দেশে কোনও আন্দোলনে যাহা হয় নাই, এবার তাহাই হইল—দেশের সব লোক এই আন্দোলনে যোগ দিল; সপ্তকোটী কণ্ঠে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হইল। ইহাতে বিরাগ—বিরোধ—বিদ্বেষ ছিল না—রাজনীতিও ছিল না। আর আমার মনে হয়, যদি আমার মত 'অকেজো' লোক কাজের অভাবে—উদ্দেশ্য না বুঝিয়া—সঙ্কল্প না করিয়া কেবল উত্তেজনার মদিরা-পান-মত্ততায় সে আন্দোলনের নায়ক না সাজিত, কেবল বক্তৃতা করিয়া ও স্বদেশী 'মন্ত্র' পড়াইয়া খ্যাতি-অর্জ্জনের চেষ্টা না করিত, তবে সে আন্দোলনে অনেক অধিক সুফল ফলিত। আমার সমব্যবসায়ী অনেকে সেই আন্দোলনে যোগ দিলেন, কেহ তাহার উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট হইয়া, কেহ সময় কাটাইবার জন্য, কেহ বা নামটা মুখর সংবাদপত্রের মুখে বাহির হইলে ব্যবসায়ে সুবিধা হইবে, এই আশায়।

আমার অবসরের অন্ত ছিল না—অবসর লইয়া কি করিব, কোন্ কাজে দুশ্চিন্তা ভুলিব, তাহাই ভাবিতেছিলাম। আমিও সেই দলে মিশিলাম। পাঁচ জন উকীল ব্যারিষ্টার সভায় যাইতেছেন—আমিও যাইতাম। প্রথমে অবশ্য শ্রোতৃরূপে আসর শোভা করিতাম, তাহার পর কবে যে কেমন করিয়া শ্রোতা হইতে আমার বক্তায় পরিণতি হইল, তাহা ঠিক মনে নাই। বোধ হয়, কোনও সভায় বক্তার কিছু অভাবেই আমাকে বক্তা করা হইয়াছিল। সে সব সভায় বক্তা হওয়াও দুঃসাধ্য ছিল না—শ্রোতারা সভা করিবার আগ্রহে বক্তার গুণ বিচার

করিত না, যেমন হউক বক্তা লইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সভা করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিত। একবার বক্তৃতা করিবার পর আর নীরব থাকা অসম্ভব হইল; আজ এখানে, কাল সেখানে, আজ এ মাঠে, কাল ও পুকুর-পাড়ে সভার বিজ্ঞাপনে বক্তৃগণের মধ্যে আমার নাম আমার বিনানুমতিতেই প্রচারিত হইতে লাগিল। "না"—বলিবার উপায় নাই; তাহা হইলে অপ্রীতি অর্জ্জন করিতে হয়। বক্তৃতা করিতেও কষ্ট নাই। সুতরাং অচিরে আমি বক্তা হইয়া উঠিলাম—'নিষ্কর্ম্মা' আমার একটা কাজ জুটিল।

প্রতিদিনই প্রায় আমি কোনও না কোনও সভায় বক্তৃতা করিতাম, আর পরদিন সকালে চা'র মজলিসে সংবাদপত্রে সেই সভার বিবরণ পড়িতে পড়িতে দাদা বা মেজদাদা বলিতেন, "এই যে, বিকাশ, কালও বক্তৃতা করিয়াছিস?"

রহস্যপ্রিয়া অপর্ণা আসিলেই বলিত, "দোহাই ছোড়দাদা, আমি কায়মনোবাক্যে তোমাদের মন্ত্র সাধন করিব—কাচের চূড়ী পরিব না—বিদেশী কাপড় পরিব না—বলত তোমার ভগিনীপতির কোটে স্বদেশী দিয়াশলাই জ্বালিয়া দিব—তুমি এক দিন বাড়ীতে আমাদের একটা বক্তৃতা শুনাও। প্রদীপের গোড়ায় আঁধার রাখা কি ভাল? দেশের লোককে তুমি যে শিক্ষা দিতেছ, তোমার মা, ভগিনী সে শিক্ষা পাইবে না?" শেষে সে বলিত, "ভাল, যদি মেয়ে প্রচারকই নিযুক্ত করিতে হয়—বিলোলাকে শিখাইয়া লও। একটা নূতন কিছু কর।" আর অনুকূলও ঠাট্টা করিতে ছাড়িত না। সে বলিত, "দেশটাকে কি এমনই করিয়া ডুবাইতে হয়?

'দেশের' বাড়ী সাপ বাঘকে ছাড়িয়া দিয়া বিদেশীর হাতে গড়া সহরে বাস করিয়া বিদেশী কোম্পানীর গাড়ীতে বিদেশী ওয়েলার ঘোড়া জুতিয়া—বিদেশী আলপাকার চোগাচাপকান পরিয়া সভায় যাইয়া বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া—বিদেশী ভাষায় তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া স্বদেশী নেতা সাজা, এ ত সং দেওয়া। ধূলা লইয়া কি এমন করিয়াই আবীর খেলিতে হয়?" অনুকূলের সঙ্গে যে পারিতাম, এমন নহে। বিশেষ আমি—আমি ত কেবল দুশ্চিন্তা-দাবদাহ নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই বক্তা সাজিয়াছি। অনুকূল শেষ জবাব দিত, "কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া জলে বাস করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। তোমার ভগিনীটিকে ধনপ্রাণ সবের মালিক করিয়া তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারি না। তবে আমার কথা কি জান?—যদি ব্যবসার সুবিধা হয়, রোজ এক গণ্ডা বক্তৃতা কর; আর যদি তাহা না হয়, তবে বৃথা সময়ের ও শক্তির অপব্যয় না করিয়া আদালত হইতে সটান বাড়ী আসিয়া জলযোগান্তে নিবিষ্টচিত্তে দাম্পত্যসুখ ভোগ কর। জাইন ত,—

'হেসে নাও, দু'দিন বই ত নয়;
কে জানে, কা'র যে কখন্ সন্ধ্যা হয়।'

(ঐ দেখ 'ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ' নবদ্বীপের রাজার দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পুত্র দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, তাঁহাকে দেশের লোক ডি, এল, রায় না বলিলে চিনে না—এমনই তোমরা 'স্বদেশী'!) সন্ধ্যা যখনই কেন হউক না সুখভোগের এই ত সময়। সংসারের ভার

বাহিরে দাদাদের—ভিতরে পিসীমা'র, জ্যেঠাইমা'র এমন—শুভ অবসর কি আর মিলিবে ?"

অনুকূলের কথায় আমার বেদনা-বহ্নিতে কেবল ইন্ধনযোগ হইত। সে আমার অত্যন্ত আপনার—পরম বন্ধু—সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা আপনার, সকল বন্ধুর অধিক, আমার মঙ্গলে যাহার মঙ্গল, তাহার ব্যবহারে আমার বেদনা আমি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারি না বলিয়াই ত সে বেদনার আতিশয্য। যিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—বুঝিয়া সে বহ্নি নিবাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সে চেষ্টা ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছিলেন। যে সময় যুবক গৃহেই সুখের সন্ধান করে এবং পায় সেই সময়েই কেন যে আমি বাহিরের কাজে আপনাকে ব্যাপৃত রাখি, অনুকূল তাহা বুঝিতে পারিত না। তাহার অপরাধ কি ? সে ত জীবনে আমার মত দুর্ভাগ্যযাতনা ভোগ করে নাই। মানুষ যে অবস্থায় আপনি পতিত না হয়, সে অবস্থাও অনেক সময় তাহার কল্পনার অতীতই থাকিয়া যায়। আশা করি, আমার অবস্থা অনুকূলের, কেবল তাহা নহে, আমার সকল প্রিয়জনেরই কল্পনার অতীত আছে। আমার পরিচিত অপরিচিত কাহাকেও যেন সে অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না হয়। আমি জীবনে কাহারও শত্রুতা করি নাই। কিন্তু যদি আমার কোনও শত্রু থাকে, তবে সেও যেন এ অবস্থায় পতিত না হয়। আর যাহার জন্য আমার যাতনা, সেই বিলোলা, সেও ত আমারই মত যাতনা ভোগ করিয়াছে। তাহার কথা আর কি বলিব ? তবে যাঁহাদের স্নিগ্ধ বক্ষে সে আশ্রয় পাইয়াছে, সেই সব স্বজনের

স্নেহে—আর পুত্রের ভালবাসায় তাহার হৃদয়-ক্ষত দূর হউক—সে শান্তি লাভ করুক।

কাজের অভাবে কাজ যোগাইয়া লইয়া আমি সময় কাটাইতে লাগিলাম—গৃহের বাহিরে আমার অনেক সময় কাটিতে লাগিল। দাদারা আমার সব কাজই ভাল দেখিতেন—কেহ কিছু বলিতেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অপরিচিতার পত্র

দেখিতে দেখিতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—খাঁটী 'স্বদেশী'তে' রাজনীতির খাদ মিশিল। এই যে রাজনীতি ইহা বিদেশী—নানারূপ। সুতরাং নানারূপ খাদে নানারূপ আদর্শ সৃষ্ট হইতে লাগিল। শেষে এমনই দাঁড়াইল যে, খাদে খাঁটী জিনিষটাই ঢাকা পড়িয়া গেল। দেশের লোক দারিদ্র্যদুঃখ হইতে মুক্তির আশায় একমত হইয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল; নেতারা স্ব স্ব স্বতন্ত্র রাজনীতিক আদর্শের জন্য দলাদলি করিতে লাগিলেন। দলের আবার উপদল সৃষ্ট হইতে লাগিল। নরমদল, গরমদল, মধ্যপন্থী, চরমপন্থী, রক্ষণশীলদল, জাতীয়দল—এমনই কত কথা সৃষ্ট ও চলিত হইতে লাগিল। গোলদীঘির এ পাড়ে এক দলের, ও পাড়ে আর এক দলের সভা প্রায় প্রতিদিন হইতে লাগিল—দলাদলির ফলে গালাগালি চলিতে লাগিল। সেই দলাদলির উত্তেজনায় আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়িতে লাগিল—লক্ষ্য হইতে লোকের মন অন্য দিকে যাইতে লাগিল। আন্দোলনে রাজনীতির প্রভাব যত বাড়িতে লাগিল, দ্রুত দুই দল লোক সরিতে লাগিল। এক দল—ধনী; তাঁহারা রাজনীতিচর্চ্চায় যোগ দেন না, অর্থনীতিসম্বন্ধীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। আর এক দল দেশের জনসাধারণ; তাহারাই সমাজের শক্তির উৎস;

তাহারা 'স্বদেশী' বুঝিয়াছিল—দেখিয়াছিল—তাহাতে দেশের তন্তুবায়, শঙ্খবণিক, কর্ম্মকার, ইহাদের কাজ বাড়িয়াছিল; কিন্তু তাহারা স্বায়ত্ত-শাসন, অটনমী—এ সব বুঝিল না। তাহার পর যাহা হইয়াছে, তাহা ইতিহাসের কথা—তাহার সঙ্গে আমার জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প। তবে আমি কাজের অভাবে এ কাজে যোগ দিয়াছিলাম—উদ্দেশ্যে উৎসাহবশতঃ কাজ করি নাই, যেটুকু উৎসাহ আমার হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়াছিল সেইটুকুই আমার সম্বল ছিল। সেই সামান্য সম্বল নিদাঘরৌদ্রে অগভীর পুষ্করিণীর জলের মত দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল—রহিল কেবল অবসাদের পঙ্ক। অনুকূল দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিত, "এখন কি করিতেছ—'স্বদেশ' না 'ভারত-উদ্ধার'? তবে যদি একটা বড় পদ পাও, তখন যেন ভগিনীপতিটিকে ভুলি না; চাকুরিয়া আমি, চাকরী পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিব। আমরা স্তন্যপায়ী—চাকরীপ্রাণজীব—

'ভূষী পেলেই খুসী হ'ব
ঘুঁসী খেলে বাঁচব না।'

তোমরা স্বাধীন ব্যবসার ব্যবসায়ী, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের গৃহে কিন্তু গৃহিণীর শাসন—স্বায়ত্ত-শাসন নাই। তোমরা বল, আত্মবশ হইলেই সুখ; আর পরবশ হইলেই দুঃখ। আমরা ঠিক উল্টা বলি। চাকরীর কাজ করিয়া যদি আবার সংসারের কাজ করিতে হইত, তবে আমি নিশ্চয় বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতাম। তবে তোমার ভগিনীটিকে লইয়া পলাইতাম কি না, ঠিক বলিতে পারি না। জামার বোতাম ছিঁড়িলে যদি নিজে লাগাইয়া লইতে হইত, ধোপাবাড়ী হইতে কাচা

কাপড় আসিলে যদি নিজে মিলাইয়া লইতে হইত, গয়লার দুধে জলের মাত্রা বাড়িলে যদি আমাকেই ঝগড়া করিতে হইত, তবে আমি বুদ্ধদেবের মত পথ দেখিতাম।"

আমারও আর ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু একেবারে হাত ধুইয়া বসিতেও পারিলাম না। প্রথম—চক্ষুলজ্জা; আন্দোলনে যোগ দিয়া এখন কি বলিয়া সরিয়া পড়ি? বিশেষ, দলাদলির মধ্যে পড়িয়া আমিও একটা দলে মিশিয়াছিলাম—সে দলেও উৎসাহী লোকের অভাব ছিল না; তাঁহারা প্রতিদিন মজলিস করিতেন, তর্ক করিতেন, মধ্যে মধ্যে সভায় বক্তৃতা করিতেন। দল আপনা-আপনি না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত আমি যাই কেমন করিয়া? দ্বিতীয়—করিব কি? আমার ত কাজের অভাবেই কাজ জুটান, এ কাজ ছাড়িয়া আমি কি করিব? কেবল ত বাড়ীতে বসিয়া দুশ্চিন্তার যাতনাভোগ! সুতরাং আমি দলেই রহিয়া গেলাম। সন্ধ্যাকালে আজ এ সমিতিগৃহে, কাল উঁহার বাড়ীতে মজলিস জাঁকাইয়া চা-পান করিতে করিতে গম্ভীরভাবে ভবিষ্যতের কথার বিচার করিতে লাগিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম না, যত দিন যাইতে লাগিল, তত আমার ভবিষ্যত অন্ধকার হইতে লাগিল; আমার জীবনে সুখের আলোকবিকাশের আশা ততই সুদূরপরাহত হইতে লাগিল।

বাস্তবিক, আমার বাহিরের কাজে গৃহের কর্ত্তব্যে অবহেলা হইতে লাগিল—আমি সংসার হইতে একটু দূরে যাইতে লাগিলাম। কর্দ্দম যতদিন কোমল—কর্দ্দমই থাকে, ততদিন তাহাকে দূর করা সহজ; কিন্তু কালক্রমে তাহা যখন কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বিচলিত

করা দুঃসাধ্য হয়; মনের একটা ভাব যতদিন নূতন থাকে, ততদিন তাহাকে দূর করা সহজ, কিন্তু তাহা ক্রমে কঠিন হইলে আর তাহা সহজ হয় না। মনের যে ভাব—যে অভিমান লইয়া আমি বাহিরে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, গৃহে হয় ত তাহা দূর করিবার কারণ ঘটিত; কিন্তু বাহিরে তাহা কেবলই কঠোর হইতে লাগিল। যে স্নেহের সরসতা আমার হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়া রাখিত, আমি ক্রমে সে সরসতা হইতেও সরিয়া যাইতেছিলাম। প্রাতে চা'র মজলিসে দাদাদের সঙ্গে, বাড়ীর সকলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইত। তাহার পর আমি আদালতে যাইতাম—সভাসমিতি সারিয়া ফিরিতে প্রায়ই বিলম্ব হইত। রাত্রিতে সকলে একসঙ্গে আহার করা ঘটিয়া উঠিত না—দাদাদের আহারের পর পিসীমা, জ্যেঠাইমা, মা আমার খাবার লইয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রসূন তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিলোলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইত না। তবে যদি কোন দিন কখনও তাহাকে দেখিতে পাইতাম, তবে লক্ষ্য করিতাম, তাহার মুখে স্নিগ্ধ কোমল ভাবের পরিবর্তে কঠোর গম্ভীরভাব স্থায়ী হইতেছে। অপর্ণা এক দিন আমাকেই বলিয়াছিল, "ছোটদাদা, উনি বলেন, জীবের মধ্যে কেবল মানুষই হাসিয়া থাকে। তুমি বিলোলাকে বুঝাইয়া দিও, যাহাতে কেবল আমাদেরই অধিকার, তাহা ত্যাগ করা সুবুদ্ধির কাজ নহে। ও যে দেখি, ক্রমে শ্রীমতী পেঁচামুখী হইয়া উঠিল! ও কি?"

তবু বিলোলাকে মনের ভাব গোপন করিবার জন্য আন্তরিকতাহীন হাসি হাসিতে হইত না। আমাকে সে হাসির যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হইত। অপর্ণার হাসির মত যাহাদের হাসি হৃদয়ের উৎসারিত আনন্দের

উৎস হইতে বাহির হয়, যাহাদের হাসিতে হৃদয়ের আনন্দকিরণ ঠিকরিয়া উঠে, তাহাদের হাসিই সুখের।

যে প্রস্রবণের স্ফটিকবারি প্রান্তরে স্নিগ্ধ উর্ব্বরতার সঞ্চার করিয়া শ্যাম শোভার বিস্তার করে, সেই প্রস্রবণ শুষ্ক হইলেই ভূমি মরুতে পরিণত হয়; সে প্রস্রবণ যখন শুকাইয়া যায়, তখন কি প্রান্তর যাতনা অনুভব করে না? যে আনন্দের সঞ্চারে মানব-হৃদয় সরস ও শোভাময় হয়, সেই আনন্দের উৎস শুকাইলে মানব-হৃদয়ে কি যাতনা হয় না? নবীন যৌবনে—সংসারে প্রবেশ করিয়াই বিলোলার হতাশাদগ্ধ হৃদয়ে আনন্দের সেই উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল। সে কি যাতনা অনুভব করে নাই? তখনও হয় ত সে আমার পরিবারকে আপনার ভাবিয়া তাহারই অঙ্গীভূত হইতে পারে নাই। সে ত বলিয়াছিল, "আমি এ বাড়ীর কে?" আমার প্রতি যে আকর্ষণ সে পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিত, আমি তাহাকে সে আকর্ষণ দিতে পারি নাই। সুতরাং সে নিতান্তই 'পরের' মধ্যে থাকিয়া সান্ত্বনার কোনও অবকাশই পাইতেছিল না। আমার অপেক্ষাও তাহার চিন্তার—দুশ্চিন্তার অবসর অধিক ছিল। পুত্রের কাজ ব্যতীত তাহার আর কোনও কাজই ছিল না। সে কাজও সামান্য—কেন না, পিসীমা, জ্যেঠাইমা ও মা হইতে দাদারা, বৌদিদিরা, ভ্রাতুষ্পুত্ররা, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া লইতেন। তাই আজ মনে হয়, আমার অপেক্ষাও তাহার যাতনা অধিক ছিল। তাই তাহার মুখে বিষণ্ণ ভাব স্থায়ী হইয়াছিল। আর সে যতই ভাবিত, ততই সে ভাব বর্দ্ধিত হইত। সেও ত আমারই মত মনে করিত,—'তাহার অপরাধ কি? তবে কেন

সে আমার ব্যবহারে বেদনা পায়!' সেও ত আমারই পরিবারে চারি দিকে চাহিয়া দেখিত, কাহারও তেমন যাতনার কারণ নাই। তখন সে অবশ্যই মনে করিত, আমারই ক্রটীতে তাহার দুঃখ। সে দেখিয়াছে, কাকাবাবুর বাহিরে কোন কাজ ছিল না—তিনি গৃহে থাকিতেই ভালবাসিতেন। সে দেখিত, দাদা ও সেজদাদা আফিসের কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াই যেন সুখ পাইতেন, তাঁহাদের কত কাজের ভার তাঁহাদের স্ত্রীরাই লইয়াছিলেন—সে পিসীমা'র ব্যবস্থায়। কিন্তু আমার সব কাজের ভারই আমি আপনার হাতে রাখিয়াছিলাম। সে নিশ্চয়ই এই প্রভেদের কারণ সন্ধান করিত। সে বোধ হয় অপর্ণার সুখময় দাম্পত্য জীবন লক্ষ্য করিয়াছিল, হয় ত তাহার কাছে সে জীবনের নানা কথাই শুনিয়াছিল। এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া সে কি ভাবিত? এ অবস্থায় সে যদি আপনাকে উপেক্ষিতা মনে করিয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া তাহার দোষ দিব? ভ্রান্তি যখন মানব-হৃদয়ে অভিমান উদ্ভূত করে, তখন সেই ভ্রান্তিজাত অভিমানেই আবার ভ্রান্তি বিবর্দ্ধিত হয়। যখন আমার হৃদয়ে ভ্রান্তি-সঞ্জাত অভিমান আমাকে কঠোর করিতে পারিয়াছিল, তখন বিনোলার হৃদয়ে সেই ভ্রান্তি-সঞ্জাত অভিমানে ভিন্নরূপ ফল ফলিবে, এমন মনে করিব কেন? সে বয়সে আমা হইতে ছোট, তাহার সংসারজ্ঞানও অল্প। আর যুবতী-হৃদয়ে অভিমান স্বভাবতঃই প্রবল। আবার আমরা প্রেমের যে আদর্শে তাহাদের তরুণ হৃদয়ের কল্পনা-পরিপুষ্ট করিবার প্রয়াস পাই, সে আদর্শও অভিমানের উত্তেজনা করিয়া থাকে।

তখন যদি অভিমানের ঝটিকাঘাতে দুশ্চিন্তার আবর্ত্তে না পড়িয়া

এ সব কথা ভাবিয়া দেখিতাম—যদি যে কাজে মন নাই, সেই কাজে আর সব ভুলিবার চেষ্টা না করিতাম, তবে বোধ হয় আপনার স্বার্থ আপনি পদদলিত করিতাম না—সুখের সন্ধানে বিলোলার ব্যবহারের কাঁটা হাসি দিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারিতাম—আর তাহার পর জীবনে সুখই পাইতাম। তাহা হইলে হয় ত ভবিষ্যতে ব্যবসার সাফল্য, সন্তানের প্রতি স্নেহ, সংসারের কর্ত্তব্য, এ সব আমাকে আবার বাবার মত কাকাবাবুর মত সংসারী ও সুখী করিত। তাহা হইলে আমি আমার সকল স্বজনের দুঃখেরই কারণ না হইয়া সুখের কারণ হইতাম!

আজ আর সে স্বপ্ন দেখিয়া লাভ কি? লাভ নাই, জানি; তবুও কতবার জাগিয়া এই স্বপ্ন দেখি—আর স্বপ্ন দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। মানুষ কি তাহার হৃদয়ের নিহিত দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া হৃদয় পাষাণ করিতে পারে? সে কি প্রবৃত্তির প্রবাহ জহ্নুর মত পান করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে? যে পারে, সে পারুক—আমি পারি নাই। যে সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করা যায়, সে সাধনা আমার সাধ্যাতীত। আমি দুর্ব্বল—আমি দুঃখদাবদাহদগ্ধ;—আমি ভ্রান্ত—তাই আমি দুঃখী; আমি সাধনা করিব কাহার?

যাহার উপর অভিমানবশে আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; সে ত্যাগের দিন সে আমার হৃদয় যেমন পূর্ণ করিয়া ছিল, আজও তেমনই পূর্ণ করিয়া আছে; সে দিনও হৃদয়ে আর স্থান ছিল না—আজও নাই। বরং আজ অপগত-অভিমান-হৃদয়ে চাহিয়া দেখি, তাহার কোনও দৈন্য—কোনও অসম্পূর্ণতা নাই। কুজ্ঝটিকার পর দূরে গিরিশৃঙ্গে যেমন অনন্ত সৌন্দর্য্য সমুজ্জ্বল দেখায়, সে-ও তেমনই দেখাইতেছে।

আর সে আজ আমার কাছে দূরস্থ গিরিশৃঙ্গেরই মত অনধিগম্য। কিন্তু আজ তাহাকে হৃদয়ে পাইয়াছি। আজ আমার হৃদয়ে তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি তাহাকে সুখী করিতে পারি নাই; কিন্তু সে দোষ আমার। জানি না, জন্মান্তর আছে কি না; যদি থাকে, তবে আমার এই কামনা—সেই জন্মান্তরে সে যেন সুখী হয়। সে সুখে কি তাহার অধিকার নাই? সে ত আমার মত কর্ত্তব্য ফেলিয়া পলায় নাই। সে তাহার সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে; সংসারের যে সব কর্ত্তব্যপালনে তাহার সুখ নাই, সে সব কর্ত্তব্যেও অবহেলা করে নাই। সুখভোগে যদি তাহার অধিকার না থাকে, তবে কাহার আছে? ইহকালে বা পরকালে যদি তাহাকে সুখী করিবার জন্য আমার ভ্রান্তির আরও প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন হয়, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত; যদি আমাকে আরও বেদনা ভোগ করিতে হয়, সে বেদনা আমি বুক পাতিয়া লইব। আর আমি বাহিরে যেমন, অন্তরেও যদি তেমনই তাহার নিকট হইতে দূরে যাইয়া থাকি, তবে সে শান্তি পাইয়াছে। কিন্তু যে প্রেম হইতে সঞ্জাত অভিমান তাহাকে আমার দিক্ হইতেও বাসনার প্রবাহগতি ফিরাইতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, সে কি সে প্রেম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছে? সেও ত আমারই মত মানুষ—সে কি মানুষের দৌর্ব্বল্য দূর করিতে পারিয়াছে? তাই ভাবি—

"তারো কি আমারি মত হৃদিরাজ্য বজ্রাহত,
ফুটে না কুসুম আর সাধের বাগানে?"

কে বলিবে?

এই সময় একখান পত্র আমার হস্তগত হইল। হস্তাক্ষর আমার অপরিচিত। আমি যে এককালে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলাম, তাহা বলিয়াছি। সেই পুস্তকের প্রকাশকের ঠিকানায় পুস্তকের লেখকের নামে পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল। যে পুস্তকের কাট্‌তি সম্বন্ধে সন্ধান করিতে এ কয় বৎসরে আমারও সাহস হয় নাই, সেই পুস্তকের লেখকের ঠিকানা খুঁজিয়া তাঁহার কাছে পত্রখানি পাঠান অবশ্যই প্রকাশক মহাশয়ের অসাধারণ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচায়ক।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। অপরিচিতা লেখিকা লিখিয়াছেন—

"অপরিচিতার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। আমি বিপদাপন্ন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উন্মত্ত উত্তেজনায় আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আপনার পুস্তক পাঠ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। 'বিদ্যুল্লতা'র চিত্র যিনি আঁকিয়াছেন, তিনি আমাকে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতে পারিবেন, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া আমি আপনাকে পত্র লিখিতে সাহসী হইলাম। আমার জীবনের দুঃখ-কথা দীর্ঘ। শুনিবার অবকাশ আপনার হইবে কি না, জানি না। যদি হয়, তবে তাহা আপনাকে জানাইয়া আমি আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনার উপদেশ লইতে পারি।"

আমার উপন্যাসে আমি যে বিদ্যুল্লতার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম, সে তাহার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান—বড় আদরের। কিন্তু পিতা অর্থে সুখ হইবে মনে করিয়া তাহাকে যে পাত্রে সমর্পিতা করিয়াছিলেন, সে তাহাকে সুখী করিতে পারে নাই। বিদ্যু-

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লতা নিষ্কলঙ্ক-হৃদয়ে স্বামীর প্রেমে সুখলাভের আশা করিয়া হতাশ হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে—স্বামীর মনে তাহার চরিত্রে অকারণ সন্দেহ জন্মিয়াছিল—সেই সন্দেহের দংশনে ব্যথিত হইয়া সে এক দিন উত্তেজনাবশে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াই সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিল। যে কখনও স্বাধীনভাবে পথে দাঁড়ায় নাই, সে পথে দাঁড়াইয়াই আর কোনও দিকে পথ দেখিতে পায় নাই—গৃহের পরিচিত পথও তখন তাহার পক্ষে রুদ্ধ। তাই সে আত্মহত্যা করিয়া—মৃত্যুর পথ মুক্ত করিয়া মুক্তি ভাল করিয়াছিল; চিরাগত সংস্কার তাহাকে বুঝাইয়াছিল—গৃহই রমণীর কর্ম্মক্ষেত্র ও ধর্ম্মক্ষেত্র।

চিরাগত সংস্কারের ও স্বাধীনতার অভাবের ফল দেখাইয়া সমাজ-সংস্কারের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কোনও বিষয়ে উদ্দেশ্য লইয়া যদি আমি সে পুস্তক রচনা করিয়া থাকি, তবে সে বিলোলার তৃপ্তিসাধন। ঘটনার পর ঘটনার সংস্থান করিতে করিতে আমি যে স্থানে উপনীত হইয়াছিলাম, সে স্থানের অঙ্কিত চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিচার করিয়া ভাব-বিশ্লেষণ করিয়া অগ্রসর হইতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, আমার সে ক্ষমতা ছিল না। তাই ক্ষমতার অভাবেই আমি বিদ্যুল্লতাকে আত্মঘাতিনী করিয়া, সে মুক্তি পাউক আর না পাউক,—স্বয়ং মুক্তি লাভ করিয়াছিলাম,—যেন ঘাড়ের বোঝা নামাইয়া ফেলিতে পারিয়াছিলাম।

যে অক্ষম চিত্রকর এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহার কাছে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সদুপদেশ-প্রাপ্তির আশা! এ কি উপহাস? উপহাস

হইলেই ঠিক হয়; কিন্তু এতদিন পরে অনাদৃত ও অবজ্ঞাত, বিস্মৃত উপন্যাস লইয়া এ বিদ্রূপ কে করিল? যদি আমার কোনও পরিচিতের এ কাজ হয়, তবে কি তিনি প্রকাশকের কাছে পত্র পাঠাইয়া আমার পক্ষে তাহা প্রাপ্তির অনিশ্চিত আশা করিতেন? তিনি আমার জানা ঠিকানাতেই পত্র লিখিতেন না কি? তবে এ কি কোনও কৌশল-জাল? যে এমন জাল পাতিতে পারে, সে আমার মত তুচ্ছ মক্ষিকা ধরিবার জন্য প্রয়াস পাইবে কেন? যাহাই হউক, আমি এই প্রগল্‌ভা অপরিচিতার পত্রের উত্তর দিব কোন্ সাহসে? শেষে কি জালে জড়াইয়া পড়িব?

এমনই কত কথা ভাবিলাম,—পুনঃ পুনঃ পত্রখানা পরীক্ষা করিয়া কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলাম না। রহস্যভেদ করিবার কোনও উপায় পাইলাম না। শেষে স্থির করিলাম, এ পত্র সম্বন্ধে কোনও কাজেই আমার কাজ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অপরিচিতা

সনৎকুমার আমার সতীর্থ ও সমব্যবসায়ী,—দুই জনে অনেক দিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। আমাদের পঠদ্দশায় আমাদের কোনও ইংরাজ অধ্যাপক হাজিরা ডাকিবার সময় আমার নাম 'বাইকাশচন্দর' বলিয়া উচ্চারিত করিতেন। তদবধি সে আমাকে ঠাট্টা করিয়া 'বাইকাশচন্দর' ব'লিয়াই ডাকিত। সে উচ্চারণের সঙ্গে যে সময়ের স্মৃতি-সম্বন্ধ ছিল, সে সময় সুখের। তাই বোধ হয়, এই উচ্চারণ সে-ও ভালবাসিত, আমিও ভালবাসিতাম। আমি যে দিন অপরিচিতার পত্র পাইলাম, তাহার পরদিন আদালতে সনৎকুমার আমাকে বলিল, "বাইকাশচন্দর, তুমি দেখিতেছি নানা দিকে বিখ্যাত হইয়া উঠিতেছ।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "বিশেষ আমাদের এই ব্যবসায়ে? বোধ হয়, এবার হাইকোর্টের জজের পদ খালি হইলে আমিই পাইব, আর তুমি 'মিলর্ড' বলিয়া আমার এজলাসে ওকালতী করিতে আসিয়া আমার কাছে তাড়া খাইবে।"

"তাহাও অসম্ভব নহে। বিশেষ তোমরা স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে, জজ-নিয়োগের কর্ত্তা ত তোমরাই হইবে। কিন্তু আমি সে কথা বলিতেছিলাম না। সে বিষয়ে তোমারও যে দশা,—আমারও সেই দশা, উকীল কবি হেমচন্দ্রের কথায়,—

'কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজলাসে এজলাসে,
তিন তেরটি লাথী খেয়ে ঘরে ফিরে আসে।'

তুমি স্বদেশী নেতা; আবার তোমার উপন্যাসও লোক পড়ে!"

"এটা নূতন সংবাদ বটে!"

"পড়ে এবং প্রশংসাও করে!"

"এমন লোক আছে?"

"আছে, আমারই এক আত্মীয় ও মামার বাড়ীর সম্পর্কে ভগিনী সে দিন তোমার উপন্যাসের প্রশংসা করিতেছিল; কথায় কথায় আমি তোমার পরিচিত জানিতে পারিয়া তোমার কথাও জিজ্ঞাসা করিতেছিল। মঞ্জরী বলিতেছিল, সে তোমার উপন্যাসে তোমার অসাধারণ লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছে।"

মঞ্জরী আমার সেই অপরিচিতা পত্রলেখিকা। তখন মনে হইল, সে পত্রে যে ঠিকানা লিখিত, সে ঠিকানা আমার পরিচিত,—সনৎকুমারেরই বাড়ীর ঠিকানা। সে কথাটাও বিদ্যুল্লতার চরিত্রস্রষ্টা, লোকচরিত্রজ্ঞানবান্ ঔপন্যাসিকের মনে হয় নাই! যে এটুকুও লক্ষ্য করিতে পারে নাই, সে আবার উপন্যাস রচনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখে!

আমি বলিলাম, "তিনি যে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন।"

সনৎকুমার বলিল, "হাঁ, হাঁ। তেমনই কি বলিতেছিল বটে। আমি সে কথায় বড় কান দিই নাই। মেয়েটা কেমন হইয়া গিয়াছে।"

পত্রখানা আমার কাছে ছিল না, কিন্তু পত্রের লিখিত বিষয় আমার মনে ছিল। আমি সনৎকুমারকে সে কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"ব্যাপারটা কি? এমন ভাবে এক জন অপরিচিত ব্যক্তিকে পত্র লেখা বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ের পক্ষে বিস্ময়কর নহে কি?"

"তাহা ত বটেই। তবে মঞ্জরীর জীবনটাই যেন বেসুরা হইয়া গিয়াছে।"

সনৎকুমারের কথায় আমার বিস্ময় বাড়িতে লাগিল।

সে বলিল, "মঞ্জরী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান—শৈশবে মাতৃহীনা—বিপত্নীক পিতার স্নেহের একমাত্র অবলম্বন। তাহার পিতা আচার-ব্যবহারে ঠিক আমারই মত ছিলেন।"

আমি বলিলাম, "অর্থাৎ 'নৈরাকারে'র দলে; কোনও আচারের শাসন মানিয়া চলা কুসংস্কার—এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী?"

"তাই বটে—অনুষ্ঠানে অহিন্দু, সামাজিক ক্রিয়ায় হিন্দু, কাজে সুবিধাবাদী, বিশ্বাসে অবিশ্বাসী। এমন পিতার কাছে যেরূপ শিক্ষা পাওয়া সম্ভব, মঞ্জরী সেইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছিল। সে ইংরাজী ভাষায়, সঙ্গীতে, শেলাইয়ে সুশিক্ষিতা হইয়াছিল; কিন্তু গৃহকর্ম্ম শিখে নাই। সে পিতার উত্তেজনাবশে কার্য্য করিবার প্রবল প্রবৃত্তি পাইয়াছিল। কিন্তু সংসারের নানারূপ অভিজ্ঞতায় পিতার যে প্রবৃত্তি সংযত হইয়াছিল —কন্যার সে প্রবৃত্তি সংযত হইবার কারণ ঘটে নাই। এই অবস্থায় সে পালিতা হইয়া বর্দ্ধিতা হয়।"

বিদ্যুল্লতার সঙ্গে মঞ্জরীর সাদৃশ্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর!

সনৎকুমার বলিতে লাগিল, "যে বয়সে বাঙ্গালীর মেয়ের সাধারণতঃ বিবাহ হয়—গৌরীর বয়স নহে, আজকালকার বার তের—মঞ্জরীর সে বয়স পার হইয়া গেল। বাড়ীতে খোঁচা খাইয়া প্রাণ অতিষ্ঠ না হইলে

হালের হিন্দু পিতা মেয়ের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়েন না। মামার বাড়ীতে খোঁচা দিবার কেহ ছিল না। সুতরাং মঞ্জরীর বিবাহে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। শেষে আত্মীয়স্বজনরা, বিশেষ আত্মীয়ারা মামাকে কর্ত্তব্যসাধনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি মা'র কাছে খুব তাড়া খাইলেন, বলিয়া যাইলেন—মেয়ের বিবাহ দিতে আর বিলম্ব করিবেন না। বরের খোঁজ চলিতে লাগিল—সন্ধানও মিলিতে লাগিল। মঞ্জরীর রূপের অভাব ছিল না—মামারও টাকার অভাব ছিল না, তিনি সাবজজ হইয়াও যে কার্পণ্যকে কঠোর বিদ্রূপ করিতেন, সে তাঁহার পিতৃপুরুষাগত অর্থের আতিশয্যে। বরের সন্ধান মিলিতে লাগিল, কিন্তু মামার মন কিছুতেই 'উঠে' না। সুতরাং সন্ধানে আরও দিন কাটিতে লাগিল। শেষে মঞ্জরীর বৃদ্ধা মাতামহী মামাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মামা বিপদ্ গণিলেন ; কারণ, মেয়ের মৃত্যুর পর হইতে জামাতাকে দেখিলেই তিনি কাঁদিতেন। মামার হৃদয়ে স্ত্রীর শোকক্ষত শুকায় নাই , তিনি অনেক চেষ্টায় তাহা লুকাইয়া রাখিতেন। শাশুড়ীর শোকোচ্ছ্বাসে তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইত ; অনেক সময় শাশুড়ীর সহিত সাক্ষাতের পর একবার বিচলিত হইলে মামা দুই তিন দিন আপনাকে সামলাইতে পারিতেন না—আপনার শোকবেগ সংযত করিতে পারিতেন না। মঞ্জরীর মাতামহী তাহার বিবাহের একটা সম্বন্ধ করিয়া মামাকে ডাকিয়াছিলেন। সম্বন্ধটা মাতামহীর হিসাবে অতি উপাদেয় হইলেও মামার কাছে ভাল বোধ হইল না। পাত্রটি 'বনিয়াদী' ঘরের একমাত্র বংশধর—বিরাট বিধবাপুরীর 'সবে-ধন'। তাহার অর্থের অভাব ছিল না—কিন্তু বিদ্যার অভাব ছিল।

এরূপ সম্বন্ধে মামার আপত্তি ছিল। তিনি মঞ্জরীকে যেরূপ শিক্ষা দিয়া সে জীবনে অভ্যস্তা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পক্ষে হালের কোনও স্বাবলম্বী স্বামীর স্বতন্ত্র সংসার ব্যতীত অন্যত্র সুখী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিরাট হিন্দু-পরিবারের জটিল কর্ত্তব্যজাল তাহার পক্ষে ক্লেশ-দায়ক হইবারই কথা। মামা এ সব বুঝিতেন। কিন্তু বুঝিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে এ সম্বন্ধে অমত জানাইলেও যখন মঞ্জরীর মাতামহী এমনই কথা বলিলেন যে, কন্যাকে হারাইয়া তিনি জামাতার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ হারাইয়াছেন, নহিলে জামাতা তাঁহার কথা ঠেলিতে পারিতেন না—তখন মামা আর উত্তর করিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, "মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিলেন না?"

সনৎকুমার বলিল, "এই দৌর্ব্বল্যের জন্য মামার দোষ দিতে হয়, দাও। কিন্তু এটুকু তাঁহার পত্নীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেমেরই ফল। তাঁহার কাছে মঞ্জরীর মাতামহী—মামীমা'র মাতা, তাঁহার হৃদয়ে তিনি ব্যথা দিতে পারেন না। তোমরা মানব-চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত কর (অবশ্য তোমরা না পড়িয়া পণ্ডিত—না লক্ষ্য করিয়াই চিত্রকর) তোমরা এ কাজের দোষগুণ বিচার করিতে পার। কিন্তু মামা চিরদিন পুরুষকারেরই উপাসক ছিলেন। তবে তিনি যে এ ক্ষেত্রে অদৃষ্টে বিশ্বাস করিলেন, সে বোধ হয় মামীমা'র মৃত্যু তাঁহাকে অদৃষ্টবাদের পথ দেখাইয়াছিল বলিয়া, আর তিনি মামী-মা'র মা'কে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিতেন না বলিয়া। মাতামহীর জিদে তাঁহারই মনোনীত পাত্রের সঙ্গে পঞ্জিকার নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে

মঞ্জরীর বিবাহ হইয়া গেল। মামা সম্পূর্ণভাবে আচারের সব শাসন মানিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। আমরা মিষ্টান্নে উদর পূর্ণ করিয়া গভীর রাত্রিতে গৃহে ফিরিলাম; পরদিন কাশীতে মা'কে পত্র লিখিবার সময় সংবাদ দিলাম—মঞ্জরীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে; বর খুব 'বড়মানুষ'—খুব ঘটা করিয়া, চৌঘুড়ী চড়িয়া, বিলাতী বাজনা বাজাইয়া, খাসগেলাসের বাঁধা রোসনাই করিয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছিল; তাহাদের চাল খুব সেকেলে, চৌঘুড়ীর আগে 'ময়ূরপঙ্খী' ছিল—বরের হাতে হীরার বালা ও গলায় মুক্তার মালা ছিল।"

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সব সেকেলে চাল আজও আছে?"

সনৎকুমার বলিল, "আছে।" তাহার পর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সে বলিল, "তোমরা পাড়াগেঁয়ে, তোমাদের ত, আছেই। আর, কলিকাতায় আছে, যে সব ঘরের বনিয়াদী গর্ব্ব অত্যন্ত অধিক। বনিয়াদীরা বারো মাস বাড়ীতে বৈঠকখানা হইতে আরম্ভ করিয়া সব খানাতেই গ্যাসের বা বিদ্যুতের আলোক জ্বালে, কিন্তু বাড়ীতে কাজের দিন পলাশীর যুদ্ধের আমলের গোটাকতক হাতলণ্ঠনে 'গেলাস' জ্বালাইয়া বাহির করিয়া বনিয়াদিত্ব প্রতিপন্ন করে।"

"তোমরা ত কলিকাতার খাসবাসিন্দা বনিয়াদী?"

"না, খাসবাসিন্দা হইলেই বনিয়াদী হওয়া যায় না। বনিয়াদী হইতে হইলে কলিকাতার জঙ্গল কাটা আমলের কিছু জমী থাকা চাহি; তাহার পরে পুরুষানুক্রমে ছেলেদের লেখাপড়া-বিমুখ, চাকরী-বিমুখ 'বাবু' করিয়া রাখা চাহি। খাটিয়া খাইলেই বনিয়াদিত্ব নষ্ট হয়।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"এখন আসল কথা বল শুনি।"

"কেন, আবার উপন্যাসের খোরাক জুটাইবে নাকি? ব্যাপারটা উপন্যাসের উপকরণ হইবার মতই বটে। তখনও দাদা পৃথক্ হয়েন নাই। বৌদিদি বিবাহবাটী হইতে আসিয়া খুব হাসিলেন। মামা মঞ্জরীকে 'বিবি' করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, আর সে পড়িল একেবারে সেকেলে ঘরে। বৌদিদি বলিলেন, 'তোমরা রহিমই ভজ—আর যিশুই ভজ—শেষকালে সবই সমান।' আমারও আশঙ্কা হইয়াছিল, এমন ঘরে পড়িয়া মঞ্জরী সুখী হইতে পারিবে ত? বৌদিদি বলিয়াছিলেন, সে আশঙ্কার কারণ নাই। কারণ, হিন্দুর মেয়ে যে অবস্থায় পতিত হয়, আপনাকে সেই অবস্থার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারে। সেটা অবশ্য তাঁহার গর্ব্বের কথা। শেষে কিন্তু দেখিয়াছিলাম, আমাদের আশঙ্কাই সত্য হইয়াছিল। এ বিবাহে মঞ্জরী সুখী হয় নাই— সে শিক্ষালব্ধ সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে নাই। ঘরের কথা পর সম্পূর্ণ জানিতে পারে না। কিন্তু ভাবে বেশ বুঝা গিয়াছিল, বিবাহ সুখের হয় নাই। মেয়ের বিবাহ দিয়া মামা চাকরী ছাড়িয়া কলিকাতায় বাড়ী তৈয়ার করাইয়া সেই বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অনেক আশা করিয়া তিনি জীবনের শেষকালে সুখভোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুখভোগের সৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। আমি যে বাড়ীর অর্দ্ধাংশে বাস করিতেছি, সেই বাড়ীই মামার—এখন মঞ্জরীর। মামার মৃত্যুর পর বাড়ীর অর্দ্ধেকটা ভাড়া দেওয়া হয়— আমি ভাড়া লই। স্নেহের একমাত্র অবলম্বন মেয়ের অসুখে মামার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—বোধ হয়, সেই বেদনাই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ।"

কেবল দুঃখ। কিন্তু আমি তোদের দুই ভাইকে দুই ঠাঁই দেখিতে পারিব না। আমি কাশীবাস করিতে চলিলাম। তোরা আর এক সঙ্গে থাকিস্ না।” তিনি কাশী যাইবার অল্পদিন পরেই তাহারা দুই ভাই বিনা মামলায় আলাহিদা হইল। পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া টাকা লইয়া সনৎকুমার বাড়ী ভাড়া লইয়া স্বতন্ত্র সংসার পাতিল। সংসারে সে, আর তাহার স্ত্রী। সংসারজ্ঞান দুই জনেরই সমান। তবে তাহাতে যে অসুবিধা হইত, তাহাতে দুই জনই হাসিত ; সুতরাং দুঃখের কারণ ছিল না। লোকলৌকিকতার কথা হইলে মা'র কাছে পত্র লিখিয়া সে কর্ত্তব্য স্থির করিত। দাদা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই পাইয়াছিলেন ; সুতরাং মনোমালিন্যের কোনও কারণ ঘটে নাই—অসন্তোষে কণ্টকাকীর্ণ এক সংসারে থাকিয়া কাহাকেও ব্যথা পাইতে হয় নাই। সনৎকুমার বলিত, “এ ভাই আছি ভাল—দুঃখের ভাত সুখে খাই।” কথাটার অর্দ্ধেক সত্য, অপরার্দ্ধ মিথ্যা। ভাতটা দুঃখের নহে ; কারণ, ভাতের জন্য তাহাকে আপনার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে হইত না—সেটা পৈতৃক অর্থেই চলিত। তবে সে যে সুখে খাইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, রন্ধন বিষয়ে তাহার গৃহিণীটির অসাধারণ পটুত্বের পরিচয় আমরা তাহার বন্ধুজনও – মাছের ঝুরী, দৈয়ের মাছ, কড়াইশুঁটীর কচুরী, ছানার পিঠা প্রভৃতি বিবিধ রসনারসসঞ্চারী খাদ্যে পাইয়াছি। আপনার ছোট সংসারটি লইয়া সে বেশ সুখে থাকিত – সুখে থাকিতে জানিত। সুখে থাকিতে না জানিলে কি কেহ সুখে থাকিতে পারে ? যত দিন মা বাঁচিয়া ছিলেন, পূজার দীর্ঘ ছুটীটা সে সপরিবারে কাশীতে মা'র কাছে কাটাইয়া আসিত। তাঁহার মৃত্যুর

পর সে পাট উঠিয়া গিয়াছে। সে ব্যবসায়ে মন দেয়—আদালতের পরই বাড়ী ফিরিয়া যায়; স্বামিস্ত্রী ছেলেমেয়েদের লইয়া সুখে সময় কাটায়। সভাসমিতি এ সব তাহার ছিল না।

সংসারে গৃহিণীর মধ্যে তাহার স্ত্রী। তাই সে পরামর্শ করিবার একটা লোক পাইয়া যেন একটু খুসী হইল; আমাকে বলিল, "আজও কি দেশোন্নতি আছে নাকি?"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "কেন?"

"যদি না থাকে, তবে দেশোদ্ধার রাখিয়া আমার উদ্ধারের একটু চেষ্টা কর। আমার সঙ্গে চল—সকলে পরামর্শ করিয়া মঞ্জরীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে। আপত্তি আছে?"

"না; কিন্তু সর্ত্ত—তোমার গৃহিণী খাবার করিয়া খাওয়াইবেন কি, বল?"

"নিশ্চয়। তোমার দোহাই দিয়া আমারও কিছু লাভ হইবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মঞ্জরী

অপরাহ্নে আমি সনৎকুমারের সঙ্গে তাহার গৃহে উপনীত হইলাম। সে চাকরকে ডাকিয়া আমার জন্ত স্নানের ঘরে কাপড়, তোয়ালে, সাবান দিতে বলিয়া আমাকে বলিল, "এখন যাও, হাতমুখ ধুইয়া ধড়াচূড়া ছাড়িয়া আইস—আমার মোহন-বাঁশীর সন্ধানে যাই।"

আমি ফিরিয়া আসিলে সে বলিল, "আজ বড় বেগতিক। গৃহিণী বলেন, 'আগে তুমি একটা সাব্যস্ত করিয়া দাও, তবে তিনি খাবারের ব্যবস্থা করিবেন'।"

আমি বলিলাম, "মুখ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা না করিলে আমি এ ব্যাপারের মুখবন্ধই করিব না। তিনি উকীলের গৃহিণী—জানেন না যে, ফি না পাইলে আমরা কাজে হাত দিই না?"

যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এ কথা বলিলাম, তিনি একটি দ্বারের অন্তরালে ছিলেন—ছেলেকে দিয়া সনৎকুমারকে ডাকাইয়া তাহার মারফৎ বলিয়া পাঠাইলেন, "উকীল চিনিতে আমার বাকী নাই—টাকা না পাইলে কাজে হাত না দেওয়া উকীলও আছে, আবার বিনা-পয়সায় কাজ পাইলেই বাঁচিয়া যায়, এমন উকীলও আছে। কাহার কি দর, তাহা তিনি আপনি অবশ্যই জানেন। মনের অগোচর পাপ নাই।"

আমি হারিয়া আর এক যুক্তির অবতারণা করিলাম—'মৃদঙ্গোমুখ লেপেন করোতি মধুরধ্বনিম্,' আমরাও মৃদঙ্গজাতীয়, যে যেমন বাজাইতে পারে, তেমনই বাজনা বাহির হয়। বাজনার ভালমন্দ বাদ্যকরের হাতযশ। মুখলেপের ব্যবস্থা হইলে ধ্বনিটা ভাল হয়—খাবার পাইলে পরামর্শটা জমিবে ভাল।"

তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "সে ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন উপস্থিত এ কাজে কর্ত্তব্য কি ?"

সনৎকুমার তাঁহাকে বলিল, "ও ত তোমার রায়েই রায় দিতেছে ; বলিতেছে, একটা উপায় করিতেই হইবে, মঞ্জরী যদি একটা ভুলই করিয়া থাকে, তাই বলিয়া তাহাকে চিরকালের জন্য দুঃখভোগ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।"

আমি বলিলাম, "দুই পক্ষকেই বুঝাইয়া শান্ত করিয়া এ ব্যাপারের একটা সুমীমাংসা, যেমন করিয়াই হউক, করিয়া দিতে হইবে।"

কেমন করিয়া কি করিলে ভাল হয়, আমাদিগকে সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে বলিয়া সনৎকুমারের পত্নী খাবার প্রস্তুত করিতে গেলেন।

আমাদের পরামর্শে কিন্তু ফল এতটুকুও অগ্রসর হইল না। যখন খাবার আসিল, তখন আমরা কিছু স্থির করিতে পারি নাই। শুনিয়া সনৎকুমারের স্ত্রী বলিলেন, "টাকা দিয়া কি মক্কেলরা এইরূপ কার্য্যই পায়—খোয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হয় ?"

শেষে আমি বলিলাম, "এ ক্ষেত্রে আমাদের একটু অপমান সহিতে হইলেও সহিতে হইবে। সনৎ একবার মঞ্জরীর শ্বশুরবাড়ী যাইলে ভাল হয়।"

সনৎকুমার গৃহিণীকে বলিল, "বরাত দিয়া পরামর্শ হয়না ; তুমি আসিয়া যাহা বলিতে হয়, বল।"

সনতের গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "সে কথা আমিও বলিয়াছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মঞ্জরাকে জিদ ছাড়াইতে হইবে।"

"সে ভার আপনার।"

"আমি ত কয় দিনই সে চেষ্টা করিতেছি ; বলিতেছি, অবলম্বন নহিলে যাহাদের চলে না, তাহাদের অত রাগ সাজে না।"

সনৎকুমার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "রাগ করিবার সময় এ জ্ঞান কোথায় থাকে ?"

উত্তর হইল, "আমরা সে জ্ঞান লইয়াই ঘর করি ; সেই জন্যই সংসার অচল হয় না। আমরা রাগ করি না ; করি—অভিমান। সেও আবার অবস্থা বুঝিয়া। যেখানে অভিমান থাকে, সেখানেই অভিমান করিতে হয় ; নহিলে মানও থাকে না, প্রাণও যায়।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এ-ভার আপনি না নইলে ত চলিবে না। আপনি তাহাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করুন ; আমরা ও দিকের কাজ করিবার চেষ্টা করি।"

"আমি সে চেষ্টা খুবই করিতেছি। কিন্তু তাহার দাদাটির সে চেষ্টা একেবারেই নাই।"

"সে বোধ হয় আপনার তাগাদার অভাবে।"

"আমার তাগাদা 'গা-সহা' হইয়া গিয়াছে। এখন আপনারা একটু তাগাদা করুন।"

"সেটা যে অনধিকারচেষ্টা হইবে !"

"আমি অধিকার ছাড়িয়া দিতেছি।"

"সুস্থশরীরে এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে?"

"হাঁ।"

সনৎকুমার বলিল, "কম্বলী নেহি ছোড়্‌তা। তুমি ছাড়িলেও আমি ছাড়িতে দিতে পারি কই?"

তাহার পর সনৎকুমার বলিল, "বাইকাশচন্দরের প্রশংসায় ত মঞ্জরী পঞ্চমুখ—একবার ডাক না! জীবটিকে দেখিয়া যাউক।"

আমি তখনও আহার্য্যের 'সুবিচার' করিতেছিলাম; বলিলাম, "বিশেষ আহারে আমি কেমন শতমুখ!"

কিন্তু যখন সত্য সত্যই মঞ্জরীকে ডাকিবার উদ্যোগ হইল, তখন আমি বিব্রত হইলাম। সে অপরিচিতা এবং বিপন্না; আমি তাহাকে কি বলিব—কেমন করিয়া বলিব? আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা উভয়ই এরূপ পরিচয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আমি বলিলাম, "না—না! তাঁহাকে ডাকিয়া কি হইবে?"

সনৎকুমার হাসিয়া বলিল, "তবে উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবে কেমন করিয়া? মঞ্জরীকে—'তিনি', 'তাঁহার'—বলিয়া 'ভব্যি-যুক্ত' করিবার দরকার নাই—সে আমার অনেক ছোট, বয়স সতের কি আঠার। নইলে কি এত অবুঝ হয়?"

"ছেলে মেয়ে কিছুই হয় নাই?"

"এই বুঝি ঔপন্যাসিকের মানবচরিত্র-জ্ঞান?"

"কেন?"

"ছেলে মেয়ে হইলে কি আর মেয়েদের এত ঝাল থাকে? নোঙ্গর

থাকিলে নৌকা রাগের তুফানে বা অভিমানের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে না।"

সনৎকুমারের পত্নী বলিলেন, "আরও নোঙ্গর থাকে—সে নোঙ্গর না থাকিলে কেহ আমাদের সংসারে বদ্ধ রাখিতে পারে না। আর সে নোঙ্গরের কাছি আপনারাই কাটিয়া দেন।"

সনৎকুমার বলিল, "ভালবাসার নোঙ্গরের কাছি আমরা ইচ্ছা করিয়া কাটি? এমন হইতেই পারে না। আর যদি কাটি, সে কেবল সেই দড়ি গলায় দিয়া মরিবার জন্য।"

আমি বলিলাম, "বহুৎ আচ্ছা।"

সনৎকুমারের স্ত্রী বলিলেন, "গলায় দড়ি দিতে যে আমরাই দিতে পারি না। আমাদের এ ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর!"

তাহার পর সনৎকুমার আবার মঞ্জরীকে আনিবার কথা বলিল। আমি আবার বলিলাম, "আনিয়া লাভ কি?"

সে বলিল, "এমনও ত হইতে পারে যে, তুমি একটু বুঝাইতে পার! দেখই না। এত যে পরামর্শ করিতেছি, সে ত—যদি একটা উপায় হয় বলিয়াই!"

সনৎকুমারের স্ত্রী চলিয়া গেলেন। আমি সংসার-স্রোতে তাঁহার তিনটি নোঙ্গরের বড়টির সঙ্গে তাহার খেলানা লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম—মধ্যমাটি তাহার নূতন খেলানা আমাকে দেখাইবার জন্য আনিতে গেল। আমার সঙ্গে ছেলেদের ভাব যেন অতি স্বাভাবিক ভাবেই হইত। এত দিনে তাহারা কত বড় হইয়াছে—তাহাদের বিকাশ কাকার স্মৃতি তাহাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু

আমি তাহাদের ভুলিতে পারি নাই। আজও সে দিনের কথা লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে, যেন, আমি সনৎকুমারের সেই ঘরে বসিয়া আছি—মেয়েটি আবার কোলে বসিয়া আছে, ছেলেটি আমাকে তাহার টিনের খেলানা মোটর-গাড়ীতে দম দিয়া ছাড়িয়া দিতে বলিতেছে।

তাহারা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর যাহারা তাহাদের অপেক্ষাও আমার আপনার—আমার প্রিয় ছিল, যাহাদিগকে নয়নের অন্তরাল করিতে ইচ্ছা হইত না—তাহারা? তাহাদের কাছেও আজ আমি বিস্মৃত। আমার পুত্র—আমার শান্তি—আমার সান্ত্বনা—আমার সুখ—আমার সৌভাগ্য,—সেও আমাকে ভুলিয়াছে। যদি সে আমাকে ভুলিয়া থাকে, তবে সেও ভাল—কেন না, তাহা দুঃখ। আর যদি—যদি সে আমার ব্যবহারে আমাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়া থাকে—আমার সব কথা জানিতে না পারায় আমাকেই তাহার দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করিতে শিখিয়া থাকে—তবে? তবে সে বেদনা আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব? যখন সে কথা মনে করি, তখন যেন আমি উন্মত্ত হই; এক একবার ইচ্ছা হয়, একবার যাইয়া তাহাকে বুঝাইয়া আসি, আমি কত ব্যথা পাইয়াছি—আমি যে শেষে তাহাকে আমার বেদনা-বিক্ষত বক্ষে ধরিতেও পারিলাম না, আমার এ ব্যথার ঔষধ নাই। তাহার পর আপনার দৌর্ব্বল্যে আপনি বিস্মিত হইয়াছি! আমি তাহাকে সে কথা বুঝাইবার অধিকারও রাখি নাই—আমি যখন তাহাকেই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তখন অধিকার ত তুচ্ছ! তবে যদি কখনও তাহাকে কোনও কথা বলিবার অবকাশ পাইতাম, তবে অধিকারের কথা বলিতাম; বলিতাম—যে স্থানে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, এ সকলের

সম্বন্ধ, সে স্থানে অধিকার বিচার করিও না ; যে স্থানে দিয়াই সুখ, সে স্থানে পাইবার কথা মনে না করিয়াই দিও। তাহা হইলেই জীবনে সুখী হইতে পারিবে।

আমি সনৎকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের খেলানা মোটরগাড়ীখানিতে দম্ দিয়া টেবলের উপর ছাড়িয়া দিয়াছি, সেখানি ঘুরিতেছে ; আর খেলানার মালিক আনন্দে ছোট ছোট হাতে তালি দিতেছে, এমন সময় পার্শ্বের দ্বারে অলঙ্কার-শিঞ্জিত ও অঞ্চলবদ্ধ কুঞ্চিকাগুচ্ছের সঞ্চালন-শব্দ শ্রুত হইল। সনৎকুমারের পত্নী দ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মঞ্জরী দ্বারের চৌকাঠ অতিক্রম করিয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া সহসা সম্মুখে এক জন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া মস্তকে অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিবার জন্য বাম করের অঙ্গুলি দিয়া পরিধেয় শাটীর পাইড় ধরিয়া টানিল।

এমন সময় সনৎকুমার আমাকে দেখাইয়া মঞ্জরীকে বলিল, "এই তোমার ঔপন্যাসিক বিকাশচন্দ্র।"

মঞ্জরীর আয়ত লোচনের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আমার দিকে পতিত হইল। সে যেন কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না—তাহার বাম করের অঙ্গুলি বস্ত্রবদ্ধই রহিল, সে যেমন ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, ঠিক তেমনই ভাবে—পাষাণে ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, সন্তরণানভিজ্ঞ ব্যক্তি সহসা তরণী হইতে সাগর-সলিলে পতিত হইলে তাহার ভাব যেমন হয়, মঞ্জরীর ভাব তেমনই হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল— তাহার তনু দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। সনৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তাহার দিকে

গেল। সনৎকুমারের পত্নী মঞ্জরীর অবস্থা দেখিয়া তাহাকে না ধরিলে সে বোধ হয় পড়িয়া যাইত। সনৎকুমার ও তাহার পত্নী মঞ্জরীকে পার্শ্বের কক্ষে খাটে বসাইলে সে স্থির হইল। তখন সনৎকুমার ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি? মঞ্জরী কি তোমাকে চিনে?"

আমি বলিলাম, "না।"

"তবে সহসা কি সে পীড়িতা হইল?"

"আমার বোধ হয়, সে তাহার উত্তেজনাপ্রবণ হৃদয়ের উত্তেজনায় সহসা অপরিচিত লেখককে পত্র লিখিয়াছিল। তখন চিন্তাসাগরে কূল না পাইয়া, চিরাগত সংস্কার ভুলিয়া সে কাজ করিয়াছিল; তাহার পর স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আর আমি সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইব। আজ সহসা আমাকে উপস্থিত দেখিয়া সে লজ্জায় এমন হইয়াছে। যে উত্তেজনা তাহাকে পত্র লিখিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, সে উত্তেজনা ত আর নাই যে, তাহাতেই তাহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবে!"

"এত মনস্তত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে ত আমিও ঔপন্যাসিক হইতে পারিতাম! কিন্তু আমিও বড় দুর্ভাবনায় পড়িলাম! এখন করি কি?"

"যে উত্তেজনাপ্রবণতায় এত অব্যবস্থিত-চিত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও ত দুষ্কর। যাহা হউক, সে বিবেচনা পরে করা যাইবে! এখন দেখিয়া আইস, কেমন আছে।"

"স্মেলিং-সল্টের শিশিটা লইয়া যাই" বলিয়া সনৎকুমার উঠিয়া

কক্ষের এক পার্শ্বে স্থিত ব্রাকেটের উপর হইতে সবুজ শিশিটা লইয়া পার্শ্বের ঘরে গেল।

পাঁচ ছয় মিনিট পরে সে আসিয়া বলিল, "গৃহিণী তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গেলেন; সে এখনও সুস্থ হইতে পারে নাই। মুখ এখনও বিবর্ণ—যেন রক্ত নাই। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বলিয়া দিলাম। বিস্ময়কর ব্যাপার বটে।" সনৎকুমারের মুখে এমন চিন্তার ভাব আমি আর কখনও লক্ষ্য করি নাই।

সনৎকুমারের পত্নী ফিরিয়া আসিয়া আমার মতেরই সমর্থন করিলেন, মঞ্জরীকে সহসা আনা ভাল হয় নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে—দশ বৎসরের শিক্ষায় কি তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! সে পাগ্‌লাম করিয়া পত্র লিখিয়াছিল, কিন্তু এখন আপনার কাজের ফল দেখিয়া আপনি মূর্চ্ছা গেল।

সনৎকুমার বলিল, "দেখ দেখি, ভাই! আমি কোনরূপ হাঙ্গামা 'পোহাইতে' পারি না। সেই জন্যই হাঙ্গামের সম্ভাবনা ঘটিতে না ঘটিতে মা আমাকে স্বতন্ত্র হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে একরূপ শান্তিতে ছিলাম। এখন আমার ঘাড়ে এ কি বোঝা চাপিল!"

আমি বলিলাম, "তুমি এত অস্থির হইলে চলিবে কেন?"

তাহার স্ত্রী বলিলেন, "উঁহার রকমই ঐ—কিছুই সহিতে পারেন না।"

সনৎকুমার বলিল, "সে কথাটা খুবই সত্য। ছেলেদের অসুখে আমি ত একেবারে বুদ্ধিহারা হইয়া যাই—উনিই সেবা-শুশ্রূষা সব করেন।"

আমি বলিলাম, "এক জন শক্ত হইলেই আর এক জনের নরম হইবার সুবিধা হয়।"

"এখন মঞ্জরীর সম্বন্ধে কি করা যায়?"

"তাহাকে একটু সামলাইতে দাও। যেরূপ দেখা গেল, তাহাতে তাড়াতাড়ি করিলে ফল উল্টা হইবে। ধীরে ধীরে বুঝাইতে হইবে; তবে আমি তখনও যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলি, যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের বিবাদের একটা মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।"

তাহার স্ত্রী বলিলেন, "আমিও তাহাই বলি।"

সনৎকুমার বলিল, "তোমরা যাহা ভাল বুঝ, কর; আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিয়া খালাস। যদি দরকার হয়—বল, আমি আর একটা বাড়ীর সন্ধান করি।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথায় যে হাসি রাখা দায় হইয়া উঠিল! একেবারে যে অধীর হইয়া পড়িলে! এমন একখানা বাড়ী ছাড়িলে আর সহজে পাইবে না। কল্য তোমার কাছে আদালতে সব খবর লইয়া, যেরূপ হয়, স্থির করিব।"

সনৎকুমারের ছেলে-মেয়ের কাছে বিদায় লইয়া বেশপরিধান করিয়া আমি গমনোদ্যোগ করিলাম। সনৎকুমার আমার সঙ্গে রাস্তায় কিছু দূর যাইয়া ফিরিল।

সে দিন আর কোনও মজলিসে যাইতে ইচ্ছা হইল না—বাড়ীর দিকেই চলিলাম—ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। উত্তেজনাপ্রবণ চঞ্চল-চিত্তের কি বিপদ্‌ই ঘটে! কিন্তু মঞ্জরীর জীবনের রহস্য কি? সে কি কেবল অকারণ উত্তেজনাতেই গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে? না, তাহার গৃহত্যাগের অন্য কোনও কারণ আছে? সে কি তাহার কৃত কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই? না, এখন সে গুরুত্ব উপলব্ধির

ফলেই আজ তাহার ভাবান্তর? মানুষের জীবনে এমন কত ঘটনা ঘটে, যাহা কল্পনারও অতীত। আমরা কারণ না বুঝিয়া—শুধু কার্য্য লক্ষ্য করিয়া যে উদ্দেশ্যের আরোপ করি, তাহা হয় ত একেবারেই ভিত্তিহীন। কিন্তু এই যে মঞ্জরী—গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—নারী-জীবনে সকল সুখের আশা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহার জীবনের রহস্য কি ভেদ করা যায় না?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর দিকে চলিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম, সনৎকুমারের সুখময় সংসারের কথা; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া সে কেমন সুখে আছে! সে কি সে সুখে থাকিতে জানে বলিয়াই? আর আমি? আমার হৃদয়ের দাবদাহ কিসে নিবারিত হয়?

আরও একটা কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম—সনৎকুমার বলিয়াছে, ভালবাসার যে বন্ধন রমণীকে সংসারে বদ্ধ রাখে, আমরা সে বন্ধন ছিন্ন করি কেবল উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য। কথাটা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু ভাবিবার মত করিয়া ভাবিতে পারি নাই—পারিলে আজ বিজন স্থানে—একা বসিয়া এই দুঃখ-কথা লিখিয়া হৃদয়-ভার লঘু করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইত না; সুখের সব সম্বল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত দুঃখই ভোগ করিতে হইত না; সব থাকিতেও আমাকে বনের পশুর মত নিঃসহায় অবস্থায় পথের পার্শ্বে মরিবার আশঙ্কা করিতে হইত না। সে দিন হৃদয়ে অভিমানের কুজ্ঝটিকা ছিল—সেই কুজ্ঝটিকার জন্যই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধ হয় নাই—সবই বিকৃত দেখিয়াছিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

পরদিন সনৎকুমারের কাছে জানিলাম, মঞ্জরী স্থির হইয়াছে। সনৎকুমার বলিল, "সে মামার উত্তেজনাপ্রবণতা পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার চিত্তের দৃঢ়তার অভাব নাই। তবে যে কেন সে কাল অমন হইয়া পড়িল, বলিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "হিন্দুর মেয়ে যখন স্বামীর উপর রাগ করিয়া এমন ভাবে স্বজনশূন্য পিত্রালয়ে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে, আর এখনও ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিতেছে, তখন তাহার চিত্তের দৃঢ়তা সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই দৃঢ়তাই তাহাকে ভ্রান্তিতে দৃঢ় না করে!"

তাহার পর আমি বলিলাম, "দেখ, আরও একটা কথা—সে যে নিতান্তই সামান্য কারণে এমন কাজ করিয়াছে ও করিয়া দুঃখিত হয় নাই, এমনও বোধ হয় না। এমনও হইতে পারে যে, এই ব্যাপারের পশ্চাতে অনেকগুলি কারণ সঞ্চিত হইয়া এই ঘটনা ঘটাইয়াছে।"

"সে সন্দেহটা স্বাভাবিক। কিন্তু সে রহস্য কে ভেদ করিবে?"

"যদি প্রয়োজন হয়, আমরাই সে চেষ্টা করিব। কিন্তু যাহাতে তত দূর যাইতে না হয়, প্রথমেই সে চেষ্টা করা যাউক।"

"গৃহিণী বলেন, যদি সব অপরাধই অপর পক্ষের হয়, তবুও মঞ্জরীকে

সহ্য করিতে হইবে। হিন্দুর মেয়ে যদি স্বামীর অপরাধটা উপেক্ষা না করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করে,—তবে সে যে স্বামীকে পাইবার জন্যই সাধনা করে, সেই স্বামীকেই হারায়। সেই জন্য তাহাকে সবই সহিতে হয়।"

"কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু মানুষও সব সময় সব সহ্য করিতে পারে না। মানুষের রাগও থাকে, অভিমানও থাকে। সেই সকলের বশে কখন কোনও কথায় হয় ত বিষম অনর্থ উৎপন্ন হয়।"

"হয় ত এ ক্ষেত্রে তেমনই কিছু হইয়াছে।"

"হাঁ, কথায় কথা বাড়িয়াছে,—ক্রোধের অগ্নিতে ইন্ধনযোগ হইয়াছে; অভিমানের বিষে ভালবাসা বিরক্তিতে পরিণতিলাভ করিয়াছে।"

"যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে উপায় কি?"

"কথায় ত বলে—It is never too late to mend—সংশোধনের সময় কখনও অতীত হয় না। যদি কোন পক্ষে যেমন করিয়াই হউক ভুল হইয়া থাকে, তবে তাহার সংশোধন হইতে পারে। না হইলে এই পিতৃমাতৃহীনা,—নিঃসহায়া কিশোরী—ইহার জীবনও চিরদুঃখময় হইবে।"

"গৃহিণীও ত সেই জন্যই ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন, মঞ্জরী আপনি আপনার যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার স্বরূপ বুঝিতেই পারিতেছে না।" তাহার পর হাসিয়া বলিল, "আর তিনি—একেধারে পাকা গৃহিণী,—বহুদর্শিনী—তিনিই তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিতেছেন!"

আমি বলিলাম, "জানই ত 'বয়সেতে বিজ্ঞ নয়,—বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে!' তা তোমার গৃহিণী বয়সে যাহাই কেন হউন না,—জ্ঞানে বিজ্ঞ বটেন।"

"আমি ত তাহা বলিতেই বাধ্য। তাহার উপর আবার তোমরা পাঁচ জন বলিলে,—ঐ যে একটি সম্বল লইয়া সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়াছি, ওটিরও মাথাটি বিগ্‌ড়াইবে।"

"মাথাটি যদি বিগ্‌ড়াইবার হইত, তবে এক ঘরের এক গৃহিণী হইয়া আগেই বিগ্‌ড়াইত। তাহা হইলে তুমি অমন 'ঘরমুখো' হইয়া থাকিতে না।"

"তুমি ত একেবারেই 'বাহিরমুখো'। তবে কি তুমি তোমার গৃহিণীর মাথার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছ? আমি কিন্তু এ কথা বলিয়া দিব।"

দুই দিন পরে সনৎকুমার আমাকে বলিল, "গৃহিণী বলেন, তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, মঞ্জরীকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলেন না যে, সে ভুল করিয়াছে, এবং ভুল না করিয়া থাকিলেও করিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি বলে?"

"সে অধিক কথা কহে না; কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলে, সে খুব ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে,—যাহা করিয়াছে সে জন্য সে অণুমাত্র অনুতপ্ত নহে। সে উত্তেজনাবশে এ কাজ করে নাই।"

"তুমি তাহার শিক্ষাদির কথা যাহা বলিয়াছ, তাহাতে কিন্তু মনে হয়, সে একেবারে বিবেচনা না করিয়া এত বড় একটা কাজ করে নাই। ইহার ফল যে সে একেবারেই বুঝিতে পারে নাই, এমন কি হইতে পারে?"

"তুমি, ভাই, এইবার আমার বাড়ী চল ; গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করিও। কাল ত আদালত বন্ধ ; কালই চল।"

"কাল—"

"সভা-সমিতি ? সে ত বৈকালে ? 'দুপুরে মাতনটা' ত এখনও বাকী আছে ? তুমি আমার বাড়ী যাইবে,—তথা হইতে সটান সভায় যাইয়া বক্তৃতা করিও। বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া যাইতে হয় না ত ?'

"ভাল, আমি কাল সকালে যাইব।"

পরদিন সনৎকুমারের গৃহে উপস্থিত হইয়া আমরা আবার কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার পত্নী বলিলেন, তিনি অনেক বুঝাইয়াও মঞ্জরীর মতের পরিবর্ত্তন করাইতে পারিলেন না ; সনৎকুমার তাহাকে এখনও কিছুই বলেন নাই।

সনৎকুমার বলিল, "বলে 'হাতী-ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে, কত জল ?'—উনি যাহা পারিলেন না, আমি তাহা পারিব ! আমি নূতন কি বুঝাইব ?"

সনৎকুমারের স্ত্রী বলিলেন, "ধারে কাটে, আর ভারে কাটে ; আমাদের কথার ধার থাকিলেও ভার থাকে না।"

"ধার খুবই আছে—সময় সময় গলায় হাত দিয়া দেখিতে হয়, গলা আছে কি না।"

আমি বলিলাম, "গলায়, না কানে ?"

"সে অনেক দিন গিয়াছে।"

সনৎকুমারের স্ত্রী বলিলেন, "না যাইয়া থাকিলেও এবার

যাইবে। ভগিনীটি যদি রাগ করিয়া স্বামীর ঘর ত্যাগ করেন, তবে সমাজের কাছে নাক-কান দুই-ই কাটা যাইবে।"

সনৎকুমার বলিল, "দাদা ত কোনও কথাই গায় মাখিলেন না। যত দায় কি আমার—আমি এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া বলিয়া? আমি ত বলিতেছি, না হয় চল, অন্য বাড়ীতে যাই। কলিকাতা সহরে আমারও আর একটা বাড়ী মিলিবে; এ বাড়ীরও আর একটা ভাড়াটিয়া জুটিবে।"

"মঞ্জরীর যে উপকারটুকু করিতে বলায় এত বিরক্তি—সেটুকু উপকার নিতান্ত পরও পরের করিয়া থাকে। তাই ত পরের কথা। তাহার আরও নিকট-আত্মীয় থাকিলে এ কাজ এত দিন বাধিয়া থাকিত না।"

সনৎকুমার যাহাতে বিব্রত হইতেছিল, তাহার স্ত্রী তাহা কর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতেছিলেন। পুরুষে ও নারীতে এই সব বিষয়ে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ স্বার্থের জন্য ব্যস্ত হয়—রমণী-হৃদয় সহজেই অপরের দুঃখে দ্রব হয়। আর সেই দ্রবীভূত করুণাস্রোতে সংসার স্নিগ্ধ ও সুন্দর হয়।

আমি বলিলাম, "আমারও সেই মত। আমি ত নিতান্তই পর, কিন্তু এ মনোমালিন্য মিটাইয়া দিবার জন্য আমারও ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে।"

সনৎকুমারের পত্নী বলিলেন, "সেই কথাটি বন্ধুটিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিউন।"

সনৎকুমার বলিল, "আচ্ছা, মঞ্জরীকে ডাক,—আমি যাহা বুঝাইতে পারি, বুঝাই।"

আমি বলিলাম, "তবে আমি উঠি ?"

"কেন ? আমাকে যদি মঞ্জরীর দাদার কাজই করিতে হয়, তবে তুমিও আমাকে সাহায্য কর। আমার আপনার ভগিনী থাকিলে সে কি তোমাকে লজ্জা করিত ? সে যদি এমন অবস্থায় পড়িত, তবে তুমি কি তাহাকে বুঝাইতে না ?"

আমি নিরুত্তর হইলাম। তাহার মা'র কথা আমার মনে পড়িল। আহারের আয়োজন সম্বন্ধে সনৎকুমারের পত্নী তাঁহার শ্বাশুড়ীর আদর্শেরই অনুসরণ করিতেন। পঠদ্দশায় কতবার সনৎকুমারের গৃহে গিয়াছি ; মা জানিতে পারিলে না খাইয়া আসিতে পারি নাই। তিনি আপনি ডাকিয়া, কাছে বসাইয়া আমাদের খাওয়াইতেন। আমার মা'র স্নেহ মৌন ছিল—সনৎকুমারের জননীর স্নেহ আমার পিসীমা'র স্নেহের মত মুখর ও উচ্ছ্বসিত ছিল। তিনি আমাদের—তাঁহার ছেলেদের—বিশেষ সনৎকুমারের—বন্ধুদের 'ঘরের ছেলে'র মতই দেখিতেন। সনৎকুমারের সহোদরা থাকিলে সে সত্যই আমাকে পর ভাবিয়া লজ্জা করিতে পারিত না—সনৎকুমারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা এতই অধিক।

সনৎকুমারের পত্নী মঞ্জরীকে আনিতে গৃহের অপর অংশে গমন করিলেন। সনৎকুমার আমাকে বলিল, "এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! কি বুঝাইব ? অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া—বিজ্ঞ সাজিয়া লোককে বুঝাইতে হইবে ভাবিলেও আমার হাসি পায়। তাহার অপেক্ষা বিনা পয়সায় মক্কেলের ছেঁড়া মামলা করিতে যাইয়া জজের ধমক খাওয়াও ভাল।"

"যদি বিনা পয়সার মক্কেলও ছেঁড়া মামলা লইয়া আমাদের মত উকীলের কাছে আইসে।"

সেই কথা লইয়া আমরা দুই জনে হাসিতেছিলাম, এমন সময় মঞ্জরীকে লইয়া সনৎকুমারের পত্নী ফিরিয়া আসিলেন। মঞ্জরী সে দিন যে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজও সেই দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। আজ বোধ হয়, সে জানিত, আমি উপস্থিত আছি। তাহার পরিধেয় বস্ত্র অবগুণ্ঠনের মত তাহার মস্তক আবৃত করিয়াছিল—তাহার চিক্কণ কৃষ্ণ পাইড় যেন তাহার চিক্কণ কৃষ্ণ কেশের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার মুখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন ছিল না—সে স্থির হইয়া আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। সে মস্তকের উপর হইতে অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া দিতে যাইতেছিল। সনৎকুমার বলিল, "বিকাশকে দেখিয়া অত লজ্জা করিও না—ও আমার ভাইয়েরই মত। আমার সব কথাই উহার জানা আছে; তোমার কথাও আমি উহাকে সব বলিয়াছি।"

মঞ্জরী অবগুণ্ঠন আর টানিয়া দিল না—হর্ম্ম্যতলবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সনৎকুমার বলিল,—"তোমার বৌদিদি যাহা বলেন. বিকাশও তাহাই বলে—এমন করিয়া রাগ করিয়া থাকিলে তোমারই ক্ষতি। আমাদের সমাজের যে ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থা না মানিলে কষ্ট পাইতেই হইবে। যদি সকলে সে ব্যবস্থা না মানে, সে এক কথা; কিন্তু একা সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাওয়া আর পাথরের প্রাচীরে মাথা ঠুকা সমান।"

মুহূর্ত্তের জন্য মঞ্জরীর মুখে লজ্জার রক্তাভা বিস্তৃত হইয়া তাহার কর্ণমূলে যাইয়া মিলাইয়া গেল। সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সনৎকুমার আমাকে বলিল, "কি বল, বাইকাশচন্দর ?"

বাঁধা বুলীতে সভায় বক্তৃতা করায় আর এক জন স্ত্রীলোককে বুঝানয় কত প্রভেদ, তাহা আমি খুবই অনুভব করিতেছিলাম। আমি কি বলিব ? কিন্তু কিছু না বলিলেও ত নহে। আমি বলিলাম, "আপনি একটু শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। দোষ গুণের বিচার না করিয়া ভবিষ্যতের কথাই ভাবিয়া দেখুন।"

সনৎকুমার আমাকে বলিল, "তুমি একটি জানোয়ার ! মঞ্জরীকে 'আপনি' 'মশাই' করিতেছ। ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।"

আমি বলিলাম, "কথাটাই এই যে, যে স্থানে একটু অন্যায় সহ্য করিলেও চিরদিন শান্তির উপায় হয়, সে স্থানে অন্যায়ও না সহিলে সব সময় চলে না।"

কিন্তু মঞ্জরীকে বুঝাইবার সময় বিজ্ঞের মত যাহা বলিয়াছিলাম, আপনি আপনার কাজে তাহা করিতে পারি নাই। আন্তরিকতাহীন কথা যে মঞ্জরীর হৃদয় স্পর্শ করে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

বলিবার কথা ফুরাইয়া গেল। মঞ্জরী যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সনৎকুমারের পত্নী আমাদের কার্য্যতৎপরতায় উপহাসের হাসি হাসিতেছিলেন। সনৎ-কুমার বিব্রত হইতেছিল। আমি আরও বিব্রত হইয়া অতিরিক্ত মনোযোগ সহকারে তাহার ছেলের কাছে তাহার মোটর-গাড়ী

ভাঙ্গিবার বিবরণ শুনিতেছিলাম—যেন সেই দুর্ঘটনায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

শেষে আমি ঘড়ী দেখিয়া বলিলাম, "আমাকে যাইতে হইবে।" তাহার পর আমার সঙ্গে সনৎকুমারের সাক্ষাৎ হইলেই সে বলিল, "বাইকাশচন্দর, আমার গৃহিণী বলিয়াছেন, তিনি আমাদের সভা-সমিতির স্বরূপ বুঝিয়াছেন। যে সভায় তোমার মত বক্তার আদর হয়, সে সভা খুব জবর বটে। তিনি বলেন, তোমাদের সভা-সমিতি বোধ হয় সংবাদপত্রের কল্পনাতেই থাকে—আসলে সব ফক্কিকার। তোমার জন্য আমার যে বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিল!"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আমার পক্ষসমর্থনে বলিবার কিছুই নাই। আমাদের বক্তৃতায় যে কোনও কাজ হয় না, তাহার কারণই ত আমাদের কাজে আন্তরিকতার অভাব।"

"তবে বাড়ীতে শুইয়া না থাকিয়া ছুটাছুটি করিয়া মর কেন?"

ইহার উত্তর আমি কি দিব? আমি যে কেন তাহার মত গৃহের আকর্ষণেই আকৃষ্ট হইয়া বাহিরের কাজকে বাজে কাজ বলিয়া মনে করিতে পারি না, তাহা যে কাহাকেও বুঝাইতে পারি না—বহ্নিদাহে কেবল আপনিই দগ্ধ হই।

কিন্তু মঞ্জরীর ভাবনা ক্রমে আমাদের উভয়কেই আকৃষ্ট করিতে লাগিল। আমরা উভয়েই যুবক—কাহারও যৌবন-সুলভ উৎসাহের অভাব ছিল না; বরং আমরা সে উৎসাহ সুপ্রযুক্ত করিবার অবকাশই পাইতেছিলাম না—বিশেষ আমি। তাই আমি যে কাজে আমার কোনও আকর্ষণই ছিল না, তাহাতেই আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া সেই দিকে

আকৃষ্ট হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম—আপনাকে আপনি ভুলাইতে-ছিলাম। এমন সময় মঞ্জরীর কাজ আসিয়া পড়িল। আমরা সোৎ-সাহে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম; মনে করিলাম, একটা বড় কাজ করিতেছি—সে সংসার-জ্ঞানের অভাবে আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছিল, আমরা তাহাকে রক্ষা করিতেছি। এইরূপ বিশ্বাসে আমরা ভুলিয়া যাইতেছিলাম যে, আমাদেরও সংসার-জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ; মানব-চরিত্রের জটিল রহস্যভেদের ক্ষমতা যে অভিজ্ঞতা ব্যতীত অর্জ্জিত হইতে পারে না, আমরা সে অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের কোনও সুযোগই পাই নাই; মানুষ সুখের যে সব উপাদানের জন্য সাধনা করে, আমরা উভয়ে তাহা অনায়াসে পাইয়াছিলাম—সনৎকুমারের সুখে সামান্য অন্তরায় ভ্রাতার ব্যবহার, সে পিপীলিকা-দংশন-যাতনা পত্নীর প্রেমে—সন্তানের প্রতি স্নেহে দূর হইয়া গিয়াছিল—আমার সুখের অন্তরায় বিলোলার ব্যবহার; জগতে যাহারা সত্য সত্যই দুঃখী, তাহাদের দুঃখের তুলনায় আমার এ দুঃখ অমার অন্ধকারের তুলনায় প্রভাতের কুজ্ঝটিকা—বিবেচনার বাতাসে তাহা দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যাইতে পারিত। সুতরাং আমাদেরও সংসার-জ্ঞানের প্রচুর অভাব ছিল। কিন্তু সে অভাব উৎসাহের আতিশয্যে পূরিত হইয়াছিল। আবার সনৎকুমারের পত্নীর করুণাপ্রণোদিত উৎসাহ আমাদের উৎসাহপ্রবাহকে সর্ব্বদাই পূর্ণ ও পুষ্ট করিয়া রাখিত।

আমি কাজ করিয়া ভুলিয়া থাকিতে চাহিতেছিলাম। যে কাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম, সে কাজে চেষ্টার্জ্জিত উৎসাহের অভাব

জন্মিতেছিল—আর সভাসমিতি, বক্তৃতা, পরামর্শ ভাল লাগিতেছিল না। এ একটা নূতন কাজ। সুতরাং ইহাতে নূতনের মোহ ছিল।

কিন্তু কেবল যে নূতনের মোহেই আমি এই কাজে আকৃষ্ট হইতে-ছিলাম, তাহা নহে; কাজের আকর্ষণও ছিল। যত দিন যাইতেছিল, মঞ্জরীর সঙ্কোচও তত কমিতেছিল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাহার নয়নে প্রতিভার দীপ্তি-চাঞ্চল্য; আননে বয়সের অনুপযোগী বিষাদগাম্ভীর্য্য; ব্যবহারে এক দিকে অসাধারণ সরলতা, অপর দিকে অসাধারণ ধীরতা। সে যেন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তাহার ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, তাহার হৃদয় স্বচ্ছ-সলিল সরোবরের মত স্বচ্ছ—তাহাতে লুকাইবার কিছুই নাই—কিছুই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহাতে যে রহস্য প্রচ্ছন্ন, আমরা কিছুতেই তাহার সন্ধান পাইতেছিলাম না—কেবল সন্ধানই করিতেছিলাম। আমাদের উপদেশ সে শুনিত—তর্ক করিত না, প্রতিবাদ করিত না—যেন আমাদের আলোচনায় সঙ্কোচ বোধ করিত। কিন্তু কিছুতেই আপনার ত্রুটী স্বীকার করিত না—কিছুতেই আপনার মতপরিবর্ত্তন করিত না। ইহাতে আমাদের বিস্ময় বর্দ্ধিত হইত।

সনৎকুমারের পত্নীই প্রথম তাহার ব্যবহারে এই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে, এত বুঝাইয়াও যখন মঞ্জরীর মতপরিবর্ত্তন করা গেল না, তখন ভিতরে এমন কিছু আছে, যাহা সে প্রকাশ করিতে পারে না, এবং সে প্রকাশ না করিলে আমরাও আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারি না; কারণ, রোগের নিদান নির্ণীত না হইলে ঔষধ দেওয়া অসম্ভব। আমিও সেই মতে মত দিলাম।

সনৎকুমার কিন্তু আমাকে বলিল, "তোমাকে লোক পরামর্শ করিতে ডাকে কেন? তুমি খাবার—ঘুষ খাইয়া গৃহিণীর মতেই মত দাও। তুমি ঘুষখোর। যখন মঞ্জরী আমাদের কথার প্রতিবাদ করে না, তখন এমনও ত হইতে পারে যে, সে আপনার ভুল বুঝিয়াছে। সে ত আর এখন সাধিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে না। এখন হয় ত তাহারা লইতে আসিলেই যায়।"

আমি বলিলাম, "তুমি একবার যাইয়া তাহাদের ভাবটা বুঝিয়া আইস।"

"এ ত কথা কহিলে যে, পাত কাটিবে সে?"

"তুমি কি বল, পাত-কাটার লোকের জন্য ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে?"

"বলিলেই বা তোমরা শুন কই?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নিষেধ

রবিবার বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে সনৎকুমারের চাকর আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, "মা ঠাকরুণ আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন।"

সনৎকুমারের বাড়ীতে আমার এমন তলব নূতন—তলব বরাবর সে নিজেই দিয়াছে। এবার তলব তাহার স্ত্রীর। আমরা পূর্ব্বদিন স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম, রবিবার প্রাতে সনৎকুমার একবার ভবানীপুরে মঞ্জরীর শ্বশুরালয়ে যাইবে—তাহাদের ভাব বুঝিয়া যে ব্যবস্থা হয়, করিতে হইবে। তাহার স্ত্রীর তলব পাইয়া আশঙ্কা হইল, সংবাদ ভাল নহে। "আমি যাইতেছি"—বলিয়া সনৎকুমারের ভৃত্যকে বিদায় দিলাম।

রবিবারে সকলের ছুটী—দাদাদের আফিস বন্ধ, আমার আদালত বন্ধ, ছেলেদের স্কুল-কলেজ বন্ধ। বাবা, কাকাবাবুর আমল হইতে ছুটীর দিন আমাদের বাড়ীতে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া আহারের প্রথা প্রচলিত—অন্য দিন যাঁহার যখন কাজ, তাঁহাকে তখনই বাহির হইতে হইত; কেবল মেজদাদার স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে কাকাবাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আহারে বসিতেন। ছুটীর দিন আহারের আয়োজনও অপেক্ষাকৃত অধিক হইত—কাজেই খাইতে বেলাও একটু অধিক হইত। সংসারের সপ্তাহের কাজের ব্যবস্থাও সেই দিন হইত। পিসীমা, জ্যেঠাইমা, মা আমাদের কাছে আসিয়া বসিতেন

—মেয়ের বিবাহ, তত্ত্ব, লৌকিকতা, মেয়েদের আনা ও পাঠান—সব কথাই সেই সময়ে আলোচিত হইত। সুতরাং আমার সনৎকুমারের বাড়ী যাইতে বিলম্ব হইবে। সে বিলম্বের জন্য আমার অধীরতা ছিল না; কেন না, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ছুটীর দিন সকলে একসঙ্গে বসিয়া আহারের আনন্দ-উপভোগে অভ্যস্ত—কোনও কারণে কোনও দিন সে আনন্দ উপভোগের অন্তরায় উপস্থিত হইলেই আমরা বিরক্ত হইতাম। কিন্তু আজ আমার পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছিল, আমার যাইতে বিলম্ব হইতেছে। বলিয়াছি, মঞ্জরীকে তাহার স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ হইতে রক্ষা করার কাজটায় আমি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। কাজটা আমার ভাল লাগিতেছিল। রাজনীতিক আন্দোলনের মদিরার নেশা আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই; আমি সাধ করিয়া মাতাল সাজিতেছিলাম—মাতালের অভিনয় করিতেছিলাম। কিন্তু এবার এ কাজে যেন সত্য সত্যই একটা নেশা অনুভব করিতেছিলাম। স্বামিস্ত্রীর মনোমালিন্যে মানুষের জীবন কিরূপ বেদনাময় হয়, আপনার লব্ধ অভিজ্ঞতায় তাহা বুঝিয়াই আমি মঞ্জরীর কল্যাণকর কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম কি না, তাহা আজও ভাল বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমারও অজ্ঞাতে আমার অভিজ্ঞতা আমার হৃদয়ে মঞ্জরীর জন্য সহানুভূতির উৎস রচিত করিয়াছিল। নহিলে আমার স্বভাবতঃ শিথিল হৃদয়ে এ কার্য্যে এমন উৎসাহ সঞ্চারিত হইত না। কিন্তু আমি তখনও সে উৎসাহের কারণ বুঝিতে পারি নাই, আজও তাহার কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারি নাই।

আমাদের আহার শেষ হইতে না হইতে অনুকূল আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অল্পক্ষণমধ্যেই বাহির হইবার জন্য আমার ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বাহির হইবে নাকি ?"

আমি একটু লজ্জিতভাবে বলিলাম, "হাঁ।"

"তোমার এ 'ভারত-উদ্ধার' কবে শেষ হইবে ? তোমরা যত জন যে ভাবে লাগিয়াছ, তাহাতে যে এত দিনে গোটা এসিয়ার উদ্ধার হইয়া যাইবার কথা !"

"সারা জগতের উদ্ধার নহে ত ?"

"যাহাই হউক, উদ্ধার কাজটা শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া ফেল। তোমার ত টিকি দেখিবার আশা করা যায় না—সপ্তাহে এক দিন ছুটী, সে দিন বাড়ী আসিলেও তোমায় পাওয়া যাইবে না। এ ত আর চলে না ! আমাদের কাছে যেমন ডুমুরের ফুল হইতেছ, ছোট গৃহিণীর কাছেও ত তেমনই ? আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিলোলা কড়া করিয়া রাশ ধরিতে পারিবে—তোমায় সায়েস্তা করিতে পারিবে। এখন দেখিতেছি, বিপরীত। এটা কিন্তু ভাল নহে—ভাল নহে ?"

"তিনি ত তোমারই নির্ব্বাচিতা—আর অপর্ণার শিষ্যা। তাঁহার ক্রটীর জন্য ত তোমরাই দায়ী।"

"হাঁ। এইবার তাঁহার গুরুটিকে সে কথা বলিয়া—শিষ্যার কানে ভালরূপ ইষ্টমন্ত্র দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনি যদি সংসারের সুখভোগ করিতেই না পারিলে, তবে ছাই বক্তৃতা করিয়াই কি সুখ পাও ! এমন লোকও ত দেখি নাই ! তোমার মত লোক কতগুলি আছে ?"

"অনেক।"

"না। তোমার দলের আরও লোককে আমি জানি—অবশ্য সকলে আবার 'বড়কুটুম্ব' নহে। তাহারা তোমার মত নহে—আপনারটি বেশ বুঝে; হাতের পাঁচ রাখিয়া তবে রং খেলে—অর্থাৎ স্বার্থটি রাখিয়া—স্বার্থের জন্যই গলাবাজী করে।"

"কেবল বুঝি আমিই হংসের দলে বক—চতুরের দলে আহাম্মুক?"

"তুমি একা নহ; তবে তোমাদের দলের সকলে তোমার মত নহেন। আমি তোমাকে আহম্মুক বলি না—কারণ, জগতে সব বড় কাজই এইরূপ আদর্শ-পাগল স্বপ্নাবিষ্ট লোকের দ্বারা হইয়াছে। আমরা চাকরী করি বটে; কিন্তু এককালে ইতিহাসও পাঠ করিয়াছিলাম। কাজটা সিদ্ধ হইলে লোক তাহাদিগকে পূজা করে—অসিদ্ধ থাকিলে উপহাস করে। আর আত্মীয়-স্বজন যাহারা ইতরজনের মত মিষ্টান্নই সন্ধান করে, তাহারা আত্মীয়-স্বজনকে সংসারে ও সম্পদে সুখী দেখিলেই সুখী হয়।"

"তোমার যদি যাইবার দরকার থাকে, তুমি যাও, আমি আর এক শালার স্কন্ধে যাইয়া ভর করি"—বলিয়া অনুকূল আমার ঘর হইতে বাহির হইল; বাহির হইবার সময় ঠাট্টা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, সারাদিনই ত বাহিরে থাক—ফিরিতে রাত্রি হয়; শেষে ছেলেটাকে বাপ চিনাইতে হইবে না কি?"

আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

সনৎকুমারের গৃহে উপস্থিত হইয়া আমি তাহার ছেলেমেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে উপরে উঠিলাম। সে তাহার বসি-

বার ঘরেই বসিয়া ছিল। তাহার স্ত্রীও সেই ঘরে ছিলেন; তিনি ছোট ছেলেটিকে কোলে লইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। তিনি হাসিতেছিলেন। সনৎকুমারের মুখে বিরক্তিভাব।

আমি একখানি চেয়ার টানিয়া বসিবার পূর্ব্বেই সনৎকুমার বলিল, "তোমাদের বুদ্ধিতে আমার কেবল 'মার খাইতে' বাকি রহিল!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটাই বল।"

"অসম্ভব—অসম্ভব।"

"অসম্ভবকে সম্ভব করাই ত মানুষের কাজ।"

"কতগুলা অসম্ভব সম্ভব করিয়াছ?"

"চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। আমাদের সঙ্গে যে সত্যেন্দ্রনাথ সেন পড়িত, তাহাকে তোমার মনে আছে?"

"যে এখন সরকারী হিসাব-বিভাগে বড় চাকরী করে, সেই ত?"

"হাঁ? মনে আছে ত, যে অঙ্কটা যত কঠিন, সেটা কষিতে তাহার যত আনন্দ ও তত জিদ হইত? এ কাজে আমার তেমনই হইতেছে।"

"আমার মোটেই জিদ বা আনন্দ হইতেছে না। সুতরাং তুমি এবং যাঁহার খাবার খাইয়া তুমি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ, সেই বান্ধবীটি যাহা করিতে হয় কর। আমাকে ছাড়িয়া দাও, তবে আমার লব্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করিলে তোমাদেরও আর উৎসাহ থাকিবে না।"

"সেই অভিজ্ঞতাটা কি, বল। জামাটা খুলিয়া ফেল—পিঠে প্রহারের চিহ্ন নাই ত ?"

"প্রায় তাহাই।"

সনৎকুমার তাহার অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিল। সে মঞ্জরীর শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল—কথায় কথায় তাঁহাদের মনের ভাব জানিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে যে ব্যবহার পাইয়াছে, তাহাতে সে আমাদের উদ্দেশ্য-সাফল্যের সব আশাই ত্যাগ করিয়াছে। মঞ্জরীর স্বামী একটা বিরাট বিধবাপুরীর সবে-ধন নীলমণি,—সে সেই বিধবাপুরীর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত—অপমানিত হইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, "নারীদেশে অর্জ্জুনের বিপদের আভাস পাইয়া আসিয়াছি; সে কি অবলা! বিষম প্রবলা। আমাকে চর সাব্যস্ত করিয়া যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মঞ্জরীকে হাতে পাইলে তাহারা হাতেই মাথা কাটিবে।"

"তোমার মাথা যে কাটে নাই, তাহাই আমাদের পরম ভাগ্য। সে বোধ হয়, তোমার ঠাকুরাণীটির পুণ্যবলে, আর 'নোহার' জোরে।"

"উঁহাকে একবার পাঠাইয়া দাও। দেখিয়া আসুন, ব্যাপার কেমন।"

"মঞ্জরীর স্বামীর সঙ্গে কোনও কথা হইয়াছিল ?"

"সে একটি প্রকাণ্ড আহাম্মুক।"

"মুখের উপর বলিলে তোষামোদ করা হয়—তুমিও একটি তাহাই।"

সনৎকুমারের স্ত্রীর হাসির মাত্রা বাড়িতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অপরাধ?"

আমি বলিলাম, "অপরাধ এই যে, সে আহম্মুককে পাইয়াও তুমি মহামান্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল আসল ব্যাপারটা বাহির করিতে পারিলে না!"

"আ—রে আমার কপাল! সে কি সেই রকমের লোক? গণ্ডা দুই প্রবলা বিধবার আওতায় যে বাড়িয়াছে, তাহার কি একটা মতামত থাকে? যে হাই তুলিলে সাতটা তুড়ি পড়ে, হাঁচিলে সাতটা 'জীব' উচ্চারিত হয়, মেয়েদের মুখে শুনিয়া সত্য সত্যই বিশ্বাস করে, সে ইচ্ছা করিলেই বাঙ্গালার যত কন্যাগ্রস্ত (কন্যাদায় আমি মানি না) পিতা তাহাকে কন্যা দান করিয়া কৃতার্থ হইবেন—সে কি মানুষ যে, সে আসল ব্যাপার বুঝিবে ও বুঝাইবে?"

"তবে তাহার সঙ্গে তোমার কোনও কথাই হয় নাই?"

"হয় নাই—বলিও না; হইতে পায় নাই। আমি বাড়ী ঢুকিতে না ঢুকিতে সে কথা প্রচার হইয়াছিল; বাড়ীর 'আহ্লাদেগোপাল'—তেড়ীকাটা, পানের রসে রাঙ্গা ঠোঁট চাকর তখনই সে সংবাদ প্রবলা-মহলে দাখিল করিয়াছিল। আমি যাইয়া বৈঠকখানার বাবুটির কাছে বসিতে না বসিতে সেই মহলে আমার তলব। আর তথায় কেবল ঝাঁঝাল গালি।"

"বাবুটি তথায় ছিলেন?"

"ছিলেন বৈ কি? তিনি দাঁড়াইয়া আমার দুর্দ্দশা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলাম, তিনি বাড়ীর কর্ত্তা নহেন—মেয়েদের ভয়েই অস্থির। মধ্যে মধ্যে মেয়েরা 'তুই যে কিছুই বলিতেছিস্ না?'—বলিলে

তিনি মেয়েদের কতকগুলা কথায় পুনরুক্তি করিতে লাগিলেন। মেয়েদের মুখে ঝড়ই বহিতে লাগিল ; সে ঝড়ে গালির ধূলায় আমার মুখ পূর্ণ হইয়া গেল।"

"তুমি যে বড় স্থির হইয়া ছিলে ?"

"তোমাদের উপদেশে। কিন্তু যখন মামার বংশ সম্বন্ধে নানারূপ কথা উচ্চারিত হইতে লাগিল, তখন আমার পক্ষে আর তথায় অবস্থান কষ্টকর হইয়া উঠিল। শেষে চাকরটা যখন 'চিপটিনিকাটা' কথা কহিতে আরম্ভ করিল, তখন বুঝিলাম, হাতের ছড়ী আর মাটীতে রাখিতে পারিতেছি না। তাই ধৈর্য্য হারাইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিলাম।"

"কিছু বলিয়া আসিলে ?"

"এইমাত্র বলিয়া আসিলাম যে, মামার অনেক পুণ্য ছিল, তাই তিনি মরিয়া বাঁচিয়াছেন।"

"তিনি ত মরিয়া বাঁচিয়াছেন—মেয়েটিকে বাঁচাইবার উপায় কি ?"

"কোনও উপায় নাই।"

"একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলে ? 'আজিকে বিফল হ'ল, হ'তে পারে কাল'।"

"আজ ত আমি বিফল হইয়া আসিয়াছি ; কাল তুমি যাইও।"

"তাহাই হইবে।"

সনৎকুমার বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম, "আমি আর একটা পথের সন্ধান পাইয়াছি। তুমি যে বিধবাপুরীর ভয়ে কম্পিত, সেই বিধবাপুরীর বিধবাদিগের

মধ্যে এক জন দিদির মামী-শ্বাশুড়ী—তিনি মঞ্জরীর দিদিশ্বাশুড়ীর ভগিনী। সুতরাং ভৈরবী-চক্রে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। আবার, পিণ্ডের লোভে তিনি দিদির স্বামীকে স্নেহ করেন (আসলে বোধ হয়, ভয়ই করেন)। দিদির স্বামী শনিবারে কলিকাতায় আসিতেছেন—আমি তাঁহাকে ধরিয়া বৈতরণী পার হইবার চেষ্টা করিব।”

সনৎকুমার বলিল, “সে ভাল। সদর-দরজা ত বন্ধ; এখন খিড়কীর দরজা যদি খুলা পাও। কিন্তু বৈতরণী পার হইতে হইলে চক্ষু মুদিয়া যাইতে হয়।”

“সে ত’ বটেই।”

“তুমি এ সন্ধান পাইলে কোথায়?”

“পিসীমা থাকিতে সন্ধানের ভাবনা কি? কথায় কথায় কথা পাড়িতেই তিনি তাহাদের সাত পুরুষের সংবাদ দিয়া দিলেন। আর একটি মজার খবর দিলেন—মেয়েরা সকলেই বলে, ছেলেটি বড় ভাল—‘শাপ-ভ্রষ্ট’; ক্রমে ছেলেটি আপনাকে একটা অসাধারণ মানুষ মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর সকলে মিলিয়া তাহার স্বাস্থ্যের অত্যধিক তত্ত্ব লওয়ায় তাহার মনে হইয়াছে—তাহার অসুখ লাগিয়াই আছে; সে কেবলই ঔষধ সেবন করে।”

সনৎকুমার হাসিয়া বলিল, “লোক যে বলে, ‘অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি’—সে কথা ঠিক। জন্মে কখনও পল্লীগ্রামে যাও নাই—কিন্তু তবুও আছ ‘পাড়াগেঁয়ে ভূত’। ঐ যে অসুখ—অসুখ;—ঔষধ খাওয়া, উহাও একটা বনিয়াদী চাল। আমার কথায় বিশ্বাস

না হয়, ঐ যে তোমার বান্ধবীটি আমি আসা হইতে কেবল আমার দুর্দ্দশায় হাসিতেছেন, উঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

"তুমি যখন বনিয়াদী না হইলেও আধা-বনিয়াদী, তখন তোমার কথাই মানিয়া লইলাম।"

"কিন্তু আমি বলি, যাহাই কেন কর না, যাহাতে তথায় ছোট-খাট অত্যাচারে—'অস্তরটিপ্‌নীতে' মঞ্জরীর জীবন অতিষ্ঠ না হয়, তাহার কি করিবে?"

"আগে দাঁড়াইবার জায়গাই পাই, তাহার পর বসিবার ব্যবস্থা হইবে।"

আমি উঠিবার উদ্যোগ করিলে সনৎকুমারের ছেলে আসিয়া বলিল, "মা বলিতেছেন, ঘরে কিন্তু খাবার হইয়াছে!"

সনৎকুমার হাসিয়া বলিল, "তোমার সভার সময় যায়,—তুমি যাও; আর বিলম্ব করিও না।"

আমি বলিলাম, "সভায় পেট খালি করিতে হয়—এখানে ভরার ব্যবস্থা। সুতরাং আমি সুবুদ্ধির মত এখানেই বসিলাম।"

"খাবার চাপা পড়িলে যে বক্তৃতা বাহির হইবে না! তাহার কি?"

"আমি সে ব্যবসা ছাড়িয়া দিব।"

"পারিবে না। অনেকে বলে, কিন্তু পারে না। পাতিহাঁস পানা-পুকুরের পাহাড়ে দাঁড়াইয়া যতই কেন বলুক না, সে আর জলে নামিবে না, সে কি না নামিয়া থাকিতে পারে? ঢাকের বাজনা শুনিলেই চড়কের সন্ন্যাসীদের পিঠ সুড়সুড় করে।"

"বাজি? আমি আজ সভায় যাইব না।"

"বাজি ত, তোমার আগেই জিত হইয়াছে। কেন না, গৃহিণী খাবার আনিতে গিয়াছেন।"

বাস্তবিকই আমি সে দিন কোনও সভায় যাইলাম না। যে আকর্ষণ শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে লাগিলাম।

সপ্তাহকাল ধরিয়া আমরা তিন জন পরামর্শ করিতে লাগিলাম—কেমন করিয়া কাজ করিতে হইবে? কোন্ বাধা পাইবার সম্ভাবনা? কেমন করিয়া সে বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, ইত্যাদি। উৎসাহের আতিশয্যহেতু আমাদের আশার অভাব হয় নাই। দিদির স্বামীকে কতখানি কথা বলিতে হইবে—কতটুকু বলা নিষ্প্রয়োজন, সে সব বিচার চলিতে লাগিল। আমরা মঞ্জরীর কাছে এ সব কথা গোপন করিতাম না। গোপন করিব কেন? আমরা লুকোচুরি ভালবাসি না—বিশেষ, সে সব কথা জানাই ভাল। সে আমাদের কোনও প্রস্তাবের প্রতিবাদ না করায় ক্রমে আমার—এমন কি, সনৎকুমারের স্ত্রীরও বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল—সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে; স্বামীর গৃহে ফিরিয়া যাইবার পথ পাইলেই ফিরিবে। আমরা সোৎসাহে সেই পথ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার ভগিনীপতির পত্রও আসিল—তাঁহার ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে। তিনি শুক্রবারে কর্ম্মস্থান হইতে রওনা হইবেন—শনিবারে কলিকাতায় পঁহুছিবেন। আমি সেই দিনই তাঁহার সঙ্গে সব কথা বলিয়া ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিব। শুক্রবার সন্ধ্যায় আমি সনৎকুমারের গৃহে এই কথা বলিয়া আসিলাম। সে দিনও মঞ্জরীর ব্যবহারে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলাম না।

সে অন্যান্য দিনেরই মত স্থির-ধীর। কিন্তু শনিবার সকালের ডাকে তাহার একখানি পত্র আমার হস্তগত হইল। আমাদের সকল সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে আমাদিগকে তাহাকে 'রক্ষা' করিবার চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়াছে। তাহার নিষেধ অকারণ নহে। পত্র পাঠ করিয়া আমি বুঝিলাম—আমরাই ভুল বুঝিয়া ভুল করিতে যাইতেছিলাম; সে ভুল করে নাই। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃঢ়তায়—ধৈর্য্যে—স্থৈর্য্যে—সহ্যগুণে—সঙ্কল্প-নির্দ্ধারণ-নৈপুণ্যে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। আর সেই জন্যই তাহার বেদনায় আমার সহানুভূতি আরও বর্দ্ধিত হইল।

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জীবন-রহস্য

পত্রের আরম্ভে মঞ্জরী লিখিয়াছে—"এক দিন বিপন্ন ও কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া উত্তেজনাবশে আমি—অপরিচিতা—আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তখন মনে করি নাই, আপনি সত্য সত্যই আমাকে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতে আসিবেন। তাই যে দিন আপনি প্রথম আসিয়াছিলেন, সে দিন অসম্ভবকে সম্ভব দেখিয়া—আমার কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিয়া—লজ্জায় ও আক্ষেপে বিহ্বল হইয়াছিলাম। কিন্তু আপনি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন; কেবল যে ক্ষমা করিয়াছেন, এমনই নহে, আমার কল্যাণ-কামনায় অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। আপনি সনৎ দাদার বন্ধু। তিনি আমার মঙ্গলের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, আমার সহোদর থাকিলে তিনিও সেরূপ চেষ্টা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আর বৌদিদি ও আপনি, আপনারাও দয়াপরবশ হইয়া আমার জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, আমি তাহার উপযুক্ত কি না সন্দেহ। আপনাদের সে যত্ন ও সে চেষ্টা আমার মত জন্মদুঃখী—পৃথিবীর আবর্জ্জনার জন্য ব্যয়িত না হইয়া যোগ্যতর কার্য্যে ব্যয়িত হইলে তাহাতে অনেক সুফল ফলিত। আপনাদের স্নেহের ঋণ আমি শোধ করিতে পারি না; কিন্তু সেই স্নেহ আমার দগ্ধ জীবনে সুখের প্রলেপ দিয়াছে। মানুষের প্রকৃতির একরূপ পরিচয় পাইয়া

সমাজের সব শাসন ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছিলাম—জীবনে যাতনার দাবানল লইয়া আসিয়াছিলাম; আর আপনাদের ব্যবহারে মানব-প্রকৃতির আর এক রূপের পরিচয় পাইয়াছি, বুঝিতে পারিয়াছি—বাবার ব্যবহারে মানুষের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলাম, সে ধারণা ভ্রান্ত নহে—এ সংসারে দুঃখীর জন্য সহানুভূতির অভাব নাই। বুঝিতে পারিয়া আমার অবস্থায় যেটুকু শান্তি লাভ করা সম্ভব, সেটুকু শান্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার অদৃষ্টে শান্তিলাভ নাই। তাই আজ সে জন্য আপনাদিগকে চেষ্টা করিতে নিষেধ করিতেছি। সেই জন্য আজ আর কোনও উপায় না পাইয়া আমার আপনাকে পত্র লিখিতেছি।

"মানুষের—বিশেষ, স্ত্রীলোকের জীবনের সব কথা—সব ব্যথা ব্যক্ত করিবার নহে। তাই আমি আমার কথা ব্যক্ত করিতে পারি নাই। যাঁহার কাছে জীবনে কোনও কথা গোপন করি নাই, আমার ব্যথাই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ। আর যাঁহাকে সব কথা জানাইয়া স্ত্রীলোক শান্তি ও সান্ত্বনা পায়—তিনিই আমার দুঃখের কারণ। তাই বলিয়াছি, আমার অদৃষ্টে শান্তিলাভ নাই। কিন্তু আপনারা আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আপনারা যদি আমার এই নিষেধের যথার্থ কারণ না বুঝিয়া আমার উপর বিরক্ত হয়েন, তবে আমার সে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। পাছে আমার শেষ সান্ত্বনা-সম্বল আপনাদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হই, এই ভয়ে আমি শঙ্কিত। তাই আজ সব সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া—যে কথা প্রকাশ পাইতে না পারিয়া আমাকে পীড়িত করিতেছে—সেই কথা লিখিতে বসিয়াছি। মুখে যাহা বলিতে পারি নাই, সেই কথা আপনাদিগকে জানাইতেছি।

ইহাতে যদি কোনও অপরাধ হয়, তবে যে স্নেহে আমার অনেক অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, সেই স্নেহে এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন—আমাকে সে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।”

পত্রের এই পর্য্যন্ত লিখনভঙ্গীও যেমন বিচ্ছিন্নভাব-প্রকাশে চঞ্চলতাব্যঞ্জক, হস্তাক্ষরও তেমনই কম্পিত বলিয়া চাঞ্চল্যপ্রকাশক। তাহার পর হস্তাক্ষরও অকম্পিত—লিখনভঙ্গীও স্থৈর্য্যব্যঞ্জক। বোধ হয়, পত্র লিখিতে বসিয়া মঞ্জরী যে সঙ্কোচ, শঙ্কা, দ্বিধা বোধ করিয়াছিল, ক্রমে তাহার চিত্তের দৃঢ়তা সে সকল অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। তখন হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা একবার প্রকাশের পথ পাইয়া সেই পথে আপনার বেগেই আপনি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

মঞ্জরী লিখিয়াছে—“জানি, এ দীর্ঘ বিবরণে অনেকের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিবে। কিন্তু আপনারা আমার জন্য অনেক সময় নষ্ট করিয়াছেন, এবং করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, আমার জন্য অপমানও অপমান বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই—তাই সাহসী হইয়া এত কথা লিখিতেছি।

“আমার শিক্ষার কথা—বাবার স্নেহের কথা সব আপনি সনৎদাদার কাছে শুনিয়াছেন। আমার জীবনে যত দিন দুর্ভাবনা ছিল না—চাঞ্চল্য ছিল না—পিতার স্নেহ যত দিন আমাকে সকল দুশ্চিন্তা হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছিল—তত দিনের কথা আপনি শুনিয়াছেন।

“তাহার পর স্ত্রীলোকের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা ঘটিল—যাহাতে নারী-জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, সমাজের

স্বাভাবিক নিয়মে তাহা ঘটিল। আমার বিবাহ হইল। আমি নূতন জীবনে, নূতন পরিবারে প্রবেশ করিলাম।

"যে পরিবারে আমার বিবাহ হইল, সে পরিবারের শিক্ষা ও আচার-ব্যবহার আমার পিতৃগৃহের শিক্ষা ও আচার-ব্যবহার হইতে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু বাবা আমাকে অবস্থার অনুযায়ী হইবার শিক্ষা দিতে ক্রটী করেন নাই। হিন্দু-রমণীকে কেমন করিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া পরিবারের অঙ্গীভূত হইতে হয়—স্বার্থের স্থানে পরার্থকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, সে শিক্ষা তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। বিশেষ, বাবার বিশ্বাস ছিল, স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহও কাঞ্চনে পরিণত হয়, স্বামীর ভালবাসায় তেমনই স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে স্বামীর স্বভাব প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত রক্ষণশীল—'সেকেলে' পরিবারে বাবার বিবাহ হইয়াছিল। আমার বিবাহের অল্পদিন পরে দিদিমা'র মৃত্যু হইতে মামারা আর আমার সন্ধানও রাখেন নাই! কিন্তু বাবার আচার-ব্যবহার সেরূপ ছিল না। মা সর্ব্বতোভাবে বাবার আচার-ব্যবহারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবা বলিতেন, মা তাঁহার সংসারের শ্রী ও জীবনের সুখ ছিলেন। মা'র দৃষ্টান্তেই বাবার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, আমি যে গৃহে যাইব, সেই গৃহেরই উপযোগী হইতে পারিব। বাবা আমাকে যেরূপ শিক্ষা দিতেন, দিদিমা তাহার প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিতেন, 'সে জন্য ভাবিবেন না—মা আমার যে ঘরে যাইবে, সেই ঘরের মতই হইবে, ঘর আলো করিবে।' তিনি স্নেহাধিক্য-হেতু তাঁহার স্নেহের পাত্র সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা অতিরঞ্জিত। কিন্তু অদৃষ্ট বিমুখ না হইলে আমি, বোধ হয়, যে ঘরে

পড়িয়াছিলাম, সেই ঘরের উপযুক্ত হইতে পারিতাম। তাহা হইলে আমার সুখে বাবাও সুখী হইতেন।

"নব বধূবেশে নূতন পরিবারে প্রবেশ করিলাম ; সে পরিবারের অঙ্গীভূত হইবার উপদেশ ও সঙ্কল্প লইয়াই প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সে পরিবারের ব্যবস্থা নূতন ধরণের। আমি যে সব কখনও অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখি নাই, তথায় সে সব অপরাধ বলিয়া বিবেচিত! কিন্তু আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সেই সংসারের শিক্ষাই শিখিয়া লইব। সুতরাং সে সব 'অপরাধে'র জন্য নিন্দায় আমি কাতর হইতাম না। কিন্তু আমার 'অপরাধ' অপরাধ বলিয়া বিবেচিত না হইবার—'অপরাধে'র জন্য আমার ক্ষমা পাইবার যে কারণ-নির্দ্দেশ হইত, তাহাতে বিস্মিত ও ব্যথিত না হইয়া পারিতাম না। এক জন আমার কোনও কাজের জন্য আমার নিন্দা করিলে আর দুই জনকে বলিতে শুনিতাম, 'চুপ, চুপ।—বাপের এক মেয়ে।' অর্থাৎ, আমার জন্য আমাকে কোনও প্রয়োজন নাই—আমি যে সে বাড়ীর একমাত্র বধূ—তাঁহাদের স্নেহের পাত্রী—সংসারের মান-সম্ভ্রম, শক্তি, শ্রী—এ সকলের ভাবী রক্ষক সে কথা নহে ; আমাকে প্রয়োজন আমার বাবার টাকার জন্য। সে প্রয়োজনের স্বরূপ আমি পরে বুঝিয়াছিলাম ; 'বনিয়াদী' পরিবারে পুরুষানুক্রমে উপার্জ্জন-বিমুখতাই গর্ব্বের বিষয় ছিল—ফলে সঞ্চিত অর্থ কমিয়া আসিতেছিল। যিনি সম্পত্তির অধিকারী, তিনি শিক্ষাগুণে সে কথা ভাবিতে শিখেন নাই—যাঁহারা আপনাদের ক্ষমতা ও তাঁহার চির-নাবালকত্বই অব্যাহত রাখিবার প্রয়াসী ছিলেন, তাঁহারা সেই ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্যই আমাকে

বধূত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন,—আমার জন্যও নহে, সংসারের জন্যও নহে। এক এক দিন সে কথা স্পষ্টই শুনিতে পাইতাম—টাকার লোভ না থাকিলে তাঁহারা আমার মত 'খৃষ্টানের মেয়ে'—'বিবি' আনিয়া বাড়ীর পবিত্রতা নষ্ট করিতেন না। কিসে যে আমার আচরণে বাড়ীর পবিত্রতা নষ্ট হইত, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না। তাঁহাদের পবিত্রতা যে 'শুচিবায়ুরোগে' ব্যক্ত হইত, আমার তাহা ছিল না; কিন্তু 'নিষ্ঠা'র সঙ্গে পরদ্বেষিতাও ত আমার ছিল না; হাতে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে লোকের বাড়ীর কুৎসার আলোচনায় আমার হাসি আসিত—নহিলে সে পরিবারের পবিত্রতা নষ্ট হয়, এমন কোনও কাজ আমি কোনও দিন করি নাই। পুরুষরা যেমন কিছুই 'মানিতে' না পারা 'গৌরব' মনে করেন, আমরা তেমনই 'মানিতে' পারিলেই ধন্য হই। আমাদের কাজই সব শাসন ধর্ম্মজ্ঞানে মানিয়া সংসারের সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন।

"বাবাকে এ সব কথা বলিলে তিনি আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য আমাকে বুঝাইতেন—ও সব কথায় কান দিতে নাই; যাহাদের যে ধারণা, তাহারা তাহাই ভাল মনে করে। তাহাদের কথায় আমি যেন বিচলিত না হই, স্বামীর প্রতি, সংসারের প্রতি, আমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হই। আমি যেন না ভুলি, সংসার আমার—'যে যাহাই বলুক, জামাই ত বলেন না।' আমি তাঁহার কথাই বুঝিতাম। আমিও আশা করিতাম, যিনি আমার ইহ-পরকাল-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছিলাম—তিনি আমার বিচার করিলে কখনই আমাকে অপরাধী মনে করিবেন না। যত দিন সে বিশ্বাস বক্ষে রাখিতে পারিয়াছিলাম, তত দিন সব দুঃখই সহ্য করিতে পারিয়াছিলাম।

"এ দিকে বাবা যখন বুঝিলেন, টাকার জন্যই আমার আদর, তখন তিনি টাকা দিতে মুক্তহস্ত হইলেন। তিনি বলিতেন, 'টাকায় যে কালো সাদা হয়, এ কথায় বরাবরই হাসিয়াছি। এখন দেখি, তাহাই সত্য কি না।' যেমন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস করাইতে করাইতে মরণা-হতের দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়া আইসে, তেমনই টাকার জন্য আমার উপর ভালবাসা দেখাইতে দেখাইতে গৃহের গৃহিণীরা আমাকে সত্য সত্যই ভালবাসিতে পারেন, ভাবিয়া, বাবা সঞ্চিত অর্থ নানা ছলে দিতে লাগিলেন; বলিতেন, 'সবই ত তোর—না হয় দুই দিন আগেই দিলাম।' কিন্তু তাহাতে ঈপ্সিত ফল ফলিল না; তিনি যত দিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের পাইবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল; বাবার পক্ষে দেওয়া ও তাঁহাদের পক্ষে পাওয়াই তাঁহাদের কাছে একান্ত স্বাভাবিক বোধ হ'তে লাগিল। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, আমার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মাত্রা যত বাড়িবে, বাবার টাকা ঢালিবার প্রলোভনও তত বাড়িবে। বাবা যখন দেখিলেন, তাঁহার কাজে উল্টা ফল ফলিল, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন; এক দিন তাঁহাদের ব্যবহারে বলিলেন, 'এ অনাচার আর বাড়ান ভাল নহে; আমি এবার হাত গুটাইলাম।' আমিও বাবাকে তাহাই করিতে বলিলাম। কিন্তু দিন কয়েক পরেই আবার একটা তত্ত্বে বাবাকে অনেক টাকা দিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ঝগড়া করিব কাহার জন্য? তোর জন্যই ত সব।'

"শেষে এক দিন বাবাকে কিছু চিন্তিত দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমার সঞ্চয় ত শেষ করিয়া আনিলাম—অথচ তোর কোনও

উপকারই বুঝিতে পারি না। আর যাহা আছে, সে তোর মা'র—তাহাতে তোর অধিকার—আমার নহে। তোর জন্য সে সম্বলও রাখিয়া যাইব না ?' আমি বলিলাম, 'আমি ত আগেই বলিয়াছি, আপনি টাকা দিবেন না! টাকা দিয়া কি হইবে ?' কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি সে কথা বলিবার সময় অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। আমার অশ্রু দেখিয়া বাবাও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি চেষ্টা করিয়া স্থির হইলেন—আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দিন হইতে তাঁহার মুখে ভীষণ চিন্তার ভাব আর মুছিল না।

"আরও এক কারণে বাবার চিন্তা বাড়িল—বাবার হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ হইল। তিনি যে আশায় আমাকে সব সহ্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি সে আশায় হতাশ হইলেন। তিনি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, যাঁহার দিকে চাহিয়া তিনি আমার প্রতি আর সকলের কুব্যবহার উপেক্ষা করিতেন, তিনি স্বাতন্ত্র্যলেশবর্জ্জিত। তিনি আপনার ভাল বুঝিয়া আপনি কাজ করিবার উপযুক্তও নহেন; বিরাট্ বিধবাপুরীর স্নেহের পাত্র—খেলিবার পুতুল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থশরীরেও তাঁহাদের কথায় সর্ব্বদাই আপনার স্বাস্থ্যের জন্য শঙ্কিত! বাবা কোনও সদুপদেশ দিলেও, তিনি যাঁহাদের স্নেহের পুতুল, তাঁহাদের পরামর্শে তাহা গ্রহণ করিতেন না—শ্বশুরের পরামর্শে সে বংশে কেহ কখনও চালিত হয় নাই—তাহাতে অপমান অনিবার্য্য! সে বংশে কন্যাদান করিয়া অনেকে কৃতার্থ হইয়াছে; কিন্তু জামতাকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা কেহ দেখাইতে পারে নাই! সে কথাটা বাবাকে শুনাইয়া বলা হইত—তাঁহাকে শুনাইবার জন্য আমাকে বলা হইত। যেন তাঁহারা

বাবার উপর নিতান্তই কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাবার অপরাধ—তাঁহার 'বনিয়াদী' গৌরব নাই।

"অপরাধই বটে। বাবাও ভাবিতেন, তিনি অপরাধী; যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন তাঁহাকে সমাজের সহস্র ক্রমলতাগুল্মের মধ্যে অভ্র-ভেদী গিরিশিখরের মত সমুন্নত করিয়াছিল, তিনি আমার বিবাহে পাত্রে সেই স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাবলম্বনের সন্ধান করেন নাই বলিয়া আপনাকে আমার কাছে অপরাধী মনে করিতেন। আমি অনেক বুঝাইয়াও তাঁহার সে ধারণা দূর করিতে পারি নাই। যিনি আমার সুখের জন্য প্রাণপাত করিতে পারিতেন—যিনি আমার দুঃখেই প্রাণপাত করিয়াছিলেন—আমার সম্বন্ধে তাঁহার অপরাধ! আমি যে কন্যা হইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছি—সে ত আমারই অপরাধ!

"এমনই ভাবে কয় মাস কাটিয়া গেল। বাবাকে সর্ব্বদাই চিন্তিত দেখিতাম। আর আমারই জন্য তাঁহার চিন্তা বুঝিয়া ব্যথিত হইতাম। এক এক সময় মনে হইত, আমার দুঃখের কথা বাবাকে বলিব না, আমি সুখে আছি—এমনই ভাব দেখাইব। কিন্তু তাঁহার কাছেই আমি শিক্ষা পাইয়াছিলাম—কুটিলতা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। তাঁহার কাছে মিথ্যাচরণ করিব? তাহা পারিলাম না। আর যিনি আমার মনের ভাব নখ-দর্পণে দেখিতেন, তাঁহার কাছে লুকাইবার চেষ্টা করিলেও মনের ভাব লুকাইতে পারিতাম না।

"ক্রমে বাবার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হইতে লাগিল। আমার বিবাহ দিয়া বাবা আমার কাছে থাকিবার জন্যই চাকরীর কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার পিতামহ দেশে—

পল্লীগ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। বাবা সে বাড়ী নামমাত্র দামে বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন—আমার কাছে থাকিবেন বলিয়া। বাড়ী তিনি আমার নামে করিয়াছিলেন; তাহাতেও আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলের আপত্তি ছিল—মেয়ের নামে বাড়ী করা নিতান্তই 'খৃষ্টানী কেতা'! কিন্তু বাবা বলিয়াছিলেন, 'বাড়ী আমি তোর নামে করিলাম। তোর এক ছেলেকে বাড়ীটা দিস্—সে আসিয়া ইহাতে বাস করিবে; মাঝে মাঝে দাদামহাশয়কে মনে করিবে।' বাবা কাল পূরিবার পূর্ব্বেই চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং জরা তাঁহার স্বাস্থ্যহানির কারণ নহে। তাঁহার যে বয়স, পূর্ব্বে তাঁহাকে তদপেক্ষাও অল্পবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত—তাঁহার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল, স্নানাহারাদি সম্বন্ধে তিনি বরাবরই খুব নিয়মাধীন ছিলেন—মিতাহারী ছিলেন; আমি কখনও তাঁহাকে পীড়িত হইতে দেখি নাই। সুতরাং তিনি যাহাই কেন বলুন না, আমি বুঝিতাম, আমার জন্য দুর্ভাবনাতেই বাবার মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তিনি বলিতেন, আমিই তাঁহার সুখের সম্বল। কিন্তু আমি দেখিতাম, আমিই তাঁহার সকল দুঃখের কারণ। সে চিন্তায় হৃদয়ে যে যাতনা অনুভব করিতাম, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার নহে। বাবা ব্যতীত আমার ত আর কেহ নাই; সংসারে আমি একা—কিন্তু আমার সব পূর্ণ করিয়া কেবল তিনিই বিরাজিত। তিনিই আমার একমাত্র অবলম্বন।

"তাহার পর এক দিন—এত দিন তিলে তিলে আমার অদৃষ্টগগনে যে মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা হইতে বজ্রপাত হইল। সে দিন

লাঞ্ছনার মাত্রাধিক্যে কাতর হইয়া আমি জুড়াইবার জন্য বাবার কাছে আসিয়াছিলাম। সে দিন আমার কথা শুনিয়া বাবা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বাবা বলিতেন, তিনি স্বভাবতঃ উত্তেজনাপ্রবণ; কিন্তু চেষ্টা করিয়া বিচারবুদ্ধির দ্বারা সে ভাব সংযত করিতেন। তিনি বলিতেন, সে জন্য সমস্ত জীবন তিনি তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সে দিন আমার কথা শুনিয়া বাবা আর আপনাকে সংযত করিতে পারিলেন না—উত্তেজনাবশে আমার নিষেধ না মানিয়া আমার শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন।

"আমি বসিয়া বসিয়া শঙ্কিত-চিত্তে কত ভাবনা ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার ভয় হইল; তাঁহার মুখ বিবর্ণ—চক্ষু জ্বলিতেছে—তিনি হাঁপাইতেছেন। আমাকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল—মুখের কঠোরতা কোমল হইয়া আসিল—তিনি আমাকে বক্ষে ধরিয়া বালকের মত কাঁদিলেন। তিনিও কাঁদিলেন—আমিও কাঁদিলাম। কিন্তু তখনও বুঝিতে পারি নাই, কয় দিনে আমার আর কাঁদিবার স্থানও থাকিবে না।

"সে দিন কি হইয়াছিল, তাহা আজও জানিতে পারি নাই। অপরাধ মানুষকে ভীরু করে। তাই সে দিনের অপরাধীরা আজও সাহস করিয়া আমার জন্য বাবার লাঞ্ছনার কথা আমাকে বলিতে পারে নাই। তবে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার সুখসম্বন্ধে বাবার আশার শেষ অবলম্বন সে দিন বিনষ্ট হইয়াছিল—আমার প্রতি অসাধারণ স্নেহের ভেষজেও তাঁহার হৃদয়ে সে দিনের অপমানের বেদনা দূর হয় নাই। সে দিনের দুর্ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

"গৃহে ফিরিয়া বাবা শয্যা লইলেন—বজ্রদীর্ণ হেমগিরির চূড়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইল।

"পরদিন আমার ফিরিয়া যাইবার কথা। আমি যাইব না বলিয়া পাঠাইব বলিলে তিনি বলিলেন, 'না মা, তুই যা। আমি ত তোর সেই আশ্রয়ই করিয়া দিয়াছি—পিতা হইয়া শত্রুর কাজ করিয়াছি। মঞ্জরী, অনুতাপের নরকাগ্নি লইয়া আমি চলিলাম—আমাকে ক্ষমা করিস।' আমার বক্ষের বেদনায় যেন আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমি বাবার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না—কিন্তু যখন হৃদয়ে বেদনাভার একটু লঘু বোধ হইল, তখন মুখ তুলিয়া দেখিলাম, বাবার দুই চক্ষু দিয়া অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে।

"সে দিন বাবাকে বলিয়াছিলাম, তাঁহার স্নেহের আশ্রয় থাকিতে আমার আশ্রয়ের অভাব নাই। শুনিয়া বাবা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি যাহা বুঝি নাই, তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন—আমার সে আশ্রয়ও নষ্ট হইবার আর বিলম্ব ছিল না।

দেখিতে দেখিতে বাবার অসুখ বাড়িতে লাগিল। তিনি সনৎদাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; তিনি আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, 'সনৎকুমার, মঞ্জরীর জন্য যাহা রাখিয়া গেলাম—দেখিয়া লও; তাহাকে গুছাইয়া দিও।' তিনি কাগজপত্র সব গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন—বাড়ীর দলীলাদি, জীবন-বীমার কাগজ, মা'র জন্য যে সব কোম্পানীর কাগজ ছিল, সে সব আমার নামেই করিয়া রাখিয়াছিলেন; সনৎদাদাকে তিনি সব বুঝাইয়া দিলেন; তাহার পর বলিলেন, 'যদি

কখনও উহার কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে সে সাহায্য দিতে চেষ্টা করিও। আমার এই অনুরোধটুকু রাখিও।' সনৎদাদাকে তিনি ভালবাসিতেন—তাঁহার সরলতার প্রশংসা করিতেন। তিনি বাবার সে অনুরোধ কেমন করিয়া পালন করিয়াছেন, তাহা আপনি যেমন জানেন, আর কেহ তেমন জানে না।

"বাবার অসুখ বাড়িতেই লাগিল। যে দুর্দ্দশার কথা কয় দিন পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই—সেই দুর্দ্দশার দাবানলে বেষ্টিত হইলাম। বাবা আমাকে ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন—তাঁহার বেদনা-বিক্ষত হৃদয় শান্তি পাইল।"

মঞ্জরীর পত্রের এই অংশ অশ্রুপাতে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া-গিয়াছিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নরকাগ্নি

তাহার পর মঞ্জরী লিখিয়াছে—"বাবার মৃত্যুর পর আমার শ্বশুর-বাড়ীতে একটু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু সে আমার জন্ম নহে, বাবার ত্যক্ত সম্পত্তির জন্ম। আমাকে তাঁহারা যে সান্ত্বনার কথা বলিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা কি রাখিয়া যাইলেন, জানিবার জন্ম নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বাবা অনেক বার অনেক উপদেশ দিয়া আমার মন হইতে তাঁহাদের উপর বিরক্তির যে ভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সে ভাব দূর না হইয়া দৃঢ় হইয়াছিল। কারণ, আমি বুঝিয়াছিলাম, আমার দুঃখেই বাবার প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছিল; আর তাঁহারাই আমার সকল দুঃখের কারণ। তাহার উপর পিতৃশোকার্ত্তার কাছে কেবল পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধান—যেন ক্ষতে ক্ষারনিক্ষেপ হইতে লাগিল।

"আমি পূর্ব্বকথা যতই মনে করিতে লাগিলাম, ততই সে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আমার অনিচ্ছা হইতে লাগিল। তবুও আমার স্বামী ও দিদিশাশুড়ী আমাকে লইতে আসিলে আমি ফিরিয়া যাইলাম। কারণ, সংসারে আমি একা—ভাল হউক, মন্দ হউক, একটা আশ্রয় নহিলে থাকিতে পারি না। যাহার আশ্রয় মিলে না, তাহাকে যে আশ্রয় গড়িয়া লইতে হয়, তাহা তখন ভাবি নাই—তখনও বিরক্তি

ঘৃণায় পরিণতি লাভ করে নাই। সনৎদাদাও আমাকে যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

"বাবার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার কন্যা—পুত্র নহি। শুনিয়াছি, আমার জন্মের পর বাবার যে সব আত্মীয়া পুত্র না হওয়ায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন, বাবা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'ঐ আমার পুত্র।' মা'র মৃত্যুর পর ছেলে নাই বলিয়া কেহ বাবাকে বিবাহের কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন: বলিতেন, 'আমি ত কোনও দিন মনে করি নাই, মঞ্জরী থাকিতে আমার পুত্রের অভাব আছে।'—তবুও আমি যে কন্যা—পুত্র নহি, সে কথা এই সময় বুঝিলাম; বুঝিয়া ব্যথা পাইলাম। আমি পুত্র হইলে বাবার সকল দুঃখের ও অকাল-মৃত্যুর কারণ না হইয়া সুখেরই কারণ হইতে পারিতাম। বাবার দুর্ভাগ্য—আমারও দুর্ভাগ্য, আমি তাঁহার কন্যা—পুত্র নহি। বাবাও কি জীবনের শেষকালে তেমন কথা মনে করিয়াছিলেন? আমি ত তাহা বুঝিতে পারি নাই।

"বাবার শ্রাদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাবার বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইল। বাবা যখন আমার নামে বাড়ী করান, তখনই তাহাতে এ পক্ষ হইতে যে আপত্তি হইয়াছিল, সে কথা আমি বাবাকে জানাইয়াছিলাম; কিন্তু সে আপত্তি তিনি শুনেন নাই। সে কথা আমার মনে ছিল। সুতরাং সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম না। বাড়ীর মহিলারাই এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহাদের কথা শুনিলাম না, তখন এক দিন আমার স্বামী আমার কাছে সে প্রস্তাব করিলেন। স্বাতন্ত্র্য তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার কথা শুনি-

য়াই বুঝিলাম, তিনি শিক্ষানুসারে পড়া পাখীর মত মহিলাদের কথা-রই পুনরুক্তি করিলেন। কোনও কথাই তাঁহার নহে। তবুও তাঁহার এই প্রস্তাবে আমার হৃদয় একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

"বাড়ী বিক্রয় করিব কেন? আমার মা নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই; স্বামীর যে প্রেমে নারী আপনাকে পর ও পরকে আপনার করে, যে প্রেমে সকল স্ত্রীরই অধিকার থাকে, আমার ভাগ্যে সে প্রেমলাভও হয় নাই। আমার থাকিবার মধ্যে ছিলেন বাবা,—অন্ধকারে দীপ, দুঃখে সুখ, বেদনায় সান্ত্বনা, অকূলে কূল, সংসারের সর্ব্বস্ব। এ গৃহ তাঁহারই স্মৃতিপূত। এ গৃহ আমার কাছে গৃহ নহে,—দেবমন্দির। এই মন্দিরে তাঁহার স্মৃতিপূজার সুযোগ পাইয়া আমি ধন্য হইব। আমি সে গৃহ বিক্রয় করিতে পারিব না। বাস্তবিকই কত দিন যখন হৃদয়-ভার আর সহ্য করিতে পারি নাই, তখন এই গৃহে—এই মন্দিরে আসিয়াছি। বাবার শূন্য শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এক এক-বার মনে হইয়াছে, আমি যেন আবার পিতৃবক্ষে কাঁদিবার সুখ পাই-য়াছি। সে ভ্রান্তিতেও কত সুখ—কত সান্ত্বনা! তাহার পর মুখ তুলিয়া বাবার চিত্রের দিকে চাহিয়া মনে হইয়াছে,—সেই চিত্রাঙ্কিত নয়ন হইতে তাঁহারই স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার তপ্ত বক্ষে সান্ত্বনা বর্ষণ করিতেছে; সেই চিত্রাঙ্কিত ওষ্ঠাধর হইতে তাঁহারই উচ্চারিত বাণী আমাকে শান্ত হইতে উপদেশ দিতেছে! বাবার ব্যবহৃত জিনিষগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, বক্ষে ধরিয়া আমি যে কত শান্তি, কত সান্ত্বনা পাই-য়াছি তাহা বলিতে পারি না। আমার সান্ত্বনার ত আর কিছুই নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"বাড়ী-বিক্রয়ের প্রস্তাবে আমি দৃঢ়ভাবে আমার অসম্মতি জানাইয়াছিলাম। আমি কখনও তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করি নাই,—তাই আমার প্রতিবাদে তিনি বিস্মিত হইলেন। আর আমার দৃঢ়তায় তিনি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেই সঙ্কোচভাবে আমি আর তাঁহার উপর রাগ করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার যে সঙ্কোচ দেখিলাম, আর কাহারও সে সঙ্কোচ দেখিলাম না। তাঁহারা আমার অসম্মতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অস্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য-পরিচায়ক বলিয়া আমার নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমনও শুনিলাম যে, আমা হইতে যে তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক পরিবার কলঙ্কিত হইবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সব কথায় আমি বিচলিত হইলাম না। আমার মত অপরিবর্ত্তিতই রহিল।

"এত দিন সহ্য করিয়াই আসিয়াছিলাম। এবার আমিই বিদ্রোহ-ঘোষণা করিলাম। কিন্তু এবার বুঝিতে পারিলাম, দৌর্ব্বল্যেই দুঃখ; সবল না হইলে সংসারে আত্মরক্ষাও করা যায় না—সুখ লাভ করা ত পরের কথা। বিশেষ, আমার মত যাহাকে সংসারের দুঃখ-প্রবাহে একক ভাসিতে হয়, তাহার পক্ষে দৃঢ়তা বতীত আর কোনও উপায়ই নাই।

"বাস্তবিকই দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া আমি যেন একটু স্থির হইবার অবসর পাইয়াছিলাম। আমি মনে করিতেছিলাম, যদি আমাকে সুখ দিবার আর কেহ না থাকে, তবে আমিই তাহার সন্ধান করিব। বাবা বলিতেন, মানুষের মনই মানুষকে সুখী দুঃখী করিবার কর্ত্তা,—মন নন্দনে যেমন নরকের সৃষ্টি করিতে

পারে, তেমনই আবার নরকেও নন্দন রচনা করিতে পারে। আমি ভাবিলাম, চেষ্টা করিয়া দেখিব,—যদি সুখ না পাইলেও শান্তিলাভের কোন উপায় করিতে পারি; দৃঢ়ভাবে আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে আত্মস্থ করিয়া বাহিরের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আপনার হৃদয়েই আপনার শান্তির উৎস রচনা করিতে পারি। সে চেষ্টা নূতন—কিন্তু সে চেষ্টায় যে উত্তেজনা ছিল, সেই উত্তেজনা লইয়া কিছু দিন আমি একরূপে সব সহ্য করিয়াছিলাম; নিন্দা, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা—এ সব যেন কতকটা উপেক্ষা করিতেও শিখিতেছিলাম।

"যখন আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আপনার হৃদয়ে আপনার সুখলাভের চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন আমার হৃদয়ে ধীরে ধীরে আর এক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। স্বামীর ব্যবহারে তাঁহার প্রতি যে বিরক্তি জন্মিয়াছিল—বাবার মৃত্যুতে যাহা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে তাহার কঠোর কাঠিণ্য হ্রাস হইতেছিল। অবস্থাবিচারের ফলে তাঁহার প্রতি আমার করুণার সঞ্চার হইতেছিল—সেই করুণার স্নিগ্ধ সংস্পর্শে বিরক্তির কঠোরতা কমিয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতেছিলাম, তিনি শৈশবে পিতৃহীন—বহু বিধবার স্নেহের সম্বল; তাঁহারা তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেই ব্যস্ত—যে শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হয়, সে শিক্ষা দিবার কথা মনেও করেন নাই। মানুষ সংসার-সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিলে তাহার হৃদয়ে যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন পরিস্ফুট হয়—তাঁহার হৃদয়ে সে সকলের বিকাশের অবসর ঘটে নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, তিনি সংসারে কেবল স্নেহ—যত্ন—সুখ লইবার জন্যই আসিয়াছেন; কাহাকেও কিছু দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে

করিতে শিখেন নাই। এমন কি, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা—এ সকলেও যে দান-প্রতিদান আছে—দানে যে প্রতিদানের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়—এ সব তিনি বুঝিবার সুযোগই পায়েন নাই। যাঁহাদের স্নেহের ছায়া হেতু তিনি আপনাকে বিকশিত করিবার অবকাশ পায়েন নাই, তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাকে শিশুই রাখিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার চিকিৎসকের উপর দিয়া ও সম্পত্তিরক্ষার ভার আপনারা লইয়া তাঁহারা তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি উভয়ই বিপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা শৈশব হইতেই তাঁহাকে বুঝাইয়া আসিয়াছেন—'শাপভ্রষ্ট' না হইলে কেহ এমন একটা বিরাট 'বনিয়াদী' বংশের একমাত্র বংশধর হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। সকলেই কেবল তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যস্ত দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারও মনে হইয়াছিল তাঁহার স্বাস্থ্য সত্য সত্যই ক্ষণভঙ্গুর—তিনিও আপনাকে লইয়াই বিব্রত থাকিতেন। ভাবিতে শিখেন নাই বলিয়া তিনি মহিলাদিগের শিখান কথারই পুনরুক্তি করিতেন। সে সব কথার জন্যও তাঁহাকে দোষ দেওয়া সঙ্গত নহে। পিতার শোকে যখন আমার হৃদয় একান্তই কাতর, হয় ত তখন একটা অবলম্বনের জন্যই আমি আপনাকে এইরূপ বুঝাইতেছিলাম।

"যদি চিন্তার এই ধারা প্রবাহিত রাখিতে পারিতাম, তবে কালে কি হইত; বলিতে পারি না। হয় ত তাহা হইলে শান্তিলাভ করিতেও পারিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি যে কাজের অভাবে কেবল কুচিন্তারই অবসর পাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। সহসা তাহার পরিচয় পাইলাম। তাঁহার স্বহস্ত-প্রজ্বালিত

নরকাগ্নিতে, দাবানলে যেমন বনভূমির স্নিগ্ধ শ্যামশোভা নষ্ট হইয়া যায়—প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া যায়—তেমনই আমার হৃদয়ে নবসঞ্চারিত স্নিগ্ধতা দগ্ধ হইয়া গেল—করুণার প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া গেল—আবার হৃদয়ে অগ্নিশ্বাসী মরুভূমির সৃষ্টি হইল। যে লজ্জার কথা—যে ঘৃণার কথা কোন দিন কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই, তাহা কেমন করিয়া বলিব ?

"আমার যেটুকু স্বাতন্ত্র্য আমার বর্ণিত অবস্থাতেও অক্ষুণ্ণ ছিল, সেটুকুকে চরণ-চাপে বিনষ্ট করিয়া আমাকে চরণের কর্দ্দমে পরিণত করিবার জন্য যে বিধবাপুরীর সঙ্কল্পের ও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমি সংগ্রাম করিতেছিলাম, সেই বিধবাপুরীতে এক জন বিধবার কথা বলিব। তিনি সে পুরীর আশ্রয়ের অধিকারী নহেন—অনুগ্রহ ব্যতীত তথায় আশ্রয় পাইবার তাঁহার আর কোনও অধিকার ছিল না। তিনি অধিকারীদিগের কাহারও দূর সম্পর্কের সামান্য সূত্র ধরিয়া অনুগ্রহ সম্বল করিয়া সে পুরীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কাজেই তথায় তাঁহার সম্মান বা সমাদর ছিল না। দারুণ দারিদ্র্যই তাঁহাকে সে আশ্রয়ে আসিতে প্ররোচিত করিয়াছিল—পুত্রের জন্যই তিনি সে সম্মানহীন জীবনের বেদনা সহ্য করিতেন! অধিকারীদিগের সঙ্গত অসঙ্গত সকল কথায় সায় দিয়া—তাঁহাদের উপেক্ষা সহ্য করিয়া—তাঁহাদের ব্যবহারে পদে পদে আপনার দীনতা অনুভব করিয়াও তিনি সেই আশ্রয়ে থাকিতেন; কারণ, অন্য আশ্রয় ছিল না—আর সেই আশ্রয়ে থাকিয়া যদি তিনি আপনার পুত্রটিকে লিখাপড়া শিখাইতে পারেন, তবে তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইবে—তাঁহার দুঃখের পঙ্কে পুত্রের সুখের শত-

দল বিকশিত হইতে পারিবে। ভবিষ্যতের আশায় তিনি বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিতেন। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার যন্ত্রণা তিনি বুঝিতেন। বোধ হয়, সেই জন্যই তিনি আমার দুঃখে সহানুভূতি বোধ করিতেন; আমাকে একটু স্নেহ করিতেন। কিন্তু অধিকারীদিগের ভয়ে সে সহানুভূতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেও সাহস করিতেন না। কখনও আমাকে একা পাইলে তিনি আমাকে দুই একটি সান্ত্বনার কথা বলিবার প্রয়াস পাইতেন—সে সব কথাও যেন তিনি ভয়ে স্পষ্ট করিয়া উচ্চারিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু অধিকারীদিগের কাছে তাঁহার ছেলেটির একটু আদর ছিল; কারণ, কাহারও কোনও পত্র লিখিতে, হিসাব পরীক্ষা করিতে, পঞ্জিকা দেখিয়া দিতে—তাহাকেই ডাকিতে হয়। সেও হাসিমুখে সকলের সব কাজ করিয়া দিত। তাহার ব্যবহারে সরলতা সপ্রকাশ ছিল—বিনয়ের সংমিশ্রণে তাহার ব্যবহার আরও চিত্তাকর্ষক হইত। সে মুখ তুলিয়া কথা কহিতেও যেন সঙ্কোচ বোধ করিত। সরকারদিগের সঙ্গে তাহার আহারের ও বাসের ব্যবস্থা ছিল—দাসদাসীরাও তাহাকে আপনাদের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ মনে করিত না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পাঠে মনোযোগ অসাধারণ ছিল। তাই সর্ব্ববিধ প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়াও সে বিদ্যালাভে সফল-যত্ন হইত। কিন্তু আহার ও আশ্রয় ব্যতীত সে গৃহে সে আর কিছুই পাইত না; বেতনের, পরিচ্ছদের ও পুস্তকের জন্য তাহাকে অন্যত্র চেষ্টা করিতে হইত। সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন পুস্তকের অভাবে আর অধ্যয়নের আশা ত্যাগ করিতেছিল, তখন আমার কাছে তাহার কথা শুনিয়া বাবা তাহার পুস্তক কিনিয়া দিয়াছিলেন—

এক বৎসরের বেতনও দিয়াছিলেন। সে জন্য আমাকে ও তাহার মাতাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। যে সাহায্য সে তাঁহাদের কাছে পাইবে না, সেই সাহায্য আমার নিকট হইতে পাওয়ায় তাহার যেমন অপরাধ, তাহাকে সাহায্য দানও আমার তেমনই অপরাধ 'হঠাৎ নবাব', 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ'—চাকুরীয়ার মেয়ে আমি 'চাট্টিখানি' টাকার গরমে তাঁহাদের অপমান করিয়াছি! এমনই কত কথা আমাকে শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের যে মান কথায় কথায় কলঙ্কিত হইত, সে মানের মূলটা আমি কয় বৎসর সে সংসারে বাস করিয়াও খুঁজিয়া পাই নাই। বাবার মৃত্যুর পরও আমি তাহার প্রয়োজন জানিলেই তাহাকে বেতন, পুস্তক, বেশ—প্রভৃতির জন্য অর্থ-সাহায্য করিতাম; গোপনে করিতাম না। প্রকাশ্য-ভাবেই করিতাম।

"সেই অনাথের প্রতি আমার অনুগ্রহে যে কোনও দোষ হইতে পারে, তাহাতে যে কাহারও মনে কোনরূপ কু-ভাবের—সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে, এমন কথা কোন দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। যাঁহাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দংশন আমাকে সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হইত, তাঁহাদের কথাতেও কোনও দিন সে ভাব পাই নাই। নাই যাঁহাকে জীবন-সর্ব্বস্ব ইহপরকালসম্বল বলিয়া মনে করিবার উপদেশ পাইয়াছিলাম, এবং সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলাম ও করিতেছিলাম, বাণ-বিদ্ধ-হৃদয়ে করুণার ভোগবতী-ধারা প্রবাহিত করিয়া যাঁহার ক্রটী প্রক্ষালিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলাম, তাঁহারই কথায় সে সন্দেহ সপ্রকাশ হইল। পরে বুঝিয়াছিলাম, পূর্ব্বেও দুই একবার তাঁহার কথায় এ

সন্দেহের ইঙ্গিত ছিল ; কিন্তু যাহা আমার কল্পনারও অতীত ছিল, তাহা আমি বুঝিব কেমন করিয়া ? সন্দেহের অনল বহুদিন গোপন রাখা যায় না ; সে আত্মপ্রকাশ করেই। তাই ইঙ্গিত এক দিন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তখন আর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

"আমার মনে হইল, কে যেন আমার চারি দিকে নরকানল জ্বালিয়া দিল। আমি মুহূর্ত্তমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম ; তাহার পর বহ্নি হইতে আত্মরক্ষার জন্ম স্বাভাবিক সংস্কারে জীব যেমন পলাইয়া যায়, তেমনই পলাইয়া আসিলাম! তখন বিচারের— বিবেচনার অবসর পাই নাই। কিন্তু আমার এক বই আর আশ্রয় নাই। আমি সেই আশ্রয়ে যাইব। কেমন করিয়া যাইব? যেমন করিয়াই হউক, যাইতে হইবে। আমি এক জন দাসীকে অনেক অর্থে বশীভূত করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিয়াছি ; কাহাকেও কিছু বলিয়া আসি নাই ; কেহ আমাকে বাধা দিতে সাহস করে নাই।

"আজও যখন আমি সে কথা স্মরণ করি, তখন আমার মনে হয়, সেই নরকাগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করিবার জন্ম আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি আর সে অনলকুণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারিব না! আমাকে আর সে অনলে নিক্ষিপ্ত করিবেন না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

বহ্নি কি নিবিবে ?

মঞ্জরীর পত্র এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তাহার শ্বশুরবাড়ী যাইবার সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। মানবের ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। যে পিতার বিপুল স্নেহের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিয়াছিল, সেই স্নেহে সুখ ব্যতীত আর কিছুই পায় নাই, সে এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে—কে দিতে পারে ? মানুষ এই 'কেন'র সন্ধান করিতে ত্রুটী করে নাই, ইহলোক ত্যাগ করিয়া মানবের বুদ্ধি ইহার সন্ধানে লোকান্তরের রহস্য-ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সে রহস্য তাহার চেষ্টাকে অবাধে উপহাস করিয়া আসিয়াছে। অদৃষ্ট অদৃষ্টই রহিয়াছে। কে তাহাকে দেখিতে পায় ? মানুষ কাজ করে। সে কি সর্ব্বত্রই আপনার কাজের নিয়ন্তা ? যদি তাহা না হয়, তবে কেমন করিয়া বলিব, অদৃষ্ট কর্ম্মাধীন ? সে কি কেবল সান্ত্বনা-লাভের চেষ্টা ? প্রিয়পুত্র রামকে বনে পাঠাইয়া মরণাহত দশরথ যখন কৌশল্যাকে বলিয়াছিলেন, মানব শুভাশুভ যে কার্য্য করে, সে কালে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করে, তখন তিনি কি রামের প্রতি অবিচারের কারণ-সন্ধানে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইয়া সেই চিন্তায় সান্ত্বনামাত্রের সন্ধান করিয়াছিলেন ?

আর প্রিয়জনের ব্যবহারে এই যে সন্দেহ—ঈর্ষ্যা, ইহার কারণ কি ?

হা প্রবল প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেন্ট্ অগষ্টাইন্ বলিয়াছেন, যাহার ঈর্ষ্যা নাই, সে ভালবাসিতে পারে না! ঐ ঈর্ষ্যা হইতে কে মুক্ত? জন্তুদিগের মধ্যে এই সন্দেহের—ঈর্ষ্যার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। অসভ্য মানব-সমাজেও ইহাও পরিস্ফুট। কিন্তু কেবল কি তাহাই? প্রাচীন গ্রীক্‌সমাজে ইহার প্রাদুর্ভাবের প্রভূত প্রমাণ আছে। জার্ম্মাণ কবি—প্রেমের কবি হায়েন্ তাঁহার প্রণয়-পাত্রীর প্রিয় বলিয়া পাখীটিকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন! যে প্রেম সন্দেহসঙ্কুল নহে, সে প্রেম যদি প্রবল বলিয়া গণিত না হয়,—উপেক্ষার নামান্তরই হয়, তবে ইহাও ত সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে এই সন্দেহের—ঈর্ষ্যার জন্যই প্রেম নষ্ট হয়! তবে ত ইহা প্রেমের শত্রুও বটে! ইহার জন্য সংসারে কত অঘটনই ঘটে! গুপ্তহত্যা হইতে প্রকাশ্য হত্যা পর্য্যন্ত ইহারই উত্তেজনায় ঘটিয়া থাকে। সত্য সত্যই ইহা মানব-হৃদয়ে নরকাগ্নি প্রজ্বালিত করে। ইহা যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহাকেও দগ্ধ করে; যাহাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, তাহাকেও দগ্ধ করে। কোন্ কোন্ উপাদানে ইহা গঠিত? আশঙ্কায় ও ক্রোধে? প্রেমিক প্রণয়েপ্সিতের সম্পূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী হইতে চাহে যদি সে অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, সেই তাহার আশঙ্কা; আর ক্রোধ সেই আশঙ্কারই সহচর। সন্দেহ—ঈর্ষ্যা মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিতে পারে; মানুষ তাহার উত্তেজনায় ইচ্ছাশক্তিশূন্য হইয়া পড়িতে পারে।

সে দিন তাহাই ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু কত কারণে সে সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারে, কত রূপে তাহা আত্মবিকাশ করিতে পারে, সে

সব কথা সে দিন ভাবিবার অবসর পাই নাই। তাহার পর আর যাহারই কেন অভাব হউক না, অবসরের অভাব হয় নাই। কোনও কাজ নাই, কাজেই চিন্তার অবসরের অভাব নাই। ভাবিয়া দেখিয়াছি, বিলোলার ভাবান্তরের মূলেও ত এই সন্দেহ—এই ঈর্ষ্যা ছিল! তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই তাহার ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে পারি নাই। আমি যখন তাহারই প্রশংসায় প্রফুল্ল হইয়া সাহিত্য-সাধনায় যশোলাভের দুরাশায় পুস্তক-রচনায়, রচনার প্রসাধনে—ব্যাপৃত থাকিতাম, তখন কি সে আমার কার্য্য লক্ষ্য করিয়া মনে করিত না, আমি তাহাকে তাহার প্রাপ্য দিতেছি না, আর আমার সাহিত্য-সাধনা তাহাকে তাহার সেই প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে? যখন আমি সাহিত্য-সাধনায় সময় কাটাইয়া শেষ পরীক্ষার সময় সমাগত দেখিয়া দীর্ঘ রাত্রি অধ্যয়নে কাটাইয়া দিতাম, তখন কি সে মনে করিত না—আমার এই মনোযোগ তাহাতেই প্রযুক্ত হইবার কথা? যখন আমি তাহার ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া বাহিরের কাজে সময় কাটাইয়াছি, তখনও কি সে মনে করে নাই—আমার অবসরে তাহারই অধিকার? যে ঈর্ষ্যা সুশিক্ষিত কবিকে প্রণয়াস্পদের প্রিয়-পাখিটিনাশের প্রবৃত্তি দিতে পারে, সে ঈর্ষ্যা কি বিলোলার ঈর্ষ্যার পাত্র অশরীরী বলিয়া তাহাকে পরিহার করিবে? তবে কি তাহার ভাবান্তর সত্য সত্যই ঈর্ষ্যার ফল—যে প্রবল প্রেম সে ঈর্ষ্যাকে বিকশিত করে, সেই প্রবল প্রেম হইতেই জাত? আজ সে বিচারে আর ফল নাই। জীবন-নাটকের অভিনয়ে যে অঙ্কে যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা ভাবিয়া আর কি হইবে?

তবুও মনে হয়, যে সন্দেহ অতি তুচ্ছ ঘটনাকে বৃহৎ বলিয়া তুলিতে পারে—রজ্জুতে সর্পই দেখে—যে বাতাসে প্রাসাদ কল্পনা করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে শরীরী হইতে অশরীরীর কল্পনা করিতে কতক্ষণ? আমার ব্যবহারে যে সে সন্দেহের অবকাশও থাকিতে পারে, তাহাও ত আমি পরে শুনিয়াছিলাম; যাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি আমাকে যেমন জানিতেন, বিলোলার ত তেমন করিয়া জানিবার সুযোগ ঘটে নাই। তিনি আমার অতীত, বর্ত্তমান, সব নখ-দর্পণে দেখিতেন, বিলোলার সেরূপ দেখিবার সুযোগ তখনও হয় নাই—তাহার পক্ষে তখনও যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রেমে আমার সামান্য ত্রুটী অবহেলার—অনাদরের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবারই কথা। আমিই কি তাহার সন্দেহ-বহ্নিতে ইন্ধন-যোগ করি নাই? আমি যত গৃহ-ছাড়া হইয়াছি, তাহার ঈর্ষ্যার ও সন্দেহের কারণ কি ততই বর্দ্ধিত হয় নাই? আবার আলাপের অভাবেও তাহার ঈর্ষ্যার কারণ উদ্রিক্ত হইয়া থাকিতে পারে। এমনও হইয়াছে। স্বামী কার্য্যাবসানে শ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া বিশ্রামের সন্ধান করিলে, তাহাতেও স্বামীর উপর স্ত্রীর ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়; সেই জন্য স্ত্রী স্বামীর ব্যবহারে বেদনা পাইয়াছে—এমন কথাও ত শুনিয়াছি। কিন্তু তখন অভিমানপ্রাবল্যহেতু সে সব কথা ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার অবসর পাই নাই; তখন আপনাকেই নিরপরাধ স্থির করিয়া লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ভুল করিয়াছিলাম। এক দিন মনে করিয়াছিলাম, অপরাধ তাহার। আজ মনে করিতেছি—বুঝিয়াছি, দোষ আমার! আমিই তাহার সকল দুঃখের কারণ।

মঞ্জরীর পত্রের শেষাংশ এইরূপ—"যখন পাপ সন্দেহের কথা শুনিয়াছিলাম, তখন জীবনে ঘৃণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু পিতার স্মৃতিমন্দিরে আসিয়া, তাঁহার কথা মনে করিয়া, উত্তেজনার বহ্নিতে যেন সলিল নিক্ষিপ্ত হইল—আমি ভাবিবার অবসর পাইলাম। তখন ভাবিলাম, আমার জীবনে ঘৃণা কেন? আমি কোন্ অপরাধে অপরাধী? আমি নিষ্কলঙ্ক হইয়াও কলঙ্কাপবাদরজ্জু গলবদ্ধ করিয়া আত্মনাশ করিব কেন? যাহাদের ব্যবহারে আমার পিতার প্রাণ-বিয়োগ ঘটিয়াছে, তাহাদের ব্যবহারে আমিও প্রাণত্যাগ করিব কেন? আমরা কি তাহাদের বধ্য? আমরা কেন যাচিয়া পরাজয় স্বীকার করিব? মনে এই চিন্তা যতই প্রবল হইতে লাগিল, ততই বল পাইতে লাগিলাম। এ জগতে কিছুই ব্যর্থ নহে—সকলেরই সার্থকতা আছে। যে ক্ষুদ্র কীট প্রাণান্ত চেষ্টায় সামান্য ভূমি ভেদমাত্র করিয়া থাকে—যাহাকে পদদলিত করিতেও আমরা ঘৃণা বোধ করি, জগতে তাহারও জীবনের সার্থকতা আছে; যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ আমাদের দীপশিখায় আত্মাহুতি দেয়, তাহাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনও বৃথা নহে। আর আমি মানুষ—আমার জীবনের কি কোনও সার্থকতাই নাই যে, আমি আমার জীবনকে ঘৃণা করিব? সংসারে আমি কি কাহারও কোন উপকার করিতে পারিব না যে, জীবন বৃথা মনে করিয়া অনায়াসে ত্যাগ করিব? জীবন কি এমনই সুলভ—এতই তুচ্ছ—আমাদের সামান্য উত্তেজনার উপর তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে? তাহার পর? তাহার পরে কি আর কিছুই নাই?

"যখন এমনই কত ভাবনা ভাবিতেছিলাম, উত্তেজনার আবেগ

অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই, সেই সময় আপনার পুস্তকখানি পাইলাম। সময় কাটাইবার জন্য পুস্তক পাইলেই পাঠ করিতাম। আপনার পুস্তকখানি পাঠ করিলাম। যত পাঠ করিতে লাগিলাম, ততই বিস্ময় বাড়িতে লাগিল। আমার জীবন-রহস্য যিনি কল্পনায় জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার জন্য শ্রদ্ধায় ও সম্রমে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। মানুষ যে মানুষের অবস্থা এমন করিয়া কল্পনা করিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

"দেখিলাম, বিদ্যুল্লতা আমারই মত উত্তেজনার প্রথম আবেগে আত্মহত্যা করিয়াই ঘৃণিত জীবন শেষ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে উত্তেজনা প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই অকূলে কূল না পাইয়া, বিচার-বিবেচনার অবসর লাভ না করিতেই সে আত্মনাশ করিয়াছিল।

"আমারও কি সেই পথ? পুস্তকপাঠ করিয়া আবার চিন্তিত হইলাম। আমি অকূলেই ভাসিয়াছিলাম—চিন্তার তরঙ্গ-তাড়নে আমার চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি মরিতে পারিতাম—মরিতাম, যদি আপনার হৃদয় সন্ধান করিয়া তাহাতে কলঙ্কের কোনও চিহ্ন পাইতাম। আর মরিতে পারিতাম—মরিতাম, যদি যাঁহার কথায় আমার এই যন্ত্রণা, তিনি কোনও দিন আমাকে ভালবাসিয়াছেন, এ কথা মনে করিতে পারিতাম। যখন সেই দুই কারণের কোনটিই পাই নাই, তখন মরিব কেন? কিন্তু বিদ্যুল্লতার পরিণামে চিন্তা করিলাম, ঐ পথই কি আমারও পথ? যিনি কল্পনায় আমার সকল দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন, তিনি কি আমাকে ঐ পথেরই পথিক হইতে উপদেশ দিবেন? উত্তেজনার চাঞ্চল্যে আর কিছুই না ভাবিয়া

তাই আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। সে দিন আমি আমার সে কাজের গুরুত্ব বুঝিতেই পারি নাই।

"তাহার পর আপনারা আমার সুখবিধানের চেষ্টাই করিয়াছেন; সে জন্য কোনও কষ্টই কষ্ট বলিয়া—কোনও অপমানই অপমান বলিয়া মনে করেন নাই। আপনারা আমার রক্ষার চেষ্টাই করিয়াছেন—মৃত্যুর পথই যে আমার একমাত্র পথ, আপনাদের কোনও কথায় কোনও দিন সেরূপ ইঙ্গিত পাই নাই। কতবার মনে হইয়াছে, আজ যে কথা বলিলাম, এই কথা বলিয়া আপনাদিগকে আমার জন্য অকারণ শ্রম ও দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি প্রদান করি। কিন্তু লজ্জায় পারি নাই—কিছুতেই হৃদয়ে বল বাঁধিতে পারি নাই। কিন্তু আজ আপনারা যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে পরে আপনাদের আর ফিরিবার পথ থাকিবে না। তখন আমি আপনাদের দয়ার সান্ত্বনা হইতেও বঞ্চিত হইব। সে অবস্থা কল্পনা করিয়াও আমি শঙ্কায় অস্থির হইয়াছি। তাই আজ সব সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া আপনার কাছে এই দগ্ধ জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিলাম। আমাকে আর সেই নরকানলকুণ্ডে ফিরিয়া যাইতে বলিবেন না।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আবার ভাবিতে লাগিলাম—এখন উপায় কি, কিসে নরকানল নির্ব্বাপিত হয়?

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন পথ

পত্র লইয়া ভাবিতে ভাবিতে সনৎকুমারের গৃহে উপনীত হইলাম। সনৎকুমার তাহার বসিবার ঘরে বড় ছেলেটিকে পড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; ছেলেটি পাঠ অপেক্ষা পুস্তকের ছবিগুলির প্রতি কিছু অধিক মনোযোগ দিতেছে। আমি উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "কি, মাষ্টারী হইতেছে?"

সনৎকুমার বলিল, "মাষ্টারীর চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি যে, কাজটা ওকালতী অপেক্ষা কঠিন।"

"কেন?"

"এ কাজে যে অসাধারণ ধৈর্য্যের প্রয়োজন, সে ধৈর্য্য আমরা হারাইয়াছি—আর ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনাও ত দেখি না।"

"কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুতিটা খুব হয়।"

"খু—ব। কথায় কথায়। তাই ত ভয় হয়, কখন্ ছেলেটাকে মারিয়া বসিব।"

কথাটা শুনিয়া তাহার পুত্র বিস্ময়-বিকসিত-নয়নে তাহার দিকে চাহিল। তাহার বাবা যে আবার তাহাকে মারিতে পারেন, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারিল না। তাহারা জানিত, বাবা কেবল ভালবাসেন,

মা বকিলে মার সঙ্গে ঝগড়া করেন, তাহারা যখন যাহা চাহে, তখনই তাহা আনিয়া দেন। সেই বাবা কি মারিতে পারেন?

আমি বলিলাম, "রোগে যেমন ডাক্তারের উপর নির্ভর করিতে হয়, মোকর্দ্দমায় যেমন উকীলের উপর নির্ভর করিতে হয়, এ কাজে তেমনই মাষ্টার-পণ্ডিতের উপর নির্ভর করিতে হয়।"

সনৎকুমার বলিল, "তাহা হইলেই কি কর্ত্তব্য শেষ হয়?"

"সে বড় কঠিন কথা।" কাকাবাবুর কথা আমার মনে পড়িল—তিনি কি অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে হাসিতে হাসিতে—খেলা করিতে করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন; এমন করিয়া শিক্ষা দিতেন যে, সে শিক্ষা পাইতেই আমাদের আগ্রহ জন্মিত।

আমি সনৎকুমারকে বলিলাম, "আজ আর তোমায় গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইবে না।"

সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি?"

"সব সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে হইল।"

"এক দম?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"মঞ্জরীর এক পত্র পাইয়াছি।"

সনৎকুমার আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি তাহার পুত্রকে বলিলাম, "আজ তোমার ছুটী—তোমার মা'কে যাইয়া বল, আমি আসিয়াছি; তিনি একবার এ দিকে আসুন।"

সনৎকুমার বলিল, "ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপারটা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতেই পারি নাই। কেবল তোমার স্ত্রী কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন।"

এ দিকে সনৎকুমারের পত্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি ঘরের মধ্যে আসিলে আমি বলিলাম, "ও ঘর হইতে আসিবার দ্বারটা বন্ধ করিলে ভাল হয়।"

সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমাদের আজিকার পরামর্শ মঞ্জরীকে বাদ দিয়া করিতে হইবে—তাহার ইহার কিছু জানিয়া কাজ নাই।"

"সে জন্য চিন্তা নাই। না ডাকিলে সে এ দিকে আসিবে না।"

আমি পকেট হইতে মঞ্জরীর পত্র বাহির করিলাম।

পত্র দেখিয়া সনৎকুমার বলিল, "অত পাতার পত্র! ও যে জজ দ্বারী মিত্রের রায়!" সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমাদের দাঁড়াইয়া থাকার অভ্যাস স্কুল হইতেই হইয়াছে, তাহার পর আদলতে ত দাঁড়াইতে পাইলেই বাঁচিয়া যাই। তোমাদের ত সে অভ্যাস নাই—তোমরা অত সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে পার না। তুমি একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়—তাহাতে কেহ তোমার নিন্দা করিবে না।"

তিনি একখানা চেয়ারে বসিলেন।

তখন আমি মঞ্জরীর পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলাম। পত্রপাঠ শেষ হইয়া গেলে সনৎকুমার তাহার স্ত্রীকে বলিল, "তুমি যে বলিয়াছিলে, যখন এত বুঝাইয়াও মঞ্জরীর মত পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে না, তখন কি তবে এমন কিছু আছে, যাহা সে প্রকাশ করিতে পারে না? এখন দেখিতেছি, সেই কথাই সত্য। তোমারই জয়।

কিন্তু তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, জয়ের আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই ; তিনি মঞ্জরীর দুঃখে কাতর হইয়াছেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতেছে।

সনৎকুমারের ছেলেটি ও মেয়েটি খেলা করিতেছিল। মেয়েটি কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মা'র কাছে আসিয়া মা'কে কাঁদিতে দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার পর মা'র কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল, মা ?" তাহার মা তাহাকে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তাহার পর অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

কিছুক্ষণ আমরা কেহই কোনও কথা কহিতে পারিলাম না—সকলেরই হৃদয় চিন্তার ও বিষাদের ভারে কাতর। শেষে আমিই সনৎকুমারকে বলিলাম, "এ পত্রের পর ত আমরা যে চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহা আর করা চলে না !"

সনৎকুমার কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাহার স্ত্রী বলিলেন, "না।" তাঁহার স্বরের দৃঢ়তায় আমি আমার সঙ্কল্পের অনুকূল ভাব বুঝিতে পারিলাম—বল পাইলাম।

সনৎকুমারও বলিল, "ইহার পর আর সে চেষ্টা করা বৃথা। জানিয়া—ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করা যায় না।"

আমি বলিলাম, "তবে এখন তাহার সম্বন্ধে আমাদের আর কর্ত্তব্য কি ?"

সে ভাবিয়া বলিল, "আর কোনও কর্ত্তব্য ত দেখি না। তাহার

আশ্রয়ের অভাব নাই। তাহার পরম সৌভাগ্য, সে মামার মৃত্যুর পর বাড়ীখানা বেচিয়া ফেলিতে সম্মত হয় নাই।"

"টাকাও কিছু আছে।"

"বাড়ীর একভাগের ভাড়াতেই তাহার খরচ চলিতে পারে। তাহার পর সে মামীর যে টাকা পাইয়াছে, তাহাও বোধ হয়, সাত আট হাজার, আমি কাগজ দেখিয়া ঠিক বলিতে পারি—কয় বৎসর সে টাকার সুদও জমিয়াছে। মামার জীবন-বীমার টাকাও আমি বাহির করিয়া তাহাকে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিয়াছিলাম। গহনাও অনেক টাকার। তবে সেগুলা রাখিয়া আসিয়াছে, কি আনিতে পারিয়াছে, জানি না। যদি আনিতে নাও পারিয়া থাকে, তবে সেগুলা আনাইবার পথ পড়িয়াই আছে।"

"সুতরাং সে জন্য কোনও ভাবনা নাই। কিন্তু একটা ভাবনা আছে।"

"কি ?"

"তাহার মত সংসারজ্ঞানে অনভিজ্ঞা তরুণীর পক্ষে বাড়ী ও টাকাই যথেষ্ট আশ্রয় নহে—একজন অভিভাবকের অভাবই বড় অভাব।"

সনৎকুমার চুপ করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "সেই অভাব তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে।"

সনৎকুমার কি উত্তর দেয়, শুনিবার জন্য কৌতুহলে তাহার স্ত্রী তাহার দিকে চাহিলেন। সে ভাবিয়া বলিল, "বিবেচনা করিয়া দেখ, সে দায়িত্ব লইবার শক্তি আমার আছে কি ?"

"আর কে লইবে ? সংসারে আপনার শক্তি বিচার করিয়া সব কাজ

করিবার সুযোগ পাওয়া যায় কি? অনেক কাজ কর্ত্তব্য বলিয়াই করিতে হয়—না করিলে উপায় থাকে না। আমাদের কথাই ধর—কাকাবাবু যে দিন আমাদের হাতে সংসারের ভার দিতে চাহিয়াছিলেন, সে দিন আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম, সে দায়িত্ব লইবার যোগ্যতা আমাদের কাহারও নাই। কিন্তু তাহার পর দাদাকে আর সেজদাদাকে সে ভার লইতে হইয়াছে—সংসারের কোনও কাজে ত কোনও অসুবিধা হইতেছে না। কেবল যে অভাব পূরিবার নহে—সেই অভাব—কাকাবাবুর স্নেহের অভাব অনুভব করি।"

"তুমি আমাকে জান। বাবার আশ্রয়ে আর মা'র স্নেহে আমি একেবারে 'অকর্ম্মা' হইয়া পড়িয়াছি—কোনও ঝঞ্ঝাট্ সহিতে পারি না।"

"কিন্তু ঝঞ্ঝাট ত তাহা বলিয়া তোমাকে ছাড়িতেছে না! আরও দেখ, তুমি এতদিন আমাকে যাহা বল নাই, মঞ্জরীর পত্রে আমি তাহা জানিয়াছি; তাহার পিতা মৃত্যুকালে তোমাকেই তাহার আবশ্যক সাহায্যদানের জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। মঞ্জরীর জন্য তোমার উদ্বেগের মূলে সে অনুরোধের স্মৃতি আছে।"

"আছে। মামাকে জানিলে তুমি বুঝিতে, তাঁহার অনুরোধ আমার কাছে অনুরোধ নহে—আদেশ, অবশ্যপাল্য।"

তাহার পর সে স্ত্রীর দিকে দেখাইয়া বলিল, "তুমি যাহা জানিতে না, উনি তাহা জানিতেন, এবং যখনই স্বভাব-শিথিল আমি মঞ্জরীর কোনও কাজে শিথিল-প্রযত্ন হইয়াছি, তখনই উনি আমাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ক্রটী করেন নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি বুঝি তাহাও জানিতেন?"

সনৎকুমার উত্তর দিল, "নিশ্চয়। আমার কোন্ কথাটা উনি না জানেন?" তাহার পর সে হাসিয়া বলিল, "কতবারই মনে করি, গোপন সেরেস্তার কোনও কথা উঁহাকে জানিতে দিব না; কিন্তু যতক্ষণ উঁহাকে না জানাই, ততক্ষণ কিছুতেই স্বস্তি লাভ করিতে পারি না। মহা মুস্কিল!"

কথাটায় তখনই আমার মনে একটু চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সনৎ-কুমার তাহার কোনও কথা স্ত্রীর কাছে গোপন করে না—করিতে পারে না। ইহাতে তাহাদের কত সুখ! কিন্তু সে দিন সেই চিন্তার আঘাতে আমার রুদ্ধ কর্ত্তব্যদ্বার মুক্ত হয় নাই। আমি অভিমানের অর্গলে সে দ্বার এমনই করিয়া রুদ্ধ করিয়াছিলাম! তখন আমি মনে করিয়া-ছিলাম, আমি বিলোলাকে যেমন ভালবাসিয়াছি, কে স্ত্রীকে তদ-পেক্ষা ভালবাসিতে পারে? কিন্তু আজ কালের ব্যবধানে সে কথা মনে করিয়া দেখি, আমি কি ভ্রান্তিরই বশবর্ত্তী হইয়াছিলাম—বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যবিষয়ে অন্ধ হইয়াছিলাম। সেই অভিমান আমাকে কাকীমা'র কথা স্মরণ করিয়াও পরাজয় স্বীকার করিতে দেয় নাই। সেই অভিমান আমাকে সনৎকুমারের কথাতেও বুঝিতে দেয় নাই—আমার ভালবাসায় যদি ত্রুটী না থাকিত, তবে আমিও তাহার মত আমার সব কথা বিলোলার কাছ হইতে গোপন রাখিতে অক্ষম হইতাম। সে দিন মনে করিয়াছিলাম, আমি যে বিলোলাকে আমার সব কথা বলিতে পারি না, সে দোষ আমার নহে—বিলোলার। আজ মনে হয়, তাহার দোষ কিসে? চুম্বক যদি লৌহকে আকৃষ্ট করিতে না পারে—তবে সে দোষ চুম্বকের, না লৌহের? চুম্বকে শক্তির

অভাব না হইলে লৌহ কি অনাকৃষ্ট থাকিতে পারে? চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়াই যে লৌহের স্বভাব! দোষ আমার—ত্রুটী আমার প্রেমে, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট আমি—আমার দুর্দ্দশা আমারই ভ্রান্তির ফল; আমিই অপরাধী। আর আমারই ত্রুটীতে—অপরাধে যাহারা বেদনা পাইয়াছে, হয় ত আজও পাইতেছে, তাহাদের সেই বেদনা-দান-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হইবে? কবে অনুতাপ-তুষানল-দাহ শেষ হইবে? কবে আমি এই সব চিন্তার দংশন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া আবার শান্তিলাভ করিতে পারিব?

আমি সনৎকুমারকে বলিলাম, "তবে ত কথাই নাই।"

সনৎকুমার বলিল, "বল উঁহাকে। আমার ত সম্বলের মধ্যে উনি—উনি কি বলেন?"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এত দিন কাজের ভার সনৎকুমারের ঘাড়েই চাপাইয়াছি, এবার সে ভার আপনাকেও বহিতে হইবে।"

"আমার ভগিনীর জন্য এ অবস্থায় যাহা করিতাম, মঞ্জরীর জন্যও তাহা অবশ্য করিব"—এই কথা তিনি দৃঢ়-স্বরে বলিলেন। সনৎকুমারের কথায় যে একটু দ্বিধাভাব ছিল—তাঁহার কথায় তাহার আভাসও ছিল না। তিনি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন, প্রয়োজনের সময় নারী যত শীঘ্র সঙ্কল্প স্থির করিয়া কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইতে পারে, পুরুষ তত শীঘ্র পারে না।

আমি বলিলাম, "কিন্তু তাহাকে কাজ দিতে হইবে—তাহার আলস্যের—দুশ্চিন্তার অবসর কমাইতে হইবে।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সনৎকুমার হাসিয়া বলিল, "কি কাজ? বক্তৃতা করিবার জন্য কি তোমাদের মহিলা বক্তার প্রয়োজন আছে?" "সে বাজে কাজে লোকের অভাব নাই। লোকের অভাব আসল কাজেই হয়।"

"আমাদের দেশে সংসারের কাজই মেয়েদের কাজ; গৃহই তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র। তথায় তাঁহাদের প্রভাব অসাধারণ—প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ—প্রতাপ অসীম। সংসারটা তাঁহারাই চালাইয়া থাকেন; আর সেই জন্যই আমাদের সংসার অচল হয় না। আর সেই কাজ লইয়াই তাঁহারা বিব্রত থাকেন—আলস্য ত পরের কথা, বিশ্রামের অবসরই প্রায় পায়েন না। তাহার উপর সন্তানপালনের সব ভারও মা'র। কিন্তু মঞ্জরীর পক্ষে সংসার ত মরুভূমি হইয়াছে। এখন তাহাকে কোন্ কাজে ব্যাপৃত রাখিবে?"

"সেটা ভাবনার কথা বটে; কিন্তু সংসারে কাজের অভাবও নাই। কাজ করিবার সঙ্কল্পও মঞ্জরীর আছে। সে ত বলিয়াছে, সে কি সংসারে কাহারও কোনও উপকার করিতে পারে না যে, আপনাকে পৃথিবীর ভার মনে করিয়া আত্মনাশ করিবে? তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাতে আমার ত বিশ্বাস, সে কাজ পাইবে ও করিবে।"

"এখন কাজ পাওয়াটাই কথা। আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি ও যে আদর্শ দেখিয়াছি, তাহাতে মেয়েদের বক্তা বা শুশ্রূষাকারিণী হইবার কল্পনাও করিতে পারি না।"

"সে জন্য ভাবনা কেন? দেখিবে, তোমার ছেলে-মেয়েদের লইয়াই হয় ত তাহার একটা কাজ জুটিয়া যাইবে।"

"একটিকে পোষ্যপুত্র দিব!"

এ বিদ্রূপটুও কিন্তু ছেলের মা'র সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "ও কি কথা!"

আমি বলিলাম, "আমরা ত পিসীমা'র কাছেই 'মানুষ', জ্যেঠাই-মা'র, কাকীমা'র আদরে পালিত। পোষ্যপুত্র দিবার কথা কেন?"

তাহার পর আমি সনৎকুমারের পত্নীকে বলিলাম, "এখন আপনি মঞ্জরীকে জানাইবেন, আমরা তাহার কথায় আমাদের অবলম্বিত পথ ত্যাগ করিলাম। সে জন্য সে যেন আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। তাহার পর তাহার নূতন পথের কথা।"

সনৎকুমার বলিল, "সেই ভাল।" সে যেন দুশ্চিন্তামুক্ত হইল।

তাহার পর সে আমাকে বলিল, "এবার তোমার কাছে আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম।

সে বলিল, "আমি তোমাকে ঘুস্‌খোর বলিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, তুমি খাবার ঘুস্ খাইয়া গৃহিণীর মতে মত দাও। এখন আমাকে বলিতে হইতেছে, তুমি অভ্রান্ত মতেই ঢেরা সহি দিয়াছিলে; আমিই ভুল করিয়াছিলাম।"

"তর্কস্থলে উকীলের কথায় কি কেহ বিশ্বাস করে যে, তুমি মনে কর, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম?"

"হে উকীল-কুল-কলঙ্ক, ব্যবহারাজীব কবির সেই কথা স্মরণ কর—

'গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা'।"

"সুতরাং আজকার মত সভাভঙ্গ হইল। আমি বিদায় লইতেছি। কেবল বলিয়া যাই, আমি যখন খাবার খাই—ঘুস খাই না, তখন খাইবার দাবী আমার রহিল।"

"নিশ্চয়। কিন্তু একটা বড় অরীতি কাজ করিতেছ। আমি এ সভার সভাপতি নহি; আজ সভায় সভা-পত্নী; তিনি সভাভঙ্গের আদেশ না দিলে সভাভঙ্গ হইতে পারে না, তুমিও যাইতে পার না। আমি সভাপত্নী মহোদয়াকে ধন্যবাদ দিতেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করিতেছি, তিনি তাঁহার পেটুক দেবরটির দাবী বাকী না রাখিয়া চুকাইয়া ফেলুন।"

তাহার পত্নী ততক্ষণ মেয়েটি বক্ষে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভাল। কিন্তু আজ হইতে এ কাজ আর আমার একার নহে—যাই, মঞ্জরীকেও ডাকিয়া লই।"

তিনি চলিয়া গেলে আমি সনৎকুমারকে বলিলাম, "দেখিলে, কাজ যোগাইবার ক্ষমতা কাহার কত?"

"ঐ সব গুণেই ত যাহা করেন, সবই সহিতে হয়।"

"অস্যার্থ :—যত খাবারই দেন, সব খাইতে হয়।"

"অবশ্য।"

তাহার পর আমি সনৎকুমারের ছেলে-মেয়েকে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলায় প্রবৃত্ত হইলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ঝটিকার পূর্ব্বে

মঞ্জরীর সম্বন্ধে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ, আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে আমরা তাহার আর কোনও পথের সন্ধান করিতে পারিলাম না; সুতরাং মনে করিলাম, যে কাজ ইচ্ছা করিয়া কর্ত্তব্য করিয়া লইয়াছিলাম, সে কাজ শেষ হইল—সে যে ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া তাহার নিয়তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সে ঘটনার স্রোত নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহাকে নূতন জীবনে যে পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা সে আপনি দেখিয়াছিল—হৃদয়ের দৃঢ়তাহেতু অসহায় হইলেও সেই পথের বিপদ্ ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিল। পুরুষ লেখকগণ নারীচিত্তের চাঞ্চল্যেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন; কিন্তু সম্পদের সময় যাহাই হউক, বিপদের সময় নারীচিত্তের দৃঢ়তাই তাহাকে ও তাহার স্বজনগণকে রক্ষা করে; পুরুষ উপায় চিন্তা করিতে করিতে, নারী উপায় স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মঞ্জরীর কার্য্যে আমি নারী-হৃদয়ের সেই সঙ্কল্প-দৃঢ়তার পরিচয়ই পাইয়াছিলাম।

কাজ শেষ হইল; কিন্তু সনৎকুমারের গৃহে আমার গতায়াত কমিল না। সে মঞ্জরীর জন্য নহে—সেই পরিবারের জন্য। কুটীরাকীর্ণ পল্লীর পর্ণকুটীরবাসী সৌধশোভাময় নগরে আসিলে যেমন

তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া "যাই—যাই" করিয়াও পল্লীতে ফিরিতে বিলম্ব করে; দরিদ্র সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ পাইলে যেমন মুগ্ধনেত্রে বহুমূল্য সজ্জা দেখিতে দেখিতে প্রাসাদমধ্যে বিলম্ব করে; আমিও সেই প্রেম-সুখ-সুরভিত সংসারোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তেমনই তাহা ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলাম। আমার পক্ষে সে সংসারের সুখে মুগ্ধ হইবার বোধ হয় আরও কারণ ছিল। আমি আমার গৃহেও এমনই সাংসারিক সুখের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আমারই জীবনে সে সুখ লাভ করিতে পারি নাই। তাই সনৎকুমারের সুখময় সংসার আমাকে আকৃষ্ট করিত। সে আমার সহাধ্যায়ী—আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই শিক্ষা লাভ করিয়াছি—একই ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছি। সে যে সুখ লাভ করিতে পারিয়াছে, আমি তাহা লাভ করিতে পারি নাই কেন? তখন মনে করিতাম, বিলোলার দোষে; এখন মনে করি, আমি প্রেমে আত্মসমর্পণ করিতে পারি নাই বলিয়া। সনৎকুমার বাহিরের কাজ নিতান্তই করিতে হয় বলিয়া করিত—তাহাতে তাহার সুখ ছিল না। সে তাহার সংসারেই অক্ষয়-সুখের ভাণ্ডার পাইয়াছিল। সেই ভাণ্ডার হইতেই তাহার সকল অভাব দূর হইত। যে সময় আমরা দুই জনে মঞ্জরীর জন্য কর্ত্তব্য স্থির করিতেছিলাম, আমি অপরিচিতার কার্য্যের মনস্তত্ত্ব-বিচারের অবসর পাইতেছিলাম, সেই সময় আমি সভাসমিতির কাজ হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া আসিতেছিলাম। যে কাজে জোর করিয়া আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে কাজের কর্ত্তব্য দুর্ব্বহ ভার বলিয়া মনে করিতেছিলাম। আর সে কাজে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা ছিল না। বাবাকে

দেখিয়াছি, কাকাবাবুকে দেখিয়াছি, দাদাদের দেখিয়াছি, দুই ভগিনী-পতিকে দেখিয়াছি—সকলেই আপনার সংসারে সুখী। আমিই কেন তেমন সুখী হইতে পারি না? আমিই কেন বাহিরের কাজে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে সচেষ্ট হই? এইরূপে আমি সনৎকুমারের সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। অতর্কিত ঘটনায় যে ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবহারে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে পরিবারের সকলেই আমাকে নিতান্ত আপনার মনে করিত, আমি দুই দিন না যাইলেই সনৎকুমার বলিত, "ছেলেরা তোমায় যাইতে বলিয়াছে—তাহাদের হুকুম, তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।"

তাই, কাজ শেষ হইলেও, সনৎকুমারের গৃহে আমার গতায়াত কমিল না। আমি লক্ষ্য করিতাম, সনৎকুমারের পত্নীর সহায়তায় মঞ্জরী অনেক কাজ পাইয়াছে ও সাগ্রহে লইয়াছে। যে কাজ লইয়া সনৎকুমার মধ্যে মধ্যে বিব্রত হইত, সে কাজের ভার মঞ্জরী লইয়াছিল। সে তাহার ছেলেকে পড়াইত। সংসারের অনেক কাজে সে সনৎকুমারের পত্নীর সাহায্য করিত—তাহার ছেলেদের অনেক কাজ করিত—তাদাদের জামা শেলাই করিত, জুতা বুনিয়া দিত, টুপী প্রস্তুত করিত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতাম, যত দিন যাইতেছিল, ততই তাহার মুখে আবার চিন্তার ছায়া গাঢ় হইতেছিল। সে কি তাহার নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়া মনে করিতেছিল—সে ভুল করিয়াছে?

আমার আপনার গৃহের সুখের উৎস হইতে আমি ভ্রান্তিবশে ইচ্ছা করিয়া যত দূরে গিয়াছিলাম, তত দূরেই রহিলাম; যাঁহারা

আমাকে স্নেহ দিয়াই সুখী হইতেন, যাঁহাদের স্নেহের ভেষজে আমার হৃদয়ের সব ক্ষতই দূর করিতে পারিতাম, তাঁহাদের স্নেহ-সম্ভোগসুখ হইতেও আপনাকে বঞ্চিত করিতে লাগিলাম। আমি দূরে যাইতে চাহিলেও যাঁহারা আমাকে দূরে রাখিতে চাহিতেন না, তাঁহাদের কথাও আমি ভাবি নাই। দাদার বড় ছেলেটির সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া অভ্যাস হইয়াছিল। সে এক এক দিন সকালে চা'র মজলিসে আমাকে বলিত, "ছোট কাকা, কাল তুমি বক্তৃতা করিতে যাও নাই। অনেকে তোমার খোঁজ করিয়াছেন।" দাদা হয় ত বলিতেন, "কি সর্ব্বনাশ! রোজই কি বক্তৃতা করিতে যাইতে হয়?" সে যুবকসুলভ উৎসাহের বশে বলিত, "এখন যে অনেকে সরিতেছে।" দাদা হয় ত উত্তরে বলিতেন, "এ কি নাগ পাশ নাকি যে, ছাড়ান যায় না?"

সকালে সেই চা'র মজলিসে ব্যতীত অন্য সময় আমার সঙ্গে-ছেলেদের সাক্ষাৎ বড় হইত না। আমি যে দিন পরামর্শ-সভাদিতে না যাইতাম, সে দিন অনির্দ্দিষ্টভাবে খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিতাম—ফিরিতে বিলম্ব হইত। আমার এই পরিবর্ত্তন যে লক্ষিত হইতেছিল, তাহাতে আমার গৃহে চিন্তার কারণ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আমি ভাবি নাই। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কাকাবাবুর মৃত্যুর দিন যখন বিলোলার কথায় আপনার দংশন-বিষের যাতনায় অস্থির ভুজঙ্গের মত আমি অস্থির হইয়া প্রসূনকে বক্ষে লইয়া কাকাবাবুর ঘরে যাইতেছিলাম, তখন সিঁড়ির পরের ঘরে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে পিসীমা'কে দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, তিনি কি সব দেখিয়াছেন? সে কথা আমি ভুলিয়া

গিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি ভুলেন নাই। তিনি যে সেই দিন হইতেই আমার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই ; জানিতে পারিয়াছিলাম, যে দিন আমি আমার জীবনে প্রলয়-ঝটিকার গর্জ্জন-বিক্ষুব্ধ হইয়া আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম, সেই দিন। আর বিলোলা? তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যেমন ঘনিষ্ঠ, সাক্ষাৎ তেমনই কম হইত। কাকীমা'র স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাদের সুখের উপায় সন্ধান করিত। বিলোলার সঙ্গে আমার ভাবান্তর সে দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারি নাই। তিনি তাহা দেখিয়া যেমন আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তেমনই বিলোলাকেও কোনও উপদেশ দিয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু তিনি যে আমাদিগকে পরস্পরের নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম—বোধ হয় বিলোলাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাঁহার ব্যবস্থায় আমার অনেক কাজের ভার বিলোলার উপর পড়িয়াছিল। তিনি আবশ্যক অনাবশ্যক দ্রব্য আমার কাছে বিলোলাকে দিয়া পাঠাইতেন। এমনই ভাবে তিনি কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; হয়ত মনে করিয়াছিলেন, এমনই ভাবে আমরা পরস্পরের কাছে আসিলে, দুই জনের মধ্যে যে অভিমানের ব্যবধান জন্মিয়াছে, তাহা দূর হইয়া যাইবে। হয় ত তিনি আপনার অভিজ্ঞতা দিয়া বিচার করিয়া বুঝিয়াছিলেন, সঙ্কোচ যে স্থানে মিলন-বাসনার পূর্ণতার অন্তরায় হয়, সে স্থানে সঙ্কোচ সহজেই দূর করা যাইতে পারে। তিনি যে ভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে কি হইত, বলা যায় না। কিন্তু আমার—

আমাদের ভাগ্যদোষে আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। তিনি মরণাহত হইয়াও আমার কথা বিস্মৃত হয়েন নাই; তখনও তাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আমাকে সেই উপদেশ দিয়াছিল—"ছেলেমানুষ—যদি কোনও দোষই করিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি রাগ করিতে আছে? ছিঃ—ঝগড়া করিস্ না।"

তাহার পর যাঁহারা সে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাকীমা'র অবলম্বিত পথ অবলম্বন করেন নাই। আমার জন্য তাঁহা-দের যে দুর্ভাবনা ছিল, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু কাকীমা'র মত তাঁহারা তাহা ব্যক্ত করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করেন নাই—দুর্ভাবনা গোপনে হৃদয়ে রাখিয়া যাতনা পাইয়াছেন। সে যাতনা আমারই জন্য—আমার প্রতি তাঁহাদের স্নেহহেতু। আজ সেই যাতনা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া আমাকেই পীড়িত করিতেছে।

কাকীমা'র ব্যবস্থায় আমার যে সব কাজের ভার বিনোদা পাই-য়াছিল, ক্রমে সে সব আবার তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, বাড়ীতে আমার কাজই কমিয়া গিয়াছিল। সকালে চা'র মজ্‌লিসে আমরা সমবেত হইতাম; তাহার পর যে যাহার কাজে বাহির হইয়া যাইতাম। দাদারা আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন; আমি সভাসমিতির অছিলায় বাহিরে থাকিতাম; কোনও দিন সনৎকুমারের গৃহে, কোনও দিন বা ঘুরিয়া সময় কাটাইয়া রাত্রিতে যখন ফিরিয়া আসিতাম, তখন হয় ত দাদাদের আহার হইয়া গিয়াছে—পিসীমা, মা, জ্যেঠাইমা আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। বাড়ীতে আমি যত কম সময় পারিতাম, থাকিতাম। ছুটীর দিন হয়

ত কোনও কাজে একবার বিলোলাকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু তাহাতে তাহার মুখে বিষণ্ণভাব ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিতাম না। এক দিন যাহার মুখ অন্ধকার দেখিলে কত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছি, এখন তাহার বিষণ্ণভাবেও আমার চিত্ত চঞ্চল হয় নাই।

সে কি ভাবিত, বলিতে পারি না। কিন্তু সে কি আমার ব্যবহারে তাহার জীবনের ব্যর্থতা অনুভব করিত না? আমি যখন বাহিরের কাজে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিবার চেষ্টা করিতাম, তখন সুদীর্ঘ অবসরে সে কি দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হইত না? নিদ্রাহীন রজনীতে আমি যখন পুস্তক লইয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতাম, তখন সে কি আমাকে লক্ষ্য করিত না? সে কি তাহারই শয্যায় সুপ্ত পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া হৃদয়ের—জীবনের শূন্য পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিত না? সে কি বিনিদ্র হইয়া অশ্রুপাত করে নাই? সে কি তাহার পিতৃগৃহের ও আমার গৃহের আর সকলের সঙ্গে তাহার অবস্থার তুলনা করিয়া আপনার দুর্ভাগ্য দেখিয়া ব্যথিত হইত না? সে কি ভাবিত না—কি দোষে সে সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখলাভে বঞ্চিতা? তাহার মুখে যে লাবণ্যের—যে প্রফুল্লতার অভাব লক্ষ্য করিয়া অপর্ণা আমাকে বলিয়াছিল, তাহা কি তাহার মানসিক কষ্টেরই বাহ্য বিকাশ নহে? মূর্খ আমি—সে সব বুঝিতে পারি নাই।

আমার অভিমান—ভ্রান্তি কি আমাকে কেবল বিলোলার সম্বন্ধেই কর্ত্তব্যচ্যুত করিয়া নিরস্ত হইয়াছিল? ভ্রান্তিতে ভ্রান্তি বর্দ্ধিত হয়। তাই আমি সকলের সম্বন্ধেই কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছিলাম। যে মাতার

জীবন হইতে জীবন লইয়া তাঁহারই বক্ষের শোণিতে বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, যে পিসীমা'র অঙ্কে আমি পালিত হইয়াছিলাম, যে জ্যেঠাইমা আমাদিগকে লইয়াই অপত্যহীন জীবনের দুঃখ ভুলিয়াছিলেন, যে দাদারা অপরিমেয় স্নেহবশে আমার কোনও কার্য্যেই কোন ত্রুটীও দেখিতে পাইতেন না—আমার সম্বন্ধে যাঁহাদের অবিচলিত বিশ্বাস কিছুতেই বিচলিত হয় নাই, যে ভগিনীরা আমাকে স্নেহসুখে সুখী করিতে পারিলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেন, যে ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীরা আমাকে পাইলে কত আনন্দিত হইত, আমি তাহাদের প্রতিও কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছিলাম। আর কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছিলাম—যে আমার দগ্ধ জীবন-মরু-ভূমির শান্তি-প্রস্রবণ, সেই আমার পুত্রের প্রতি। যদি আমি কেবল তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারিতাম, তাহা হইলেই বোধ হয় এত ভ্রান্ত হইতে পারিতাম না। তাহা হইলেই আমি গৃহের আকর্ষণ অবহেলা করিয়া যাইতে পারিতাম না। তাহা হইলে আমি গৃহে, প্রেমে না হইলেও, স্নেহে, ভালবাসার সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারিতাম। তাহা হইলে কালে কি হইত, বলিতে পারি না। কারণ, গ্রহ-তারকা-দলে গঠিত সূর্য্যমণ্ডলের আকর্ষণ ছিন্ন করিতে না পারিলে যেমন কোনও গ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইতে পারে না, সংসারের আকর্ষণ ছিন্ন করিতে না পারিলে তেমনই কোনও মানুষেরই জীবন ব্যর্থ হয় না—সেই আকর্ষণই তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যপালন করাইয়া তাহার জীবন সার্থক ও ধন্য করে।

আর আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছিলাম, যে সংসারের সুখময়, শান্তিময়

অঙ্কে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই সংসারের প্রতি। সে সংসারের সুখ-জ্যোৎস্না আমারই ব্যবহারের মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। আমি সেই আশ্রয়-কাননে স্বহস্তে অগ্নিযোগ করিয়া আসিয়াছি। সে অগ্নি কি নির্ব্বাপিত হইয়াছে? আর আমি? আমি কি সেই বহ্নিদাহ হইতে পলাইতে পারিয়াছি? আমি সেই বহ্নি বক্ষে বহিয়া বেড়াইতেছি। তাহার দাহ-যন্ত্রণা আমাকে কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে দিতেছে না; আমি ছুটিয়া বেড়াইতেছি। সংসারে যে যায়—তাহাকে আর পাওয়া যায় না, সত্য; কিন্তু ব্যক্তিগত অভাব ছাড়া তাহার বিয়োগের আর সব অভাবই একরূপে পূর্ণ হয়; নহিলে সংসার টিকিতে পারে না। বিশেষ, হিন্দুর সংসার—দশ জনকে লইয়া—একের অভাব দশ জন পূর্ণ করে। বনভূমিতে দাবদাহে যদি তাহার শোভা নষ্ট হয়, তবে কিছুদিন পরে হিমের শিশিরে ও বর্ষার বর্ষণে সেই ভস্মরাশির উপর তৃণাস্তরণ বিস্তৃত হয়—আবার বৃক্ষলতাগুল্মে সে ক্ষত মুছিয়া যায়। সংসারেও তেমনই হয়; স্নেহের শিশিরে ও কর্ত্তব্যের বর্ষণে আবার শ্মশানে কুসুমশোভা বিকশিত হয়। তাই যে সংসার বাবার মৃত্যুতে নষ্ট হয় নাই, কাকীমা'র ও কাকাবাবুর মৃত্যুর পরও যে সংসারে হাসির জ্যোৎস্না নির্ব্বাপিত হয় নাই, সে সংসারে আমার অভাবও অসহনীয় হয় নাই। জানি, মা প্রতিদিন পূজার সময় তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে স্মরণ করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন, যে তাঁহার কাছ হইতে দূরে যাইলেও স্নেহ হইতে দূরে যাইতে পারে নাই, সে যে স্থানেই থাকুক না কেন, যেন সুস্থ থাকে—সুখী

হয়। জানি, পিসীমা প্রসূনকে দেখিয়া আমার জন্য অশ্রুবর্ষণ করেন। জানি, জ্যেঠাইমা আমার কথা স্মরণ করিয়া সময় সময় দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করেন। জানি, উৎসবে—আনন্দে দাদারা আমার জন্য দুঃখ করেন। জানি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন তিন ভাইকে ফোঁটা দিবার সময় আর এক জনের জন্য দিদির ও অপর্ণার চক্ষু ছল-ছল করে। তবুও আমার অভাব সংসারে আর তেমন প্রবলভাবে অনুভূত হয় না! বিলোলার পক্ষে আমি মৃত—কিন্তু আমি কি বিস্মৃত? সেও কি উৎসবাদিতে তাহার পরিচিতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়া নিদ্রাহীন নিশীথে আমার কথা একবার মনে করে না? এত দিনে আমার প্রতি তাহার বিরক্তি কি করুণায় পরিণতি লাভ করে নাই? কিন্তু প্রসূন? আমি যেমন করিয়া আমার এই বেদনা-বিক্ষত হৃদয়ে বাবার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছি, পূজা করিবার অবকাশ পাইয়াছি, সে ত তেমন অবসর পায় নাই? কিন্তু তাহার কাছে আমি বিস্মৃত, এ কথা মনে করিলে আমি আর স্থির থাকিতে পারি না; এ কথা মনে করিলে এখনও ইচ্ছা হয়, ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে বক্ষে ধরিয়া বক্ষ শীতল করি, বলি—"বৎস, পিতার অপরাধ ক্ষমা কর—তাহাকে তোমার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিও না—স্মৃতি হইতে দূর করিয়া দিও না।"

সে সংসারে আমার অভাব দূর না হইলেও অসহনীয় নাই। কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহার অভাব যে দিন চলিয়া আসিয়াছিলাম, সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কমে নাই। সেই সংসারে আমি আমার সর্ব্বস্ব রাখিয়া আসিয়াছি—আর কি লইয়া সুখ—শান্তি—সান্ত্বনালাভের আশা করিব? দাবদাহের পর কাননের হতশ্রী আবার ফিরিয়া

আইসে, আবার পত্রে পুষ্পে কানন সুন্দর হয়, আবার বিহগের বিরাগে কানন মুখরিত হয়; কিন্তু যে তরুর কোটরস্থ বহ্নি হইতে অনল চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়, সে তরুর শ্যাম-শোভা আর ফিরে না—সে আর পত্রপুষ্পে শোভিত হয় না—তাহার রিক্ত শুষ্ক শাখায় বিহগও উপবিষ্ট হইয়া গান করে না—বুঝি বনের লতাও তাহার শুষ্ক—শীর্ণ শরীর শ্যামশোভায় আবৃত করিয়া দিতে চাহে না। সে মার্ত্তণ্ডতাপে তপ্ত হয়, কিন্তু নিশার শিশিরে শীতল হইতে পায় না। কারণ, তাহার শুষ্ক দেহে সরসতা-সঞ্চারের উপায় নাই—সে ক্ষমতা সে হারাইয়াছে। তবে আমার দুর্দ্দশা ঘুচিবে কেমন করিয়া?

বিস্মৃতি ব্যতীত স্মৃতির দংশন-যন্ত্রণার ভেষজ নাই। কিন্তু সে ভেষজ আমাকে কে দিবে? যে বৈদ্য সে ভেষজ দিতে পারেন, আমি তাঁহার শরণ লইয়াছিলাম, কিন্তু সাধনায় তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারি নাই; ধর্ম্মের জন্য আমি ধর্ম্মের সাধনা করি নাই—সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই। যে নিজ কর্ম্মদোষে নির্ঝরোদ্গতবারিস্নিগ্ধ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অগ্নিবর্ষী বালুকাপূর্ণবায়ু মরুভূমিতে গমন করে, সে তাহার দুর্দ্দশার জন্য কি আর কাহাকেও দায়ী করিতে পারে?
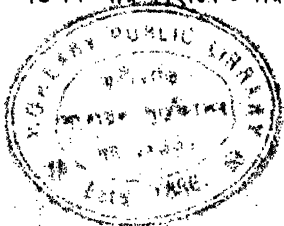
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ঝটিকা

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—মাসের পর মাসও কাটিল। আমি কোনও দিকে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। যাহার জীবন বেসুরা বাজে, সে যেমন থাকে, আমি তেমনই ছিলাম। কিন্তু আকাশের প্রান্তে—দূরে ধীরে ধীরে যে মেঘসঞ্চার হইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। সহসা—তাহার দূরাগত গর্জ্জন আমার শ্রবণগোচর হইবারও পূর্ব্বে—দূরে চক্রবালে বিলয়ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের রেখা আমার দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বে আমি সহসা সেই ঝটিকার আবর্ত্তে পড়িলাম। তাহার গর্জ্জনে আমি বিহ্বল হইলাম, বিদ্যুদ্দীপ্তিতে আমার নয়ন যেন ঝল্‌সিয়া গেল; আমি বিচার বিবেচনার সময় পাইলাম না, স্থির হইয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের অবকাশ পাইলাম না, সম্মুখে যে পথ পাইলাম, সেই পথেই দ্রুত পলায়ন করিলাম। তাহার পর? তাহার পর যখন বুঝিলাম, আমি ভ্রান্ত হইয়াছি, তখন ফিরিবার আর পথ পাইলাম না। তাই আমি আজও সেই পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—আলয় নাই, আশ্রয় নাই, আশা নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বিরতি নাই; যেন দুঃস্বপ্নচালিত হইয়া আপনার উপর সব প্রভাব হারাইয়া ঘুরিতেছি। কোনও লক্ষ্য নাই, কোনও উদ্দেশ্য নাই, দূরে—অনতিদূরে

কোথাও শান্তির আশা নাই। মৃত্যুর প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি ;—কই, তাহাও ত নয়ন-গোচর হয় না।

সে দিন মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর আবার আদালতের কাজ আরব্ধ হইয়াছে। সনৎকুমার একটি মোকর্দ্দমার জন্য এজলাসে গিয়াছে ; আমি উকীলদিগের বসিবার ঘরে বসিয়া বিলাতী সংবাদপত্রের সংবাদ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ; এমন সময়ে সনৎকুমারের সহিস তাহার নামে একখানা পত্র লইয়া আমার কাছে আসিল। মুখ তুলিয়া তাহার হাত হইতে পত্রখানা লইলাম। সে বলিল, সনৎকুমারকে পত্রখানা দিবার জন্য তাহার স্ত্রী তাহাকে গাড়ী দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

কোন্ এজ্‌লাসে সনৎকুমারের মামলা ছিল, তাহা আমি জানিতাম। আমি সেই এজ্‌লাসের সম্মুখে বারান্দায় তাহাকে পাইলাম। সে মামলা জয় করিয়া ফিরিতেছিল। আমি তাহাকে পত্র দিলাম। সে খাম ছিঁড়িয়া পত্র পড়িল।

পত্র পাঠ করিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার হৃদয় কম্পিত হইল। সে পত্রখানি আমাকে দিল। মঞ্জরী বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে!

আমি বলিলাম, "চল, আমরা যাই।"

সনৎকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "চল।"

নথিপত্র গুছাইয়া লইয়া আমরা যাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। উঠিবার সময় সনৎকুমার বলিল, "এ কি হইল?"

গাড়ীতে আমরা উভয়েই নীরব—উভয়েই ভাবিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, মঞ্জরীর জীবনে সে যেন কেবল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রামে

মানুষের চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিয়া—সে চেষ্টায় অদৃষ্টের উপহাস জানাইয়া চলিয়া গেল! অদৃষ্টের নির্দ্দেশ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার স্নেহশীল পিতার প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—তিনি সত্য সত্যই সেই চেষ্টায় প্রাণপাত করিয়াছেন। সেই নির্দ্দেশ হইতে তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, সে তাহার আশ্রয় সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা ক্ষীণ হইলেও আন্তরিক—সে চেষ্টাও পদে পদে ব্যর্থ হইয়াছে। আজ সব শেষ। কিন্তু আজ সহসা সে কেন এমন কাজ করিল? আজ কি সহসা কোনও কারণের উত্তেজনায় সে এ কাজ করিয়াছে; না সে যে পথ লইয়াছিল, সে পথে জীবনের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়া—বিরাট্ ব্যর্থ শূন্য পূর্ণ করিবার কোন উপায় না পাইয়া সে আত্মনাশ করিয়াছে? কে বলিবে? তাহার জীবন-রহস্য তাহারই সাহায্যে আমরা ভেদ করিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার মৃত্যু-রহস্য ভেদ করিতে পারিব কি? পারিয়াই বা কি হইবে? অকারণ কৌতুহলনিবৃত্তি। অন্য কাহারও সম্বন্ধে হইলে সে কাজে আমার আগ্রহ থাকিতে পারিত। কিন্তু মঞ্জরীর সম্বন্ধে সে আগ্রহ ছিল না। কেন না, তাহার কল্যাণ-কামনায় আমি যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, সে চেষ্টার ব্যর্থতার অনুভূতি আমাকে ব্যথিত করিতেছিল। সনৎকুমার যে দিন আমাকে বলিয়াছিল, "আমাকে যদি মঞ্জরীর দাদার কাজই করিতে হয়, তবে তুমিও আমাকে সাহায্য কর। আমার আপনার ভগিনী থাকিলে সে কি তোমাকে লজ্জা করিত? সে যদি এমন অবস্থায় পড়িত, তবে তুমি কি তাহাকে বুঝাইতে না?" সেই দিন হইতে আমি তাহার সম্বন্ধীয় সকল কাজেই

সনৎকুমারকে, তাহার দাদাকে, সাহায্য করিয়াছি; তাহারই কর্ত্তব্যের অংশ লইয়াছি। মঞ্জরীও আমার সঙ্গে তেমনই ভাবে ব্যবহার করিয়াছে—কোনও সঙ্কোচ করে নাই। রক্তের সম্বন্ধ বা সামাজিক সম্বন্ধ ব্যতীতও মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়—সে সম্বন্ধ অনেক সময় পারিবারিক সম্বন্ধ অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ ও মধুর হয়; কারণ, তাহা বাধ্যতা-মূলক নহে—স্বেচ্ছাসংস্থাপিত, তাহাতে স্বার্থের সংঘর্ষ নাই—ঈর্ষ্যার লেশ নাই। যে তাহা বুঝিতে পারে নাই, সে জীবনে কখনও প্রকৃত বন্ধুত্বের আস্বাদ পায় নাই। তাই সনৎকুমারের ভগিনী মঞ্জরীর মৃত্যু আজ আমার পক্ষে সত্য সত্যই বেদনার কারণ হইয়াছিল।

গাড়ী বাড়ীর দ্বারে আসিল। আমরা অবতরণ করিয়া দ্রুত দ্বিতলে গমন করিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া সনৎকমারের পত্নী কাঁদিয়া ফেলিলেন—"কিছুতেই তাহাকে রাখিতে পারিলাম না!" আমার মনে পড়িল, তিনি এক দিন দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন, "আমার ভগিনীর জন্য এ অবস্থায় যাহা করিতাম, মঞ্জরীর জন্যও তাহা অবশ্য করিব।" মঞ্জরীর কল্যাণকামনায় অনুষ্ঠিত কোনও কার্য্যে সনৎকুমারের যত্ন ও উৎসাহ শিথিল হইতে দেখিলে, তিনি সে শিথিলতা দূর করিয়া দিয়াছেন। তিনি নারীহৃদয়ের করুণার উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়া তাহার দগ্ধ হৃদয় শীতল করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি মঞ্জরীর ভগিনীর কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহার অশ্রু দেখিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না।

সনৎকুমারের মেয়েটি ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া বোধ হয় ভাবিয়াছিল, মঞ্জরীর অসুখ হইয়াছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কাকা,

পিসীমা'র কি অসুখ?" আমি তাহাকে আদর করিয়া বলিলাম, "আমরা যাই—দেখিয়া আসি।"

তাহার পর আমরা মঞ্জরীর কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সনৎকুমারের পত্নী তাঁহার গৃহের চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি সেই কক্ষে আমাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সনৎকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলেন?"

তিনি বলিলেন, "সব শেষ হইয়া গিয়াছে।"

পিতার মৃত্যুর পর হইতে মঞ্জরী তাঁহারই শয়নকক্ষে তাঁহারই শয্যায় শয়ন করিত। সে লিখিয়াছিল, হৃদয়বেদনায় কাতর হইয়া সেই শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এক একবার তাহার মনে হইত, সে যেন পিতৃবক্ষে কাঁদিবার সুখ পাইতেছে। আজ সেই শয্যায় সে শেষ শয়ন গ্রহণ করিয়াছিল। পার্শ্বে একটি ছোট টেবলে বিষের শিশি—সে বিষ গ্রহণ করিলে জীবনান্ত হইতে আর বিলম্ব হয় না। মুখে বিকৃতির কোনও চিহ্ন—যাতনার রেখামাত্র নাই; যেন সে ঘুমাইতেছে। জীবনে সে যে শান্তি পায় নাই, সেই শান্তি লাভ করিয়াছে। কেশ, বেশ, অলঙ্কার, কিছুই দেখিয়া বুঝা যায় না, সে মহাযাত্রার আয়োজন করিয়াছিল; সে সব দিকে সে লক্ষ্যই করে নাই।

সে আহারের পর আপনার ঘরে আসিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে সনৎকুমারের পত্নী তাহাকে দেখিতে যাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার সংজ্ঞা-শূন্য দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে; সে আত্মনাশ করিয়াছে। তখনই সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

সে কেন এ কাজ করিল, তাহার কোনও কারণ আমরা বুঝিতে

পারিলাম না ; সে তাহার কোনও উপায় রাখিয়া যায় নাই। যেন সে তাহার মৃত্যুর রহস্য একান্তই দুর্ভেদ্য করিবার জন্য সে রহস্য তাহার সঙ্গে চির-রহস্যের দেশে লইয়া গিয়াছে। হয় ত সে মনে করিয়াছিল, যে ব্যর্থ জীবন সে তুচ্ছ বলিয়া ত্যাগ করিল, তাহার অবসান-কথা আর কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন নাই। সংসার তাহাকে আপনার করিতে পারে নাই—সে সংসার হইতে যখন আপনার চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে, তখন সে আর কাহার কাছে তাহার কারণ-নির্দ্দেশ করিবে? কেন করিবে? তবুও মনে হইতেছিল, যে দৃঢ় চিত্তে এক দিন বলিয়াছিল, "মরিব কেন?" সে যদি তাহার কোন নূতন বেদনার কারণ ঘটিলে, সে কথা আমাদিগকে জানাইত! আমি তাহার কেহ নহি ; কিন্তু পরও ত নহি!

মঞ্জরীর শব দাহ করিয়া সনৎকুমারের গৃহ হইয়া যখন বাড়ীতে আসিলাম, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে ; দাদারা শুইতে গিয়াছেন—মা ও পিসীমা আমার জন্য বসিয়া আছেন। সে দিন একাদশী। আমি অন্য দিন যাহাই করি, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাসী মা'র, পিসীমা'র ও জ্যেঠাইমা'র কথা মনে করিয়া একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিতাম। সে দিন তাহা হয় নাই। আহারে রুচি ছিল না—দুশ্চিন্তায় ও চিতানলতাপে মস্তকে যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। তথাপি—আপনার আগমন-বিলম্বে লজ্জিত হইয়া—তাড়াতাড়ি আহার করিতে বসিলাম। কিন্তু আহার করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাহা দেখিয়া পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি কোথাও খাইয়া আসিয়াছিস্?"

আমি বলিলাম, "না।"

"তবে কি তোর অসুখ করিয়াছে? মুখ-চোখ যে কেমন দেখাইতেছে!"

"শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না।"

"তবে আর খাইয়া কাজ নাই। বার মাস ত্রিশ দিন কেবল সভা আর সভা, কোনও দিন সময়ে খাওয়া নাই। এ কি শরীরে সহে? কাল হইতে তুই যদি আর অমন করিস্, তবে আমি কাশী চলিয়া যাইব। তখন—আমি দেখিতে না আসিলে, তুই যাহা ইচ্ছা করিস্।"

আহারের দায়ে অব্যাহতি পাইয়া উঠিয়া পড়িলাম; পিসীমা'কে বলিলাম, "তুমি যদি কাশী যাও, তবে আমার খাবার আগ্‌লাইবে কে? রোজ বিড়ালে খাবার খাইয়া যাইবে।"

তিনি বলিলেন, "কাল থেকে আমি তোর খাবার তোর ঘরে ছোট বৌমা'র কাছে রাখিয়া আসিব।"

ঘরে যাইয়া শয়ন করিলাম। যে খাদ্য উদরস্থ হইয়াছিল, তাহাতেই প্রবল বিবমিষার উদ্রেক হইতে লাগিল—নিদ্রাবেশ হইল না। অল্পসময়-মধ্যেই বিবমিষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া—মুখর হইয়া উঠিল। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় গমন করিলাম—উদরস্থ খাদ্য আর উদরস্থ রাখিতে পারিলাম না।

সে শব্দ মা'র ও পিসীমা'র কর্ণগোচর হইয়াছিল। দ্বারে মা'র ডাক শুনিলাম—"বিকাশ!"

দ্বার খুলিয়া দিলাম; কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, যাইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। দেখিলাম, মা ঘরে প্রবেশ করিতে একটু ইত-স্ততঃ করিতেছেন। বোধ হয়, তিনি মনে করিতেছিলেন, হয় ত

বিলোলা ঘরে আছে। পিসীমা প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিলেন; মা তাঁহার পশ্চাতে আসিলেন।

পিসীমা বলিলেন, "মাথা ধরিলে যে জল মাথায় দিস্, তাহা নাই?"

আমি শেল্ফের উপর অ-ডি-কোলনের শিশি দেখাইয়া দিলাম।

মা একটি কাপে সুরাই হইতে জল ঢালিয়া তাহাতে অ-ডি-কোলান মিশাইয়া লইলেন; আমার মাথা ধৌত করিয়া তোয়ালে দিয়া মুছাইয়া দিলেন। ততক্ষণে পিসীমা একখানি পাখা আনিয়াছিলেন। মা আমার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, পিসীমা বাতাস করিতে লাগিলেন।

বাল্যকালে তাঁহার কাছে যেমন স্নেহ-শুশ্রূষা পাইয়াছিলাম, কাকীমা'র মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে এক দিন তাঁহার কাছে তেমনই স্নেহ-শুশ্রূষা পাইয়াছিলাম। সেই দিন তিনি বিলোলার সঙ্গে আমার ভাবান্তরের কথায় আমাকে সদুপদেশ দিয়াছিলেন। আর তাঁহাদের পক্ষে আমি মৃত হইবার পূর্ব্বদিন মা'র ও পিসীমা'র কাছে সেই ব্যবহার পাইলাম; কিন্তু তখনও বুঝিতে পারি নাই, এ জীবনে সেই ব্যবহারলাভের সৌভাগ্য আর হইবে না। ভ্রান্তির বেগ তখনও আমাকে সংসার হইতে ভাসাইয়া লইতে পারে নাই—তখনও সে কথা আমি কল্পনা করিতে পারি নাই।

সেই স্নেহ-শুশ্রূষা-সুধামৃত পান করিতে করিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িলাম, জানি না। কিন্তু তাহার আস্বাদস্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই—তাহার জন্ম আজও হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে প্রসূনের ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া মুখ-প্রক্ষালনের পর তাহাকে লইয়া যখন চা'র মজলিসে উপস্থিত হইলাম, তখন দাঁদা বলিলেন, "বিকাশ তোমার মুখ বড় শুষ্ক দেখাইতেছে কেন?" আমি বলিলাম, "কা'ল শরীরটা ভাল ছিল না—রাত্রিতে বমি হইয়াছিল।" তিনি বলিলেন, "একটু সাবধান থাকিও—দুই চারি দিন বিশ্রাম কর।"

আদালতে যাইয়া দেখিলাম—সনৎকুমার আইসে নাই। বোধ হয়, পূর্ব্বদিনের শ্রান্তিহেতু সে আসিতে পারে নাই। আমারও শরীর ভাল ছিল না। একবার মনে হইল, বাড়ী যাই। কিন্তু শেষে সনৎকুমারের খোঁজ লইতেই যাইলাম।

তাহার সঙ্গে মঞ্জরীর কথাই হইল। মঞ্জরীর শোকে তাহার স্ত্রীকেই বিশেষ কাতর দেখিলাম। তিনি পুনঃ পুনই তাহার কথা বলিলেন—তাহার জন্য দুঃখ করিলেন—তাহার জন্য অশ্রুপাত করিলেন, "যাহাদের অবলম্বন ও আশ্রয় নহিলে চলে না, তাহাদের রাগ করা সাজে না। সহগুণ হারাইলে আমাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য হয়। কি কপাল লইয়াই জন্মিয়াছিল! শৈশবেই মা'কে হারাইয়াছিল—বিবাহের পর হইতেই দুঃখ পাইয়া শেষে এই কাজ করিল! সংসারে তাহার জন্য কাঁদিবার কেহ নাই!" বলিতে বলিতে কিন্তু তাহার শোকে তাঁহার নয়নপল্লব সিক্ত করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমাদের দুই জনের নয়নও অশ্রুশূন্য রহিল না।

যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন দাদারা আহারের স্থানে সমবেত হইয়াছেন। আমার কক্ষদ্বার হইতে সে বারান্দা দেখা যায়।

আসন গ্রহণ করিতে করিতে মেজদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিকাশ আইসে নাই ?"

পিসীমা বলিলেন, "না।"

কৌতুহলবশে আমি কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে স্থানটায় আলোক কম, তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলেন না।

মা পিসীমা'র দিকে চাহিলেন। পিসীমা দাদাদের বলিলেন, "রোজই এমনই হয়। কোথায় যায়—কি করে ? তোরা ত কিছুই বলিস্ না। আমার, বাপু, ভয় করে।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "এত সভ্য করিতেও পারে ! জানই ত পিসীমা, কাকাবাবু বলিতেন, ও কবিতা লেখে—ও পাগল।"

আমার প্রতি দাদার অপরিমেয় বিশ্বাসের পরিচয়ে পরিতৃপ্ত হইলাম ; একবার ভাবিলাম, যে স্নেহ এমন বিশ্বাস উৎপাদিত করে, সেই স্নেহেই কি মানুষ সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে না ?

কিন্তু চিন্তার অবসর পাইলাম না। পিসীমা বলিলেন, "কি জানি, বাছা, ছোট বৌমার সঙ্গে বাক্যালাপ নাই।"

যেন সহসা অতর্কিত মেঘগর্জ্জনে চমকিত হইয়া দাদারা পিসীমা'র দিকে চাহিলেন। কিন্তু মেজদাদার নয়নে যে ভীতভাব লক্ষ্য করিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। আর সকলের দৃষ্টিতে বিস্ময়ই বিকশিত হইল।

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কত দিন ?" তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, দাম্পত্য-কলহের একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে পিসীমা কল্পনায় অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পিসীমা বলিলেন, "অনেক দিন। যে দিন"—তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন—"প্রকাশ যায়, তাহার পূর্ব্বদিন হইতেই আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।"

দাদা বলিলেন, "এত দিন!"

"মনে করিয়াছিলাম, ও কিছু নহে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আর তোদের না বলিলে চলে না।"

মেজদাদা আর খাইতে পারিলেন না। উঠিয়া যাইবার সময় বলিলেন, "পিসীমা, তুমি আজই তাহাকে বলিও, কা'ল সকালে একবার আমার ঘরে যায়।"

একটু ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আমিই ডাকিয়া লইয়া যাইব।"

আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। আলো জ্বালিলাম না। দাদাদের খাওয়া হইয়া গেলে, আহার করিতে আসিলাম। পিসীমা বলিলেন, "প্রভাস তোকে কাল সকালে তার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছে।"

খাইয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘরে গেলাম—মেজদাদাকে কি বলিব?

যদি মেজদাদার সঙ্গে দেখা হইত, তবে বোধ হয়, যে সুযোগ একবার আসিয়া কাকীমা'র মৃত্যুতে চলিয়া গিয়াছিল—আমরা যাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই—সেই সুযোগ আবার পাইতাম। তাহা হইলে হয় ত জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইত—সব থাকিতে নিঃস্ব হইয়া এমন ভাবে যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হইত না।

কিন্তু তাহা হইল না। আসিয়াই টেবলের উপর একখানি পত্র দেখিলাম। পত্র মঞ্জরীর!

মঞ্জরী লিখিয়াছে—"আরও দুইবার বিপদে পড়িয়া আপনাকে পত্র

লিখিয়াছি—আজও বিপদে পড়িয়া পত্র লিখিতে বসিয়াছি। তবে সে দুইবার বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, এবার কেবল বিদায় লইতেছি। এবার আমি যে বিপদের সম্মুখীন, সে বিপদ্ হইতে আমাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। সংসারে যাহার কেহ নাই, সে কেন বিদায়ের কথা মনে করে? সে কথা সত্য। কিন্তু আমার জন্য আপনি যাহা করিয়াছেন, বিদায়ের সময় তাহার সমুজ্জ্বল স্মৃতি লইয়া একবার আপনাকে ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতার কথা না জানাইয়া ত বিদায় লইতে পারি না। শুনিয়াছি, মেঘান্ধকার নিশীথে বাত্যাতাড়িত সমুদ্রে পথহারা নাবিক ধ্রুবতারা দেখিয়া পথ নির্ণয় করিতে পারে। আমার জীবনে আমি যখনই দুশ্চিন্তার অকূলে কূল পাই নাই, তখনই আপনি ধ্রুবতারার মত দেখা দিয়াছেন। কিন্তু আমি ভ্রান্ত হইয়াছি—ভ্রান্তিবশে ধ্রুবতারার সন্নিহিত হইবার দুরাশা-চালিত হইয়াছি। তাই আজ যে বিপদে পড়িয়াছি, সে বিপদ্ হইতে আর উদ্ধারের উপায় নাই।

"এক দিন বিদ্যুল্লতার পরিণাম দেখিয়াও মনে করিয়াছিলাম—ঐ পথ ছাড়া কি আর পথ নাই? স্ত্রীলোক কি পিতার স্নেহ, পতির প্রেম, সন্তানের স্নেহ—এই সকলের একটা অবলম্বন না পাইলে থাকিতে পারে না? তাহার শূন্য হৃদয় কি আর কিছুতেই পূর্ণ হয় না? সে দিন বলিয়াছিলাম, আপনার হৃদয় সন্ধান করিয়া যদি মরিবার কোন কারণ পাইতাম—তবে মরিতে পারিতাম—মরিতাম। সে দিন যে দর্পে জীবনের পথেই অগ্রসর হইয়াছিলাম, আমার সে দর্প চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। জীবনে যাহা পাই নাই, তাহা পাইবার ও যাহা দিবার অবসর

পাই নাই, তাহা দিবার প্রবল বাসনা আমাকে পীড়িত করিতেছে। তাই আমার শিক্ষা—আমার সংস্কার—আমার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আমাকে বাঁচিতে দিবে না। আজ মৃত্যুর পথ ব্যতীত আমার আর পথ নাই। দাদার, বৌদিদির ও আপনার অপ্রত্যাশিত—অপরিমেয় স্নেহের সুখস্মৃতি লইয়া আমি সেই পথের পথিক হইলাম। আমার অনেক অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—যদি ইহাতে আমার অপরাধ হয়, স্নেহগুণে এ অপরাধও ক্ষমা করিবেন—আমার স্মৃতিকে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না; যদি কখনও আমার কথা স্মরণ করেন—আমাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া স্মরণ করিবেন।"

পত্র পাঠ করিয়া শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইলাম। জীবনের পরপার হইতে—মৃত্যুর রহস্য-রাজ্য হইতে মঞ্জরী কি আমাকেই তাহার মৃত্যুর জন্য—হত্যার জন্য দায়ী করিতেছে? যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই চিন্তার প্রবাহ আবর্ত্তিত ও আবিল হইতে লাগিল। শেষে স্থিরভাবে বিচারের—বিবেচনার সব ক্ষমতা হারাইলাম। মনে করিলাম, সে হত্যা-কলঙ্ক আমার। আমি তাহার হত্যাপরাধে অপরাধী। আর আমি? সেই হত্যাপরাধকলঙ্ককলুষিত আমি?—আমি আমাকেও হত্যা করিয়াছি! আমি আমার কি রাখিয়াছি?

এই দুইটি হত্যার পাপে পাপী আমি কেমন করিয়া মেজদাদার সম্মুখে দাঁড়াইব—তাঁহাকে কি বলিব? আমি তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিব না।

শঙ্কা একবার বাড়িতে থাকিলে—কারণে অকারণে কেবলই বাড়িতে থাকে। আমার তাহাই হইল। আমি মেজদাদার কাছে যাইতে

পারিব না। কিন্তু এই যে পবিত্র সংসার—যাহাতে কোথাও কোনও কলঙ্ক স্পর্শে নাই—এ সংসারে কি আমার স্থান হইতে পারে? আমিই এ প্রশ্নের উত্তর দিলাম—আমার ভ্রান্তিই উত্তর দিল,—না।

আমি সেই উত্তরই শুনিলাম—শঙ্কাতাড়িত মানব যেমন পশ্চাতে চাহিতে পারে না—সম্মুখের বিপদ বিচার না করিয়া সম্মুখেই দ্রুত পলায়ন করে, তেমনই পরিচিত গৃহত্যাগ করিয়া অপরিচিত পথে পলায়নপর হইলাম।

তখন—সেই বিদায়কালে একবার প্রসূনকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। আর দেখিতে পাইব না! আমি তাহার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলাম। দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইয়া মনে হইল, সে ত তাহার মাতার শয্যায় নিদ্রিত; বিলোলা কি বুঝিবে, আমার এ দৌর্ব্বল্য কেবল প্রসূনেরই জন্য? আমি ফিরিয়া আসিলাম—গৃহত্যাগ করিলাম। বিলোলার উপহাসের হাসির আশঙ্কায় আমি বিদায়কালে আমার সন্তান—আমার সর্ব্বস্ব পুত্রকে একবার দেখিয়াও আসিলাম না—একবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া আসিলাম না। আমার মৃত্যুপিপাসাশুষ্ক মুখ যে তাহার দত্ত বারিবিন্দুতে সরস করিতে পারিব, সে অধিকার নষ্ট করিয়া আসিলাম।

আসিবার সময়—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় কেবল তাহাকে বক্ষে লইয়া দণ্ডায়মানা বিলোলার চিত্রখানি লইয়া আসিয়াছিলাম। তাহাও রাখিতে পারি নাই। কত দিন সেখানিকে বক্ষচ্যুত করি নাই; কত দিন সেখানি অশ্রুসিক্ত করিয়াছি; কতবার সেখানি চুম্বন করিয়াছি! শেষে এক দিন আমার অতীত জীবনের সব স্মৃতি হইতে

মুক্তিলাভের দুরাশায় সেখানি ছিন্ন—বিচ্ছিন্ন করিয়া জাহ্নবী-জীবনে বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম—সত্য সত্যই সর্ব্বস্বহীন হইয়াছিলাম। সর্ব্বস্ব-হীনের দুঃখ সেই দিন প্রথম বুঝিয়াছিলাম; আর সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত বুঝিতেছি।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শুষ্কপত্র

দীর্ঘ ছয় মাস স্থির হইয়া ভাবিবার অবসর পাইলাম না—যেন আপনার নিকট হইতে কেবলই আপনি পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। ঝটিকাঘাতে, শুষ্ক পত্র একবার বৃন্তচ্যুত হইলে কি আর স্থির থাকিতে পারে?

তাহার পর ভাবিবার অবসর পাইলাম। তখন আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। আমি কি ভাবিয়াছি—কি করিয়াছি? তখন বুঝিলাম, মঞ্জরীর জীবনে-মরণের জন্য আমি দায়ী কিসে? আমার হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম—তাহাতে কোথাও অপরাধের চিহ্নমাত্র পাইলাম না। তখন অপগত-অভিমান হৃদয়ে আমার প্রেমের অচল আসনে বিলোলাকেই আসীন দেখিতে পাইলাম। মঞ্জরী আমার করুণা ব্যতীত ত কখনও আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই! সে আমার বন্ধুর ভগিনী—আমি আমার বিচার-বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছিলাম, তেমনই ভাবে তাহার কল্যাণসাধনের চেষ্টাই করিয়াছিলাম। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সেই ব্যর্থতার বেদনা আমাকে এমন চঞ্চল করিল কেন? সংসারে আমি সাফল্যলাভেই অভ্যস্ত ছিলাম—অসাফল্যের শিক্ষালাভের অবসর আমি পাই নাই—তাই এই অসাফল্যে আমি এত চঞ্চল হইয়াছিলাম। তখন বুঝিলাম, সেই শিক্ষার অভাবেই আমি বিলোলার প্রতি কর্ত্তব্য-

ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম—তাহাকে যাহা দিবার, তাহা দিতে পারি নাই ; কিন্তু আমার যাহা পাইবার, তাহার সম্বন্ধে অতিরিক্তের আশা করিয়া হতাশায় হৃদয়ে দারুণ অভিমান পুষ্ট করিয়াছি—ভ্রান্ত হইয়াছি। আমি আপনি জ্বলিয়াছি—তাহার জীবনও দুঃখময় করিয়াছি। কিন্তু আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া সে-ই বিরাজিত ছিল—সে-ই বিরাজিত।

তখন ভাবিলাম, উপায় কি? ফিরিব? কেমন করিয়া? সংসারে যে যায়, সে যায়—তাহার স্মৃতি যায় না সত্য, কিন্তু স্থান আর থাকে না। ইংরাজ কবির কথা মনে পড়িল—

শোকার্ত্ত স্বজন-কণ্ঠে করুণ ক্রন্দনে
মরণে নয়নদ্বয় মুদেছে যাহার,
সে যদি ফিরিয়া আসে আবার জীবনে
দেখিবে, ভবনে তা'র স্থান নাহি আর।

আমি যে সংসার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে সংসারে আমার আর ফিরিবার অধিকার কোথায়? আমি কি বলিয়া ফিরিয়া যাইব? আমার অতর্কিত অন্তর্ধানে অজ্ঞতার অন্ধকারে যে সব কারণের কল্পনা পুষ্ট হইয়াছে. কোন্ উপায়ে তাহাদের দূর করিব? আমার ভ্রমের কথা কেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিব? বলিতে পারিব কি? বলিলে আবার কি যেমন ভাব ছিল, তেমনই ভাব পাইব? যদি এই পরিবর্ত্তনে স্নেহ ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিব?

তখন বুঝিলাম, আমি কি করিয়াছি—কেমন করিয়া আপনার কল্যাণ আপনি পদ-দলিত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছি—আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি।

আর সেই সংসার? সে সংসারেও কি কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, যদি সব যেমন রাখিয়া আসিয়াছিলাম, আজ আর তেমন না থাকে? যদি সে পূর্ণতা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে? সে কথা যখন মনে করি, তখন আর হৃদয়ের চাঞ্চল্য সংবরণ করিতে পারি না।

কিন্তু সেই গৃহের স্নেহের—প্রেমের—ভালবাসার সুখ-স্মৃতি এক একবার আমাকে এমন প্রবল বলে আকৃষ্ট করিয়াছে যে, আমি তাহার বেগে একবার—শুধু একবার—দূর হইতে সে সংসার দেখিবার দুরাশায় —সে গৃহখানি দেখিব বলিয়া দেশান্তর হইতে কলিকাতায় গিয়াছি। যাইয়াই ভাবিয়াছি—এ কি করিতেছি? যাইলে কি আর ফিরিতে পারিব? তাই প্রবল বলে সে বাসনা বিনষ্ট করিয়া আসিয়াছি—ফলে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে; সে বেদনা দূর হইতে কত দিন গিয়াছে! আমি সে সংসারের পক্ষে মৃত—কিন্তু সে সংসার ত আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়াই বিরাজিত—তাহার স্মৃতিই আমার সম্বল—সে স্মৃতিতে কত সুখ—আর কত দুঃখ! যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, সেই স্মৃতিই সম্বল থাকিবে।

তাহার পর দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে। দুঃখের দিন কি এত দীর্ঘ! এক একবার এক একটা কাজ লইয়া এক এক স্থানে স্থির হইবার চেষ্টা করিয়াছি—পারি নাই—ভাল লাগে না। তাই অনির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কতবার পীড়িত হইয়া নিঃসঙ্গ প্রবাসে রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি—তখন পূর্ব্বস্মৃতিতে কেবল নয়নে অশ্রু ঝরিয়াছে। কাজ করিতে হয়—

কিন্তু করিবার প্রবৃত্তি নাই—উত্তেজনা নাই ; চিন্তা—কেবল চিন্তা—অসীম—অগাধ—অকূল।

এমনই করিয়া আর কত দিন পথহারা, শ্রান্ত, ক্লান্ত, লক্ষ্যহীন পথিক আমি পথে পথে ঘুরিব ? কবে দুর্দ্দশা-ঝটিকাহত বৃন্তচ্যুত শুষ্কপত্র মাটীতে মিশাইবে। জীবনে যে ভ্রম করিয়াছি, তাহার সংশোধন করিতে পারিলাম না। যে ভ্রম করে, সে দুর্ভাগ্য। কিন্তু যে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও সংশোধনের কোনও উপায় করিতে পারে না, তাহার মত দুর্ভাগ্য কাহার ?

সব দুঃখ সহ্য করিতেছি—না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু একটা দুঃখ আর সহিতে পারি না। আমার সর্ব্বস্ব প্রসূনের কাছে আমি জীবিত থাকিতেও মৃত। সে দুঃখও সহ্য করিতে পারি। কিন্তু আমি যে তাহার কাছে—তাহারও কাছে বিস্মৃত, সে দুঃখের ভার আর বহিতে পারি না—সে চিন্তার দংশন-যাতনা আর সহিতে পারি না। আমার স্বহস্ত-প্রজ্বালিত ভ্রান্তির অনলে দগ্ধ এ হৃদয় কবে জুড়াইবে ?

সম্পূর্ণ